

মহারাজ কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর

বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি-গ্রন্থাবলী নং—১

বীরভুম-বিবরণ

প্রথম খণ্ড

মহারাজকুমার

শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

মহোদয় সম্পাদিত।

(প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি-
মহোদয়-লিখিত ভূমিকা সহ)

"বীরভুম-অনুসন্ধান-সমিতি" হইতে

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

হেতমপুর-রাজবাটী—বীরভূম

১৩২৩ সাল

মূল্য—২৲ দুই টাকা মাত্র।

Printed by
R. C. Mittra, at the Visvakosha-Press
9, Visvakosha Lane, Bagbazar,
CALCUTTA.



স্বর্গীয় মহারাজ রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর।

উৎসর্গ-পত্র

বীরভূম যাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল
বীরভূমের অতীত কাহিনী যিনি পুরাণের
ন্যায় পুণ্যদ জ্ঞান করিতেন, বহুবিধ সৎকার্য্যের জন্য
বীরভূমে যিনি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, আমাদের এই
অত্যকার অনুষ্ঠানের যিনি সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন,
বীরভূম হেতমপুরের

সেই স্বর্গগত মহারাজ

পরম পুজ্যপাদ পিতৃদেব

রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের

পবিত্র নামে

"বীরভূম-বিবরণ"

উৎসর্গীকৃত

হইল।

প্রণত সেবক
শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

প্রকাশকের নিবেদন।

"বীরভূম-বিবরণ" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। বলিয়া রাখা ভাল ইহা ইতিহাস নহে। বীরভূমের কয়েকটী পল্লী ও তীর্থক্ষেত্রের কাহিনী মাত্র। এই কাহিনী সঙ্কলনের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আছে, তাহাই বিবৃত করিবার জন্য আমার "নিবেদনের" অবতারণা।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বীরভূম-হেতমপুরাধিপতি মহারাজ স্বর্গীয় রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর বীরভূমের ইতিহাস সঙ্কলনের জন্য সংবাদপত্রে একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। তাহাতে বিজ্ঞাপিত হয় যে, বীরভূমের ইতিহাস সঙ্কলন-কারাকে তিনি সঙ্কলনগ্রন্থের মুদ্রণ-ব্যয়সহ দুইশত টাকা পারিতোষিক প্রদানে উৎসাহিত করিবেন। বৎসরের পর বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ কার্য্যে কাহাকেও অগ্রবর্ত্তী হইতে দেখা যায় নাই। অবশেষে (হেতমপুরের) মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয় এই ইতিহাস-সংগ্রহ-কার্য্যে সচেষ্ট হন এবং নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও বিশেষ পরিশ্রম-সহকারে "বীরভূম রাজবংশ" নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বীরভূমের রাজধানী লক্ষোরের (রাজনগর) রাজবংশ-বিবরণ সেই গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য-বিষয়। এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে, বীরভূমের লোক-পরম্পরাপ্রচলিত প্রবাদ, প্রবচন ও গীতি-গাথা আদির মধ্যে বহু ঐতিহাসিক উপকরণ নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া তাহার মধ্য হইতে ইতিহাসের সত্য-তথ্যের উদ্ধার-সাধন বিশেষ পরিশ্রম ও সময়সাপেক্ষ। তজ্জন্য তিনি এই কাহিনী-সংগ্রহকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। উদ্দেশ্য,—বীরভূমের সমস্ত পল্লী ও তীর্থক্ষেত্রাদির সমগ্র কাহিনী সংগৃহীত হইলে ভবিষ্যতে বীরভূম-ইতিহাসের কতকটা উপকরণ বাহির হইতে পারে।

এই উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য (বিগত ১৩০১ সাল, ৫ই কার্ত্তিক) "বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই কার্য্যের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেছেন এবং স্বয়ং সমিতির সম্পাদক-পদ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া বীরভূম-ইতিহাস সম্পাদনপূর্ব্বক অক্ষয় যশোকীর্ত্তির অধিকারী হউন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্,এ, সি, আই, ই, মহাশয় যথাবশ্যক উপদেশাদি প্রদানে এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় সমিতির সভাপতির পদগ্রহণে সমিতিকে বহুপ্রকারে উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে এবং সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি,এ মহাশয় ও সমিতি-সংশ্লিষ্ট অপরাপর ভদ্রমহোদয়গণ—সকলকেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া যাঁহাদের নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে আমাদের পৃষ্ঠপোষক রাজা শ্রীযুক্ত সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন কেন্দুবিল্বের মোহান্ত শ্রীযুক্ত দামোদরচন্দ্র ব্রজবাসী, রাইপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সিংহ, নান্নুরের বিশালাক্ষী দেবীর পূজক শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, মৌড়েশ্বরের তালুকদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ পাল, ভদ্রপুরের শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরচন্দ্রপুরের নিত্যানন্দ-বংশধর শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী গোস্বামী, লাভপুরের স্বর্গীয় জমিদার হিরণ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মঙ্গলডিহির স্বর্গীয় প্রভুপাদ রামলাল ঠাকুর মহাশয়গণ প্রভৃতির নিকট হইতেও আমরা বহু সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাঁরা সকলেই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

প্রুফ-সংশোধনের অসুবিধায় এবং অপর কতকগুলি গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া পুস্তকখানি মুদ্রাকর-প্রমাদে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাহিরে যাহা "ভীমকান্ত" ছিল, পুস্তকে তাহা "ভীম কাণ্ড" হইয়া রহিয়াছে। "সেই চির সুন্দর" 'চীর সুন্দর রূপে' এবং "মদির স্পন্দন" "মন্দির স্পন্দনে" পরিণত হইয়াছে, এরূপ মারাত্মক ও শোচনীয় ভ্রম সমূহ অবশ্য কেহই মার্জ্জনীয় বলিয়া মনে করিবেন না এবং আমরাও ইহার জন্য বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত হইতেছি। কিন্তু এরূপ ত্রুটী স্বীকারে এখন আর কোনো লাভ নাই। কারণ কয়টী বিষয়ের জন্য ত্রুটী স্বীকার করিব। একেত' সে কালের সবই গিয়াছে, কাহিনী শুনিবার সে শ্রবণ, বুঝিবার সে হৃদয় এবং বলিবার সে মনোমদ ভঙ্গী সমস্তই আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, তাহার উপর এই বিভ্রাট! "মঙ্গলডিহি-কাহিনীতে" "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" করিতে গিয়াও পাণ্ডুলিপি-লেখক যে ভুল বাধাইয়া বসিয়াছেন, শুদ্ধি-পত্রেও তাহা সংশোধনের উপায় নাই। জনশ্রুতি অনুসারে যাহাকে "প্রাচীরে" বসাইতে হইবে তাহাকে বাঘের উপরে এবং যাহাকে "বাঘে" চড়াইতে হইবে তাহাকে প্রাচীরের উপরে চাপাইয়া তিনি জনশ্রুতির

উপরেও এককাঠী চড়িয়াছেন। যাহা হউক, সাধারণে পুস্তকখানিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে একটু কৃপার চক্ষে দেখিলেই আমরা বাধিত হইব। সম্পাদক মহারাজকুমার মহোদয় এই সমিতির প্রাণস্বরূপ সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কিছু লেখা বাহুল্য। কিন্তু উপসংহারে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নাম পুনরুল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার সাহায্য না পাইলে আমরা কতদূর কি করিয়া উঠিতাম, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। তিনি এই কাহিনীর পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে অক্লান্তভাবে আমাদের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। বীরভূমের জন্য তিনি যাহা করিতেছেন, তাহাতে সমগ্র বীরভূমবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। ভগবান্ তাঁহার মঙ্গল করুন। ইতি

হেতমপুর-রাজবাটী,
বীরভূম।
ভাদ্র, ১৩২৩

বিনয়াবনত
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বীরভূম-বিবরণ

প্রথম খণ্ড

চিত্র-সূচী

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
খৃষ্টাব্দের	খৃষ্টাব্দের	১	পাদটীকা ১
১২৪০ সংবৎ	১৬৪০ সংবৎ	৫	২৯
নখরভা	নখরতা	৭	৩
হাজারা	হাজারী	১১	১৬
সমস্ত প্রজাগণকে	প্রজাগণকে	১৪	২৬
হোসেনসোর	হোসেন সার	১৯	৮
আলিখাঁর	আলিনকী খাঁর	২৮	৯
বঙ্গাব্দ ১৬৬৪	বঙ্গাব্দ ১১৬৪	৩২	১২
১১১৯ বঙ্গাব্দের	১১৫৯ বঙ্গাব্দের	৩৩	৫
নন্দমারই	নন্দকুমারই	১০৫	১৯
পড়িব	পড়িত	১২৭	১
তটা	তট	১৩৮	২০
বরনা	বরণা	১৫৬	৬
অযোনসম্ভবা	অযোনিসম্ভবা	১৫৯	১৪
বসি	বসিয়া	১৬০	পাদটীকা ১০
রাজনগররাজ	বাঘনগররাজ	১৬২	" ৮
লাঙ্কর	লাঙ্কুর	১৬২	" ৯
রাজপুরাধিষ্ঠিত	বাঘপুরাধিষ্ঠিত	১৬২	" ১১
লব্ধসিদ্ধ	লব্ধসিদ্ধি	১৬৪	২৪
মুক্ততা	মুক্ত ত্য	১৬৫	পাদটীকা ২
মোতাবেগ	মোতাবেল	১৭৭	২
আখি	আঁখি	১৭৭	৬
তুলিবে	তুলিব	১৭৭	১০
নিন্দা	নিদ্রা	১৭৭	১২
প্রভু	প্রভুর	১৭৮	৬
পাণুয়া	পাণুয়ার	১৭৮	৭
প্রথমে	প্রথম	১৭৮	১৮
কৃষ্ণভক্তিবান	কৃষ্ণভক্তিকল	১৭৯	১
মেরা	মেধা	১৭৯	৬
ইবি	ইতি	১৭৯	২০

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
আলি	থালি	১৮০	১
দেহি	দহি	১৮০	৪
তুলি	তুলি তুলি	১৮০	৫
হইয়াছে	রহিয়াছে	১৮১	১৯
হয়	হন	১৮১	২৪
অঙ্গন	অঞ্জন	১৯০	১২
গতিহারি	গতিহারী	১৯০	১২
মণুহারি	মনোহারী	১৯০	১৫
সুখকরি	সুখকারী	১৯০	২৭
পিক আজে	পিকরাজে	১৯২	৮
কেন্দুবিল্ব সমুদ্রে	কেন্দুবিল্ব সমুদ্র হইতে	১৯৪	১
রচনৈবাচার্য্য	রচনৈরাচার্য্য	১৯৭	১৩
১৩১৪	১০৪১	১৯৭	১৯
শ্যামরূপা	শ্যামারূপা	১৯৮	২৭
আলোকসামাণ্যা	অলোকসামান্যা	২০২	৯
সমথিত	সমর্পিত	২২০	পাদটীকা ১৫
কৃতার্থ লাভ	কৃতার্থতা লাভ	২২২	২৭
বাগুতুচ্চৈ	বাগুত্যুচ্চৈ	২৩৬	পাদটীকা ৫
পৌরস্তানেমাক্রমেন	পৌরস্তানেব সাক্রামন	২৩৭	১
জবনপদাশ্রয়ী	জনপদাশ্রয়ী	২৩৭	১
দেবানুরক্তা	দেবরানুরক্তা	২৩৭	১১
”	”	”	১২
দেব	দেবঃ	২৩৭	পাদটীকা ২
সৎ	স্বৎ	২৩৭	” ৩
বহস্তো	বহস্ত্যো	২৩৭	” ৩
কিঞ্চিদ্দুন	কিঞ্চিদুন	২৩৯	৩
প্রতিষ্ঠাতা	প্রতিষ্ঠিতা	২৩৯	৭
সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্তে	২৪০	৩০
বেলু	বেনু	২৪১	১৫
সোমের	সে-মোর	২৪২	৩
করিরা	করিয়া	২৪২	১৬
কর্ম্মকরে	কর্ম্মকারে	২৪৬	পাদটীকা ১
শুভদৃষ্ট	শুভাদৃষ্ট	২৪৬	” ৬

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
রাজ্যান্তে	রাজ্যাঙ্কে	২৪৮	২
তাই	এই	২৪৮	২৭
অনেক	অনেকে	২৪৯	৫
তাহারও	তাঁহারাও	২৫৩	২৭
মন্দিরস্পন্দন	মন্দিরস্পন্দন	২৫৬	পাদটীকা ৮

পরিশিষ্ট

ভ্রমে ক্রমে	ভ্রম ক্রমে	।০	পাদটীকা ১
	ভুজানেন্তি	॥৴০	১৮
ভক্তোঽমিতি	ভক্তোঽসিতি	॥৶০	৫
তৃষ্ণা	তৃষা	॥৶৫	২০
চাণ্ড্যা	চান্ডা	৸৴০	১৪
লক্ষ্মীম হতী	লক্ষ্মীর্ম হতীতি	”	১৫
ভীমকাণ্ড	ভীমকান্ত	৸৶০	১১
	উপপীঠ	৸৶৫	৪
সেইটাঁর	সেই চির	১১	১৬
গাত্রামৃতক্ষিতম্	গাত্রাস্থগুক্ষিতম্	১৶০	৭
	• জীবনে	১৶০	৪
মঙ্গলডিহি	মঙ্গলডিহির	”	৭
সাক্ষীস্বরূপ	নান্দীস্বরূপ	”	৯
ঝোটের ডাঙ্গা	কোটের ডাঙ্গা	”	২৩
ঝোটের ডাঙ্গায়	কোটের ডাঙ্গায়	”	২৭
হয়	হয়	১।৶	২৪
পুর্ব্ব	পুর্ব্বে	১॥০	৮

ভূমিকা

ভূমিকা।

তিন বৎসরের অধিক হইল 'বীরভূম-বিবরণ'-প্রকাশের আয়োজন হয়। প্রকাশক মহাশয় তাঁহার 'নিবেদনে' এ সম্বন্ধে কতকটা জানাইয়াছেন। সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গ্রন্থকার মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের উৎসাহ ও বীরভূমের ইতিহাস উদ্ধারে অনুরাগ দেখিয়া বাস্তবিক মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার সহিত বীরভূমের কতিপয় দ্রষ্টব্য-স্থান দর্শনেরও সুযোগ ঘটিয়াছিল। তৎকালে স্থির হয়, মহারাজকুমার বীরভূমের সকল প্রাচীন ও দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন করিয়া একখানি সুবৃহৎ বীরভূম-বিবরণ প্রকাশ করিবেন। আমিও উপযুক্ত দ্রষ্টব্য স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া তাঁহার প্রস্তাবিত গ্রন্থের পরিচয়স্বরূপ বীরভূমের পুরাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, দেবতত্ত্ব ও বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া দিব। তখন আমরা মনে করিতে পারি নাই, নানা বর্ণের ও নানা ধর্ম্মের লীলা-নিকেতন বীরভূমপ্রদেশে প্রাত্ন-তত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও পুরাবিদের দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য যথেষ্ট উপকরণ নানা স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সেই সমুদয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গেলে একখণ্ড বীরভূম-বিবরণ বা তাহার উপর এই ক্ষুদ্র ভূমিকায় কুলাইবে না। বীরভূমের বিশাল অতীত কীর্ত্তির আভাস পাইয়া বীরভূম-বিবরণ-রচয়িতা মহারাজকুমারের হৃদয়ে বীরভূমের প্রত্নতত্ত্ব-উদ্ধারের জন্য একটী বিরাট আয়োজন করিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠে। এ বিষয়ে তিনি সমগ্র বীরভূমবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য গত ৫ই কার্ত্তিক (১৩২১ সাল) 'বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। সুচারুরূপে সমিতির কার্য্য সম্পন্ন হইবার আশায় বীরভূমবাসীর পক্ষ হইতে তিনি ইহার স্থায়ী সম্পাদক এবং তাঁহার সুযোগ্য সহকারী শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন। উভয়ের উপযুক্ত চেষ্টা, আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের গুণে বীর-ভূমের লোকাবাস ও গভীর অরণ্য মধ্য হইতে যে সকল অজ্ঞাতপূর্ব্ব পুরাতত্ত্বের উপকরণ বাহির হইতেছে, তাহারই কিয়দংশ বীরভূম-বিবরণের এই প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হইল।

সুখের বিষয়, মহারাজকুমার নিজে এই বীরভূম-বিবরণ লিখিবার ভার গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট সৎসাহস ও উৎসাহের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এই সাহিত্যিক

রঙ্গমঞ্চে নবীন অভিনেতা হইলেও যেরূপ প্রবীণতার পরিচয় দিতেছেন, তাহা বাস্তবিক বিস্ময়াবহ ও কৌতুহলোদ্দীপক। তাঁহার একান্ত অনুরোধেই আমি এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি। তাঁহার ইচ্ছা একটী বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়া তাঁহার এই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করি। কিন্তু বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির প্রতিষ্ঠা ও তাহার সভাপতির পদ গ্রহণের সঙ্গে আমার পূর্ব্ব-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির এক্ষণে শৈশবাবস্থা। ইহার কার্য্যক্ষেত্র বিপুল ও বিশাল। এখনও বীরভূমের এক-চতুর্থাংশ ভূভাগ পরিদর্শনে সমিতির সুযোগ ঘটে নাই। এ অবস্থায় উপযুক্ত ভূমিকা লিখিবার এখনও সময় আসে নাই। তবে এই আলোচ্য প্রথম খণ্ডে যে নয়টী স্থানের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে একটা ক্ষুদ্র ভূমিকা বোধ হয় অশোভন হইবে না।

গ্রন্থকার আপনার জন্মভূমি হেতমপুর হইতে তাঁহার বীরভূম-কাহিনী আরম্ভ করিয়াছেন। হয়ত প্রথমেই নিজের ঘরের কথা লিখিতে গিয়া মহারাজকুমার সমালোচকের তীব্রদৃষ্টির বিষয়ীভূত হইতে পারেন। কিন্তু আমি মনে করি, তিনি যখন সমগ্র বীরভূমের কাহিনী লিখিতে বসিয়াছেন, তখন যেখানকার বিবরণ তাঁহার বেশী জানা আছে, সেই স্থানের পরিচয় সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ করা কখনও দোষাবহ বলিয়া মনে করি না। এই বীরভূম-বিবরণ লিখিত হইবার পূর্ব্বে 'হেতমপুর-কাহিনী' নামে একখানি পুস্তক বাহির হইয়াছিল, কিন্তু তন্মধ্যে অনেক অমূলক কথা প্রকাশিত হওয়ায় তাহার সংশোধনের আবশ্যক হইয়াছিল। যিনি বীরভূমের বিস্তৃত বিবরণ লিখিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে নিজ জন্মভূমির প্রকৃত পরিচয় দিবার ইচ্ছা যে বলবতী হইবে তাহা স্বভাবসিদ্ধ। তাঁহার এই পরিচয় মধ্যে অজ্ঞাতপূর্ব্ব এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমরা পূর্ব্বে আর কোথাও দেখি নাই। এই নিজ জন্মভূমির কাহিনীর মধ্যেও তিনি নিজের অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। শেরিণা বিবির প্রণয়-কাহিনী ও হেতম খাঁর হাঁতকথা বাস্তবিক মর্ম্মস্পর্শী ও আবেগময়ী হইয়াছে। তাঁহার উদ্ধৃত সাঁওতাল-বিদ্রোহের ছড়াতেও আমরা সমসাময়িক ঘটনার বেশ একটু আভাস পাইতেছি। ভদ্রপুর-কাহিনীতে মহারাজ নন্দকুমারসম্বন্ধে এমন অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি, যাহা পূর্ব্বে কোন ইতিহাসে প্রকাশিত হয় নাই। মহারাজ নন্দকুমারের সহিত ভদ্রপুরের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু এইস্থান কত প্রাচীন, তাহা জানিবার এতদিন সুবিধা ছিল না। ভদ্রপুর

(হেতমপুর) (ভদ্রপুর)

হইতে যে অতিসুন্দর রাঢ়ীয় শিল্পনৈপুণ্যের প্রভাবোদ্দীপ্ত অবলোকিতেশ্বর-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতেই এই স্থানের প্রাচীন সমৃদ্ধির ক্ষীণস্মৃতি পাইতেছি। স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ এই সুন্দর বৌদ্ধ-মূর্ত্তিটীকে শিবমূর্ত্তি ভাবিয়া পূজা করিতেছেন। কিন্তু ইহা যে বীরভূমে বৌদ্ধপ্রভাবের অতীত ও উজ্জ্বল নিদর্শন, তাহা অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। ভদ্রপুরে অবলোকিতেশ্বর

এই শিলাময়ী মূর্ত্তি শিরোভাগে অমিতাভবুদ্ধ-চিহ্নিত ও সমাধিমুদ্রায় অবস্থিত থাকায় আমরা নিঃসন্দেহে কোন অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। বৌদ্ধতন্ত্রে বহু প্রকার অবলোকিতেশ্বরের সাধন আছে, কিন্তু ইহা কোন্ অবলোকিতেশ্বর তাহা ঠিক বলা কঠিন। বৌদ্ধ সাধনমালাতন্ত্রে নীলকণ্ঠার্য্যাবলোকিতেশ্বরের এইরূপ সাধন বর্ণিত আছে—

"পীতবর্ণমর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিতজটামুকুটিনমমিতাভোপলক্ষিত-শিরপ্রদেশং কৃষ্ণসার-হরিণচর্ম্মাণি বজ্রপর্য্যঙ্কিনং সমাধিমুদ্রোপরি নানারত্নপরিপূর্ণকপালধারিণমৈণেয়-চর্ম্মকৃতযজ্ঞোপবীতং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং নিরাভরণং নীলকণ্ঠং।"

আবার সাধনসমুচ্চয়তন্ত্রে বজ্রাসন-বুদ্ধ-সাধন এইরূপ পাওয়া যায়—

"দ্বিভুজৈকমুখং পীতং চতুর্মারসংঘটিত-মহাসিংহাসনবরং তদুপরি বিশ্বপদ্ম-বজ্রে বজ্রপর্য্যঙ্কসংস্থিতং * * বন্ধূকরাগারুণবস্ত্রাবগুণ্ঠিততনুং সর্ব্বাঙ্গং প্রত্যঙ্গ-মসেচনকবিগ্রহং বিচিন্ত্য * * * তদনু ভগবতো দক্ষিণে মৈত্রেয়ং বোধিসত্ত্বং সুবর্ণগৌরং দ্বিভুজং জটামুকুটধারিণং গৃহীতচামরদক্ষিণকরং নাগকেশরপল্লব-ধরবামকরং তথা বামে লোকেশ্বরং বোধিসত্ত্বং শুক্লং জটামুকুটিনং চামরধারি দক্ষিণভুজং কমলধারি বামকরং এতদ্দ্বয়ং ভগবন্মুখমভিবীক্ষ্যমাণং পশ্যেৎ।"

আমাদের আলোচ্য অবলোকিতেশ্বরের সহিত কতকটা নীলকণ্ঠ-অবলোকিতেশ্বর এবং কতকটা বজ্রাসন বুদ্ধভট্টারকের সৌসাদৃশ্য দেখিতেছি।

বৌদ্ধ-প্রভাবের সহিত বহু প্রাচীনকাল হইতে এখানে যে শাক্ত-প্রভাব ছিল, ভদ্রপুরের পার্শ্ববর্ত্তী আকালিপুরে সর্পাসীনা সর্পভূষণভূষিতা বরাভয়করা দ্বিভুজা গুহ্যকালিকা ও গৌরীশঙ্করপ্রতিমা তাহার অন্যতম প্রমাণ।

সুপুর-কাহিনীতে সুরথসম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা ঐতিহাসিকের নিকট বিশেষ মুল্যবান্ বলিয়া গৃহীত না হইলেও এখানকার সুরথেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ ও তাঁহার প্রাঙ্গণপার্শ্বে পতিত মস্তকবিহীন প্রস্তর-মূর্ত্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুরথেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দির বেশী দিনের নয় বটে, কিন্তু উক্ত প্রস্তরমূর্ত্তির গঠন-পদ্ধতি ও অত্যুজ্জ্বল শিল্প-নৈপুণ্য দর্শন

করিলে তাহা যে এদেশে প্রথম মুসলমান আগমনের বহু পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ করিবার নাই। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই সুন্দর প্রস্তর-মূর্ত্তির মস্তক ও হস্তদ্বয় নাই। কিন্তু তথাপি কলেবরের অপরাংশে শিল্পী কি অদ্বিতীয় শিল্প-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, এই ভগ্ন-মূর্ত্তির বস্ত্র-পরিধান, বেশভূষা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিদর্শন করিলেই সহজে বুঝা যায়। সাধারণে এই মূর্ত্তিকে ভৈরব বলিয়া পরিচিত করিলেও ইহা যে ভৈরব-মূর্ত্তি নহে, কোন শান্ত-সুন্দর দেব বা রাজার মূর্ত্তি, তাহা চিত্র দেখিলেই সহজে ধারণা হইবে।

সুপুরে ভগ্ন-শিলামূর্ত্তি

গ্রন্থকার মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী বর্ণিত 'স্বপুরের' অপভ্রংশে 'সুপুর' হইয়াছে অনুমান করেন। (১৩৭ পৃঃ) কিন্তু দেবী-মাহাত্ম্যে সুরথপ্রসঙ্গে যে স্বপুরের উল্লেখ আছে, তথায় স্বপুরের অর্থ 'নিজ পুর' এইরূপ মনে করি। তথায় স্বপুর কোন নগর বা জনপদের জ্ঞাপক নহে। এখানে যখন সুরথেশ্বর নামক সুপ্রাচীন শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তখন 'সুরথপুরের' অপভ্রংশে 'সুপুর' হওয়া বিচিত্র নহে।

ভাণ্ডীরবন-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার একটী অতিপ্রাচীন ঋষির আশ্রমের সন্ধান দিয়াছেন। রামায়ণে ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা বিভাণ্ডকের আশ্রমের সংবাদ পাইয়াছি। রামায়ণের বিভাণ্ডকবন অধুনা বৈষ্ণব-প্রাধান্যকালে ভাণ্ডীরবনে পরিণত হইয়া থাকিবে। আমরা রামায়ণ হইতে জানিতে পারি, অঙ্গাধিপ লোমপাদ বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রম হইতে তৎপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে কৌশল করিয়া নিজ রাজধানীতে জল-পথে লইয়া গিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এই বীরভূম জেলার পশ্চিমাংশ হইতেই প্রাচীন অঙ্গরাজ্য আরম্ভ। সুতরাং রামায়ণী কথায় যদি কিছুমাত্র ঐতি-হাসিকতা থাকে, তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হইবে, অঙ্গাধিপ তাঁহার রাজ্যের অদূরবর্ত্তী বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রম হইতে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনাইয়া-ছিলেন। এরূপ স্থলে বলিতে হয়, রামায়ণী-যুগে বীরভূমের এই অংশে ঋষির আশ্রম ছিল।

ভাণ্ডীরবনে বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রম

কেবল বিভাণ্ডক বা ভাণ্ডীরবন বলিয়া নহে, ইহার অদূরবর্ত্তী বীরভূমের প্রসিদ্ধ পুণ্যক্ষেত্র বক্রেশ্বরও অতি প্রাচীনকাল হইতে অষ্টাবক্র ঋষির আশ্রম বলিয়া পরিচিত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় বক্রেশ্বর-মাহাত্ম্যে তাহার বিস্তৃত মাহাত্ম্য বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার সে সমস্তই উদ্ধার করিয়া পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্তি করিয়াছেন। এখানে অনেকগুলি উষ্ণপ্রস্রবণ ও পুণ্যতোয়া নদী প্রবাহিতা থাকায়

বক্রেশ্বর

কেবল ঋষির আশ্রম বলিয়া নহে, তৎপরে এই স্থান একটী সমৃদ্ধিশালী জনপদে পরিণত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বক্রেশ্বরের মূল মন্দির ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র মন্দিরগুলি সমধিক প্রাচীনকালের নহে বটে, কিন্তু উক্ত মন্দিরসমূহের অদূরে এবং ডিহি বক্রেশ্বরের মধ্যে উচ্চ জমির উপর উচ্চ ঢিপি বা বিধ্বস্ত স্তূপগুলি প্রাচীন যুগের অতীত কীর্ত্তির বিলুপ্ত স্মৃতি বলিয়া মনে হইবে। মুসলমান-বিপ্লবে সেই সকল প্রাচীন কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইলেও এখান হইতে যে অষ্টাদশভুজা দেবীমূর্ত্তি ও ভগ্ন হরগৌরী-মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে, তাহার শিল্পনৈপুণ্য সহস্র বর্ষের লুপ্ত শিল্পের নিদর্শন। আমার বিশ্বাস, বক্রেশ্বরের প্রাচীন ভূগর্ভ উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলে বীরভূমের অতীত-কীর্ত্তির অনেক ভাস্বর নিদর্শন বাহির হইতে পারে। সুতরাং এস্থলে বলিতে বাধ্য হইতেছি যতদিন না সেই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে, ততদিন বক্রেশ্বরের যে কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অসম্পূর্ণ বলিয়া ধরিতে হইবে।

বক্রেশ্বরে অষ্টাদশভুজা ও হরগৌরী-মূর্ত্তি

মঙ্গলডিহির ঠাকুরবাড়ীতে একটী অতিপ্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা রহিয়াছে। আমাদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অনেক কষ্টে সেই মুদ্রাটীর এক দিকের ফটো লইতে পারিয়াছেন। এই মুদ্রাটীর গুরুত্ব সম্ভবতঃ তিনি সে সময়ে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই এবং আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকারও বোধ হয় এই কারণে এই সুপ্রাচীন স্বর্ণমুদ্রার পরিচয় দিতে ভুলিয়াছেন। বাস্তবিক এই মুদ্রাটীর পরিচয় এখানে বিশেষ আবশ্যক। এই মুদ্রার চিত্র হইতে বুঝিতে পারিতেছি—ইহা শককুষণসম্রাট্ কণিষ্কবংশীয় বাসুদেবের মুদ্রা। সম্মুখ-ভাগের চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার উপরভাগে দক্ষিণ দিক্ হইতে রাজার মাথা ঘুরিয়া বাম ভাগ পর্য্যন্ত এইরূপ গ্রীকলিপি আছে—

মঙ্গলডিহিতে শকসম্রাট্ বাসুদেবের মুদ্রা

PAONANO PAO BAZOAHO KOPANO

সম্রাট্ বাসুদেব দণ্ডায়মান, বামহস্তে বল্লম ধরিয়া আছেন এবং দক্ষিণ হস্তে বেদীর উপর ধান্য রাখিতেছেন। এই বাসুদেব-মুদ্রার পশ্চাদ্ভাগের চিত্র আনা হয় নাই। কিন্তু এরূপ মুদ্রার পশ্চাদ্ভাগে সাধারণতঃ দণ্ডায়মান শিবমূর্ত্তি, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল ও বাম হস্তে পাশ এবং তাঁহার পার্শ্বে একটী বৃষভ মূর্ত্তি দেখা যায়। শকসম্রাট্ বাসুদেব খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, সেই সময় এই স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত হয়। [চিত্রসূচী দ্রষ্টব্য।]

মঙ্গলডিহি ও জোফ্‌লাই-কাহিনীতে গ্রন্থকার যে ভাবে ভক্ত, সাধক ও পদকর্ত্তা কবির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সাহিত্যিক ও ধার্ম্মিকের বিশেষ প্রণিধান-

যোগ্য। এখানে গ্রন্থকার ভাষার, ভাবের ও ভক্তির তরঙ্গে তাঁহার উপযুক্ত লেখনী পরিচালিত করিয়াছেন। সাধক পর্ণীগোপাল ও ভক্ত পদকর্ত্তা জগদানন্দ সম্বন্ধে এমন করিয়া আর কেহ লিখিয়া যান নাই, সুতরাং বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে এ অংশ আদরণীয় ও গ্রাহ্য হইবে।

জোফ্ লাই

কেন্দুবিল্ব ও জয়দেব

কেন্দুবিল্ব-কাহিনীর জয়দেব-প্রসঙ্গ আমরা একটী উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। জয়দেব-সম্বন্ধে সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী যেখানে যতগুলি উপকরণ পাওয়া যাইতে পারে, গ্রন্থকার তাহার একত্র সমাহার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার ভাবরসজ্ঞতা, চিন্তাশীলতা ও মৌলিক গবেষণার সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। কেন্দুবিল্বের নিকটবর্ত্তী ঢেকুর বা শ্যামারূপার গড়ের বিবরণ-প্রসঙ্গে সেনভূমের অজ্ঞাতপূর্ব্ব অতীত ইতিহাসের একাংশ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সমসাময়িক লিপি ভিন্ন যাঁহারা অপর কোন নজীর মানিতে চান না, গ্রন্থকার তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, সমসাময়িক লিপি বা পূর্ব্বেতিহাস বিলুপ্ত হইলেও সেনভূমে ইছাইঘোষ ও লাউসেন নামে দুই মহাপুরুষের অভ্যুদয় হইয়াছিল, মহাবীর ইছাইঘোষ কিরূপে সেনভূমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন—কোথায় তিনি রাজধানী পত্তন করিয়াছিলেন, শত্রুপক্ষের প্রবল আক্রমণ হইতে তাঁহার রাজধানী রক্ষা করিবার জন্য কোথায় তিনি দুর্গ বা গড় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে গ্রন্থকার তাহার যথাসাধ্য পরিচয় দিবায় চেষ্টা করিয়াছেন। ইষ্টকনির্ম্মিত হইলেও অজয়-তীরবর্ত্তী সমুচ্চ ইছাই-ঘোষের দেউল বাঙ্গালীর স্থাপত্যবিদ্যার অসাধারণ ও অপূর্ব্ব পরিচয় প্রকটিত করিতেছে। ইছাই ঘোষের দেউল যে খাঁটি আর্য্য-স্থাপত্যের নিদর্শন তাহা বিশেষজ্ঞের মুখেও শুনিয়াছি। গ্রন্থকারের মতে 'শ্যামারূপা-গড়ের পূর্ব্বে নাম ছিল—ত্রিষষ্টিগড়। ইছাই ঘোষ সে নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নাম রাখেন ঢেকরী বা ঢেকুর।' কিন্তু তাঁহার উদ্ধৃত (২৪৩ পৃষ্ঠা) ধর্ম্মমঙ্গল হইতেই পাওয়া যায়,—

ইছাই ঘোষের দেউল

"অপর প্রার্থনা শুন, ত্রিষষ্টির গড় পুনঃ
নাম হবে অজয় ঢেকুর।"

অর্থাৎ ত্রিষষ্টির গড় পুনরায় ঢেকুর নামে পরিচিত হইবে। ইহাতে ইছাই ঘোষের বহু পূর্ব্বেই ত্রিষষ্টিগড় ঢেকুর নামে পরিচিত ছিল, তাহারই আভাস পাওয়া যাইতেছে। বাস্তবিক সমস্ত সেনভূম ও সেনপাহাড়ী পরগণা পূর্ব্বকালে ঢেকরী বা ঢেকুর নামে পরিচিত ছিল। তাহারই অন্তর্গত ঢেকুরগড় লাউসেনের পূর্ব্ব-পুরুষ সেনবংশীয় নৃপতিগণের সময়ে ত্রিষষ্টিগড় নামে পরিচিত হয় এবং ইছাই

ঘোষের ইষ্টদেবী শ্যামারূপার অধিষ্ঠানের সঙ্গে পরবর্ত্তীকালে শ্যামারূপার গড় নামে পরিচিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার শ্যামারূপার গড়প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন—"অনেকে লাউসেনকে ১ম মহীপালের সমসাময়িক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু এ মতের সমর্থন করি না। পরকেশরীবর্ম্মা শ্রীরাজেন্দ্র-চোলের তিরুমলয়গিরি-লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, দণ্ডভুক্তিতে ধর্ম্মপাল, দক্ষিণরাঢ়ে রণশূর, বঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র ও উত্তররাঢ়ে মহীপাল ছিলেন। ইঁহারা সকলেই রাজেন্দ্রচোলদেবের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। এই উত্তর-রাঢ়ের মহীপালই পালবংশীয় ১ম মহীপাল। লাউসেনের পিতা কর্ণসেন সে সময় বর্ত্তমান থাকিলে 'বারভূঞা মাঝে যার কথা নাহি নড়ে' এ হেন কর্ণসেন রায়কে রাজেন্দ্রচোল উপেক্ষা করিতেন না, বা কর্ণসেনও নীরব থাকিতে পারিতেন না, যেহেতু তিনি পালবংশীয়গণের সামন্তরাজ ছিলেন।" এই সকল কারণে তিনি স্থির করিয়াছেন যে, পালবংশীয় ২য় নরপতি ধর্ম্মপালের পুত্র ত্রিভুবনপালই নানা ধর্ম্মমঙ্গলে গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন এবং এই ত্রিভুবনপালের সময়েই ইছাই ঘোষ ও লাউসেনের অভ্যুদয়। আমি কিন্তু এমত স্বীকার করি না। কারণ পালবংশের তাম্রশাসন অথবা যাঁহারা পালবংশের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই ত্রিভুবনপালকে পালবংশীয় নৃপতি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ধর্ম্মপালের খালিমপুর হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে ত্রিভুবনপাল 'যুবরাজ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তৎপরবর্ত্তী তাম্রশাসন ও শিলালিপিতে আর কোথাও ত্রিভুবনপালের নাম পাওয়া যায় নাই। এরূপস্থলে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়, ধর্ম্মপালের জীবদ্দশায় যুবরাজ ত্রিভুবনপাল ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলে লিখিত আছে,—

"ধর্ম্মপাল রাজা ম'ল অরাজক দেশ।
পাত্র-মিত্র প্রজালোক পায় বড় ক্লেশ॥"

এই উক্তির দ্বারা বোধ হয়, ধর্ম্মমঙ্গলোক্ত ধর্ম্মপাল রাজার মৃত্যুর পর উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে কিছুদিন দেশে অরাজকতা ঘটিয়াছিল। কিন্তু দিগ্বিজয়ী মহাবীর ১ম ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীর অভাব ঘটে নাই এবং দেশেও অরাজকতা উপস্থিত হয় নাই। বরং তৎপুত্র দেবপাল সমস্ত গৌড়রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজ্যের উন্নতির সঙ্গে আপামর সাধারণের

ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রশস্তি কেবল সমসাময়িক শিলা-
ধর্ম্মপাল লিপি বা তাম্রশাসন বলিয়া নহে, পরবর্ত্তী রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ মধ্যেও কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং দিগ্বিজয়ী ১ম ধর্ম্মপালের অব্যবহিত পরে অজ্ঞাতনামা গৌড়েশ্বরের অথবা লাউসেন বা ইছাই ঘোষের অভ্যুদয় হইতে পারে না। এ অবস্থায় যে ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পর লাউসেনের অভ্যুদয়, তিনি ১ম ধর্ম্মপাল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি হইতেছেন। এখন সেই ধর্ম্মপাল কে ছিলেন, তাহা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। পালবংশের ইতিহাসে দুই জন ধর্ম্মপালের নাম পাওয়া যায়, একজন হইতেছেন—সমস্ত গৌড়বঙ্গের অধীশ্বর ১ম ধর্ম্মপাল, অপর হইতেছেন—দণ্ডভুক্তির অধিপতি রাজেন্দ্রচোলের সমসাময়িক ২য় ধর্ম্মপাল। প্রথম ধর্ম্মপালের কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, এক্ষণে দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে কিছু বলিব। কাঞ্চীপতি রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়গিরি-লিপিতে আছে—"মধুকরবৃন্দপূর্ণ উদ্যানবিশিষ্ট তন্দবুত্তি—ঘোরতর যুদ্ধে ধর্ম্মপালকে নিহত করিয়া তিনি যে প্রদেশ দখল করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ তক্কন-লাড়ন্ (দক্ষিণরাঢ়)—প্রবলবেগে রণশূরকে আক্রমণ করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। বঙ্গালদেশ যেখানে ঝড়-জলের কখন বিরাম নাই, গজপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যেস্থান হইতে গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন। মুক্তাগর্ভ সাগরের ন্যায় রত্নসমৃদ্ধ উত্তির-লাড়ন্ (উত্তররাঢ়) ও গঙ্গা—বালুকা-গর্ভসমূহ যাহার তীর্থ জলরাশি চুম্বন করিতেছে, যেখানে কর্ণভূষণ, পাদুকা ও বলয়ভূষিত মহীপালকে অগ্নিময় রণক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য করিয়া তাঁহার অসম্ভব বলশালী গজসমূহ ও রমনীসমূহ (রাজেন্দ্রচোল) করায়ত্ত করিয়াছিলেন।"

উদ্ধৃত সমসমায়িক-লিপির প্রমাণে জানিতেছি, গৌড়-বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশের নৃপতিগণের মধ্যে কেবল ধর্ম্মপালই নিহত হইয়াছিলেন, অপর কোন নৃপতির এরূপ মৃত্যু-সংবাদ নাই। প্রাচীন তামিলভাষায় লিখিত উক্ত 'তন্দবুত্তি' সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে 'দণ্ডভুক্তি' নামে পরিচিত হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, দণ্ডভুক্তি কোথায়?

গত যশোরের সাহিত্য-সম্মিলনে ইতিহাস-শাখায় বগুড়ার ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন মহাশয় দণ্ডভুক্তি সম্বন্ধে একটী সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠ
দণ্ডভুক্তি করেন। তিনি দেখাইয়াছেন, রামচরিতের সংস্কৃত দণ্ডভুক্তি শব্দ রাজেন্দ্র চোলের তামিল শিলালিপিতে 'তন্দবুত্তি' এবং মুসলমান আমলে 'আইন-

আক্‌বরী'তে সরকার তণ্ডা বা তাঁড়া নামে উক্ত হইয়াছে। তাঁহার মতে মুর্শিদাবাদ জেলার অধিকাংশ ও বীরভূমের কিয়দংশ উক্ত সরকারের অন্তর্গত ছিল। আমি এখন আলোচনা করিয়া দেখিতেছি, মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ ও বীরভূম জেলার সমস্ত উত্তরাংশ অজয়নদীর তীর পর্য্যন্ত এবং বর্ত্তমান মালদহ ও রাজসাহী জেলার সর্ব্বদক্ষিণ অংশ একসময়ে দণ্ডভুক্তি নামে পরিচিত ছিল। সুখের বিষয়, উক্ত সাহিত্য-সম্মিলনে বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষ হইতে মহারাজকুমার নিজেও "বীরভূমের অজয়-তীরবর্ত্তী ঐতিহাসিক সম্পদ্‌" শীর্ষক একটী সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি অজয়-তীরবর্ত্তী দণ্ডেশ্বর এবং ময়ূরাক্ষী-তীরবর্ত্তী দণ্ডক (দাঁড়কা) গ্রামে অধিষ্ঠিত দণ্ডেশ্বরের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন এবং উভয় দণ্ডেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী ১৫।১৬ ক্রোশ ব্যবধান মধ্যে যেরূপ বহুতর বৌদ্ধ ও শৈবকীর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে এইস্থান যে একসময়ে দণ্ডক বা দণ্ডভুক্তি নামে পরিচিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। মহারাজকুমার লিখিয়াছেন—"আশ্চর্য্যের বিষয় অজয়ের ২।৩ মাইল দূরবর্ত্তী ফুলঝোড়া গ্রামে যেরূপ দশভুজ ক্ষেত্রপাল আবিষ্কৃত হইয়াছে, ময়ূরাক্ষীতীরস্থিত দণ্ডেশ্বর হইতে ২।৩ মাইল দূরবর্ত্তী ঝলুকা গ্রামে ঠিক ঐরূপই আর একটী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তি দুইটীর মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দুইটী দণ্ডেশ্বরের মধ্যে প্রায় ১৫।১৬ ক্রোশ পথ ব্যবধান।" আমি মনে করি, দণ্ড-ভুক্তিপতি তাঁহার রাজ্যের চারিপার্শ্বে ও মধ্যভাগে একই নামে একই প্রকার শিব ও ক্ষেত্রপাল-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এই রাজ্যের নিকটেই লাউসেনের পিতৃরাজ্য সেনভূম। সেনভূম-নৃপতির সহিত দণ্ডভুক্তিপতির অতি নিকট সম্বন্ধ থাকাই সম্ভব। রূপরাম ও সীতারাম দাসের ধর্ম্মমঙ্গল হইতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে যেন তাঁহার মহাসামন্তরূপে কর্ণসেন সেন-ভূম অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। বলা বাহুল্য উক্ত দণ্ডভুক্তিপতি ধর্ম্মপালকেই কর্ণ-সেনের অধিরাজরূপে গণ্য করিতে হয়। রাজেন্দ্রচোলের আক্রমণকালে ধর্ম্ম-পালের পক্ষে থাকিয়া কাঞ্চীপতির সহিত কর্ণসেনও যুদ্ধ করিতে পারেন। তিরুমলয়-লিপিতে তাঁহার নাম উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহার অধিরাজ ধর্ম্মপালের নামোল্লেখই যথেষ্ট। তৎপরে কাঞ্চীপতির সহিত মহাসমরে দণ্ডভুক্তিপতি ধর্ম্মপাল নিহত হইলে দেশে যখন অরাজকতা ঘটিয়া-ছিল, সেই সুযোগে কর্ণসেন বারভূঞার মধ্যে প্রধান হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা

করিয়া থাকিবেন এবং আপনার রাজপদ সুদৃঢ় করিবার জন্য ত্রিষষ্টিগড়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তৎপরে সোমঘোষ তাঁহার চারি পুত্রকে বিনাশ করিয়া তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইয়া নিজে ঢেকুরের রাজা হইয়া বসেন। সুতরাং রাজেন্দ্র-চোলের প্রত্যাগমনের পর কর্ণসেনের প্রকৃতপ্রস্তাবে অভ্যুদয় বলিতে হইবে।

ধর্ম্মমঙ্গলোক্ত ধর্ম্মপালের পুত্রকে লইয়া বড় গোল। বিভিন্ন ধর্ম্মমঙ্গলে বিভিন্নমত দেখা যায়। কোন ধর্ম্মমঙ্গলের মতে এই রাজা অপুত্রক কাল-গ্রাসে পতিত হইলে রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হয়। তৎপরে পাটহস্তী বন হইতে একজনকে আনিয়া উপস্থিত করিলে পাত্র-মিত্রগণ তাঁহাকেই রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল-মতে সমুদ্রতট হইতে আনীত তাহার এক ক্ষেত্রজ পুত্র রাজা হইয়াছিলেন। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলে পাওয়া যায়, ধর্ম্মপাল একজন কৃষ্ণভক্ত ও ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। তিনি প্রতিদিন ভারতপুরাণ শ্রবণ করিতেন এবং ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া জলগ্রহণ করিতেন। তাঁহার মহিষী সাকুলার সেরূপ মতিগতি ছিল না, তাঁহার অনুরূপ মতি থাকায় রাজা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। ঘটনাক্রমে সমুদ্র-তীরে সমুদ্রের ঔরসে তাঁহার গর্ভে একপুত্র জন্মগ্রহণ করে। ধর্ম্মপালের মৃত্যু হইলে পর পুষ্যাযোগে পাটহস্তী বনে গিয়া সাকুলার কুটীরের নিকট উপস্থিত হইল এবং সেই পুত্রকে পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া আসিল। সেই পুত্রই পরে গৌড়েশ্বর নামে পরিচিত হইলেন। এ দিকে ঘনরাম তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গলে গৌড়েশ্বরকেই ধর্ম্মপালের বীর্য্যবন্ত পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এখানে ঘনরামের কথা সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রাচীন বলিয়া গ্রহণযোগ্য নহে। পালবংশ রামচরিতে "সিন্ধুকুলজ" বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। মাণিক গাঙ্গুলী আভাসে তাহারই সমর্থন করিয়াছেন। তবে ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পর তাঁহার অধিকার মধ্যে উত্তরাধিকারীর অভাবে যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা একাধিক ধর্ম্মমঙ্গলে পাইতেছি। সে সময়ে 'সমুদ্রকুলজ' অর্থাৎ যে বংশে ধর্ম্মপালের জন্ম হইয়াছিল, সেই বংশীয় আর এক ব্যক্তি পাত্র-মিত্রকর্ত্তৃক দণ্ডভুক্তির রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। সেই রাজার প্রকৃত নাম ছাড়িয়া দিয়া ধর্ম্মমঙ্গল-রচয়িতৃগণ তাঁহাকে কেবল গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বাঙ্গালাদেশে আসিয়া রাজেন্দ্রচোল যথাক্রমে ধর্ম্মপাল, রণশূর, গোবিন্দচন্দ্র ও মহীপালকে

পরাজয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে মহীপাল কেবল উত্তররাঢ়ের মহীপতি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, সার্ব্বভৌম নৃপতি বলিয়া পরিচিত হন নাই। সম্ভবতঃ এই মহীপালের হস্তে বাধা প্রাপ্ত হইয়া রাজেন্দ্রচোল দক্ষিণাপথে ফিরিয়া আসেন। রাজেন্দ্রচোলের আগমনের কিছু পূর্ব্বে বরেন্দ্রভূমির কতকটা দণ্ডভুক্তিপতি ধর্ম্মপালের অধিকারভুক্ত ছিল। আমরা নেপাল হইতে আবিষ্কৃত হরিচরিতকাব্যপাঠে জানিতে পারি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে কাশ্যপ-গোত্রের বীজী সুষেণের ৮ম পুত্র অধস্তন স্বর্ণরেখ এই ধর্ম্মপালের নিকট হইতে 'করঞ্জ' নামক গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। রঙ্গপুর অঞ্চলে ধর্ম্মপালসম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। এক সময়ে সেই রঙ্গপুরের ধর্ম্মপাল ও দণ্ডভুক্তিপতি ধর্ম্মপালকে আমি অভিন্ন মনে করিয়াছিলাম। এখন কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতি ও বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির অনুসন্ধানের ফলে বুঝিতেছি উভয় ধর্ম্মপালের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। রঙ্গপুরের ধর্ম্মপাল হইতেছেন ভগদত্ত-বংশীয় এবং দণ্ডভুক্তির ধর্ম্মপাল বোধ হয় সমুদ্রকুলজ বা গৌড়ের সুপ্রসিদ্ধ পালবংশীয়।

পূর্ব্বেই দণ্ডভুক্তির অবস্থান-প্রসঙ্গে লিখিয়াছি, মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর ও পশ্চিমাংশ এবং বীরভূম জেলার অধিকাংশ দণ্ডভুক্তি নামে পরিচিত ছিল। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার অপরাংশ এবং বর্দ্ধমান জেলার উত্তরাংশ তৎকালে উত্তররাঢ় বলিয়া পরিচিত হইত। এই উত্তররাঢ়ের মহীপতি ছিলেন—মহীপাল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ধর্ম্মপালের অধিকারের পার্শ্বেই মহীপালের অধিকার বিস্তৃত ছিল। এই মহীপালই ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পর দণ্ডভুক্তি অধিকার করিয়া সমস্ত গৌড়ের অধীশ্বররূপে পরিচিত হইয়া থাকিবেন। এই মহীপাল যে সময় সমস্ত গৌড়বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন, সেই সময় ইছাই ঘোষ ও লাউ-সেনের অভ্যুদয়। এই ১ম মহীপালের বাণগড় হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে এইরূপ লিখিত আছে,— মহীপাল

"হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদর্পাদনধিকৃতবিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যং।
নিহিতচরণপদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধ্নি তস্মাদভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ॥"

(১ম মহীপালের বাণগড়লিপি ১২ শ্লোক)

অর্থাৎ শ্রীমহীপালদেব যুদ্ধস্থলে বাহুদর্পে সকল বিপক্ষপক্ষ নিহত করিয়া অনধিকৃত ও বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধারপূর্ব্বক ভূপালগণের মস্তকে পদকমল স্থাপিত করিয়া অবনীপাল হইয়াছিলেন। এই বর্ণনা হইতে মনে হইবে যে,

১ম মহীপালের সার্ব্বভৌম-পদলাভের পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃরাজ্য পরহস্তগত ও বিলুপ্ত হইয়াছিল, পরে তিনি অতিকষ্টে সেই সকল উদ্ধার করিয়াছিলেন। আমি মনে করি, ১ম মহীপালের প্রথম অভ্যুদয়কালে উত্তর রাঢ়েন্দ্র কাম্বোজবংশের, এবং বরেন্দ্রের কতকটা ও সমস্ত দণ্ডভুক্তি ধর্ম্মপালের করায়ত্ত হইয়াছিল। ধর্ম্মমঙ্গল-রচয়িতৃগণ যেরূপ লাউসেনের পূর্ব্বপুরুষগণের বংশ-পরিচয় দিয়াছেন, ধর্ম্মপালসম্বন্ধে সেরূপ কোন কথা লেখেন নাই। ইহাতে মনে হয় ধর্ম্মপাল পালবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার পিতা বা পিতামহ রাজ্যভোগ করেন নাই। এজন্য ২য় ধর্ম্মপালের পিতৃপুরুষগণের নাম সম্ভবতঃ সাধারণের অজ্ঞাত ছিল। তিনি দণ্ডভুক্তি অধিকার করিয়া প্রজাগণের মনোরঞ্জন অনেক কাজ করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সকল ধর্ম্মমঙ্গল হইতেই বুঝা যায়, যে ধর্ম্মপাল ধর্ম্মভক্ত বা বৌদ্ধ ছিলেন না। তিনি নিজে বৌদ্ধ না হইলেও বৌদ্ধদিগের সহিত যে তাঁহার আত্মীয়তা বা ঘনিষ্ঠতা ছিল, মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল হইতে তৎপত্নী সাঙ্কুলার পরিচয়-প্রসঙ্গে বুঝা যায়। সম্ভবতঃ তাঁহারই সময় দণ্ডভুক্তি-রাজ্যের চারিদিকে দণ্ডেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ এবং শিল্পনৈপুণ্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন নানা প্রকার হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। আশা করি বীরভূম-বিবরণের দ্বিতীয় খণ্ডে দণ্ডভুক্তির বিস্তৃত বিবরণের সঙ্গে সেই সকল সুপ্রাচীন দেবদেবীর মূর্ত্তি-পরিচয় ও শিল্পনৈপুণ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইবে।

পুরাতন পঞ্জিকাসমূহে কলিযুগের রাজচক্রবর্ত্তিগণের তালিকায় মহীপালের সহিত লাউসেনের নাম একত্র পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য লাউসেন কখনও রাজাধিরাজ হইতে পারেন নাই। তাঁহার পিতা সোমঘোষের কাছে ঢেকুর বা সেনভূম হারাইয়া পরে গৌড়েশ্বর (১ম মহীপালের কৃপায়) ময়নাগড়ের সামন্তরাজরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পরে লাউসেন সোমঘোষের বেটা ইছাইঘোষকে পরাজয় করিয়া পুনরায় ঢেকুর বা সেনভূম রাজ্য উদ্ধার করেন। তিনি গৌড়েশ্বরের হইয়া অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা সকল ধর্ম্মমঙ্গল হইতেই জানা যায়। লাউসেনের সাহায্যে মহীপাল অনধিকৃত ও বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই সম্ভবতঃ রাজচক্রবর্ত্তী মহীপালের সহিত লাউসেনের নাম পঞ্জিকাসমূহে গৃহীত হইয়াছে। বাস্তবিক মহীপালের নাম সমস্ত গৌড়বঙ্গে সর্ব্বত্র এত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল যে, এক সময়ে গৌড়েশ্বর বলিলে তাঁহাকেই বুঝাইত। এ কারণে ধর্ম্মমঙ্গলসমূহে

সর্ব্বত্রই কেবল গৌড়েশ্বরের নাম দৃষ্ট হয়। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলে গৌড়েশ্বরের স্থানে 'মহীপাল' নামও পাওয়া যায়। যথা—

"জামা-যোড়া পরিধান বিচিত্র-বসন।
লাউসেনে মহীপাল দিলেন তখন॥" (১১২ পৃষ্ঠা)
"মহীপাল আদি সবে মগ্ন হয়ে রয়।
না কহিতে লাউসেন দিল পরিচয়॥" (১১৪ পৃষ্ঠা)

এখন পুনরায় আলোচনা করিয়া বুঝিতেছি, রাজেন্দ্রচোলের প্রত্যাবর্ত্তনের পরই মহীপালের রাজ্য-বিস্তার-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। বারাণসী পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। কেবল রাজ্য-বিস্তার বলিয়া নহে, তাঁহার অভ্যুদয়ের সঙ্গে দীপঙ্কর অতীশ ও রামাই পণ্ডিত প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যগণের যত্নে অভিনব সাজে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাচ্যভারতে দেখা দিয়াছিল। এই ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে মহাবীর লাউসেন একপ্রকার অগ্রণী ছিলেন, সকল ধর্ম্মমঙ্গল হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। লাউসেন পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া সেনভূমে অধিষ্ঠিত হইলে. তাঁহার যত্নে এখানে নবোদিত বৌদ্ধধর্ম্মের কিছু দিনের জন্ম যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল, সেই সময়েই সম্ভবতঃ সুঙ্কেশ্বরী প্রভৃতি নানা বৌদ্ধ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। আলোচ্য গ্রন্থে যে সুঙ্কেশ্বরী দেবীর পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে তিনি বৌদ্ধতন্ত্রে 'মহত্তরী তারা' নামে পরিচিতা। বৌদ্ধ-সাধনমালাতন্ত্রে মহত্তরী তারার এইরূপ সাধন বর্ণিত হইয়াছে— সুঙ্কেশ্বরী

"তারাং শ্যামাং দ্বিভুজাং দক্ষিণে বরদাং বামে সনালেন্দীবরধরাং সর্ব্বাভরণ-ভূষিতাং পদ্মচন্দ্রাসনে পর্য্যঙ্কনিষণ্ণাং বিচিন্তয়েৎ।"

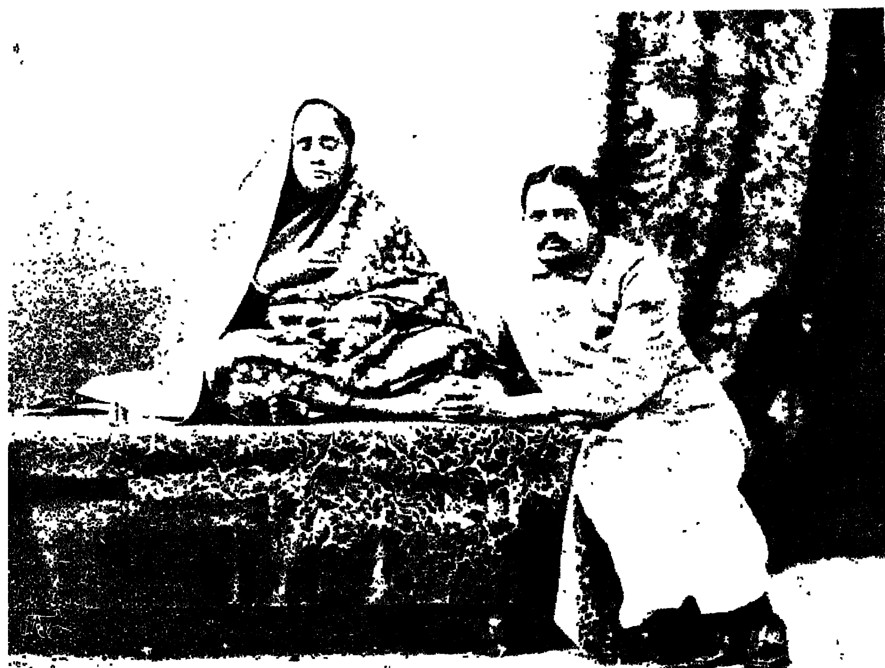
উক্ত সাধনের সহিত সুঙ্কেশ্বরী দেবীর সম্পূর্ণ মিল আছে। এই দেবীর পাদপীঠে "যে ধর্ম্মা হেতু প্রভবাঃ" ইত্যাদি যে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল সূত্র খোদিত আছে, সেই লিপির অক্ষরগুলি দেখিলেই তাহা খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর গৌড়ীয়-লিপি বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়।

গ্রন্থকার যেরূপ বিশদভাবে লাউসেনের পরিচয় দিয়াছেন, পূর্ব্বে কেহই এরূপ পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তথাপি বলিতে বাধ্য, সেনভূমির ও দণ্ডভুক্তির উপযুক্ত পরিচয় দিবার এখনও যথেষ্ট উপকরণ পড়িয়া আছে, বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির চেষ্টায় এবং মহারাজকুমারের উৎসাহে সেই সকল অতীত কীর্ত্তির পরিচয় আবিষ্কৃত হইলে কেবল বীরভূম বলিয়া নহে, সমস্ত প্রাচ্যভারত গৌরবান্বিত হইবে।

আলোচ্য গ্রন্থে মহারাজকুমার বীরভূমের অতীত কাহিনীর যে আলেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন, ইহা পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, বীরভূম গৌড়বঙ্গের অতীত-কীর্ত্তির একটী মহাশ্মশান। বীরভূমের অনুসন্ধান করিবার যথেষ্ট উপকরণ এখনও চারিদিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। আমরা আশা করিতেছি, মহারাজকুমারের ঐতিহাসিক অনুরাগ ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের ফলে ভবিষ্যতে আমরা আরও অনেক বিষয় অবগত হইতে পারিব এবং যে উদ্দেশ্যে বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক তখন সার্থক হইবে। তাই আমরা বীরভূম-বিবরণের অবশিষ্ট খণ্ড দেখিবার জন্য আশা প্রতীক্ষায় রহিলাম। উপযুক্ত অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের সঙ্গে প্রকৃতরূপে বীরভূমের পুরাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, দেবতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব ও মানবতত্ত্ব আলোচনা করিবারও আমরা যথেষ্ট সুবিধা পাইব।

বিশ্বকোষ-কুটীর
৯ বিশ্বকোষ লেন, কলিকাতা
মহালয়া, ১৩২৩।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
(বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির সভাপতি)



স্বর্গীয়া মহারাণী পদ্মসুন্দরী দেবী

হেতমপুর-কাহিনী

প্রথম অধ্যায়

ছায়া

হেতমপুর-গ্রামের অবস্থান

বীরভূম জেলার অন্তর্গত হেতমপুর একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। উহা সদর ষ্টেশন সিউড়ির প্রায় তের মাইল দক্ষিণে ও অণ্ডাল-সিঁথিয়া-কর্ড লাইনের মধ্যবর্ত্তী দুবরাজপুর ষ্টেশনের প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। গ্রামখানি অতিশয় বৃহৎ না হইলেও নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। ইহা প্রধানতঃ হেতমপুর, রাধাবল্লভপুর, আসদগঞ্জ, বরকতিপুর খাঁ বজরপুর, সীতারামপুর, রসিকবাজার, ও ধামুড়িয়া—এই কয় পল্লীতে বিভক্ত; কিন্তু হেতমপুর পল্লী প্রথম স্থাপিত বলিয়া সমগ্র গ্রামখানি হেতমপুর নামেই সুপরিচিত। স্বনামখ্যাত ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত মহারাজ রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ইহার বর্ত্তমান অধিপতি; তদনুসারে ইহা "হেতমপুর-রাজবাটী" নামে প্রসিদ্ধ।

হেতমপুরে হিন্দু-মুসলমান ইতর-ভদ্র সকল শ্রেণীর লোকের বসতি আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বাস করে। ব্রাহ্মণপাড়া, কায়স্থপাড়া, তাঁতিপাড়া, পোদ্দারপাড়া, কলুপাড়া, নড়িপাড়া, বাগ্দীপাড়া, ডোমপাড়া, হাড়িপাড়া, বাউড়িপাড়া সমস্তই পৃথক্ পৃথক্ পল্লী। ভদ্রপল্লীর মধ্যে ইতর-জাতির বাস নাই। সমগ্র গ্রামের অধিবাসিসংখ্যা সার্দ্ধ দ্বিসহস্রেরও অধিক।*

দুবরাজপুর হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গিয়া হেতমপুরে প্রবেশ করিতে হয়। একটি সুপ্রশস্ত রাজপথ দুবরাজপুর হইতে বহির্গত হইয়া হেতমপুরের মধ্য দিয়া ইলামবাজার অভিমুখে গিয়াছে। ফলতঃ হেতমপুরের পশ্চিমদিক্ই সদর দিক্। দুবরাজপুরের সীমা অতিক্রম করিয়া প্রথমেই "মান-মায়ের" কলেজ-বোর্ডিং

* ১৯১০ খৃষ্টাব্দের সেন্সস্ রিপোর্টে হেতমপুরের লোকসংখ্যা ২৫০৩ হইয়াছে।

দৃষ্টিগোচর হয়। হেতমপুর-কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের ছাত্রগণ এই স্থানে বাস করেন। রাজপথের উত্তরপার্শ্বে "মান-সায়ের" নামক একটি স্বচ্ছসলিলা ক্ষুদ্র সরসী আছে, তাহার তীরে এই ছাত্রাবাস স্থাপিত বলিয়া উহা "মান-সায়ের-কলেজ-বোর্ডিং" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ছাত্রাবাসের একপার্শ্বে একটি সংস্কৃতচতুষ্পাঠীও আছে। এই ছাত্রাবাস বনপ্রান্তে স্থাপিত হওয়ায় ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয়। ছাত্রাবাসের উত্তরে শস্যক্ষেত্র, দক্ষিণে রাজবর্ত্ম, পশ্চিমে "মানসরোবর" এবং পূর্ব্বে শালবন। এই স্থানটি অধ্যয়নশীল ছাত্রবৃন্দের অধ্যয়নরবে সতত মুখরিত। বিশেষতঃ অরণ্যপ্রান্তে সংস্কৃতচতুষ্পাঠীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পুরাকালের সেই শিষ্যপরিবৃত ঋষির আশ্রম বলিয়া বোধ হয়।

হেতমপুরের বর্ত্তমান সীমা ও অবস্থার বিবরণ

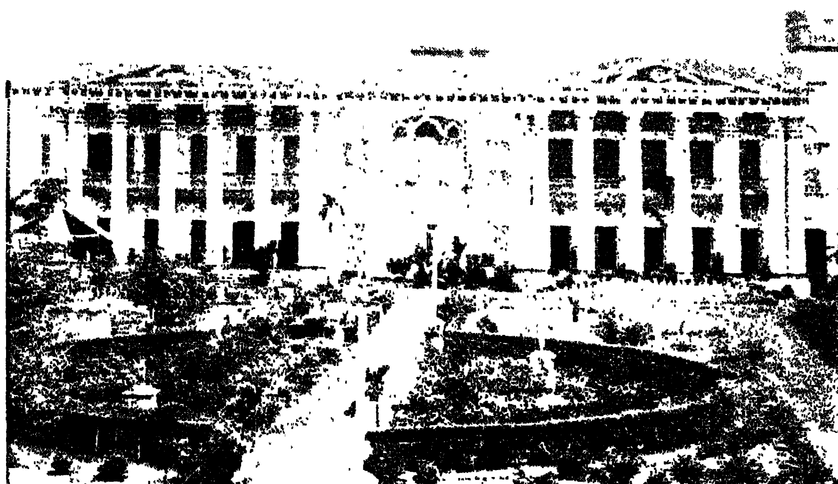
মানসায়ের-বোর্ডিং ও গ্রামের মধ্যস্থলে শালবন। এই অরণ্য প্রধানতঃ শালতরু দ্বারা সুশোভিত ও মধ্যগত রাজপথ দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত। বনের উত্তরাংশ "আঁধারকুলি" ও দক্ষিণাংশ "তালবেড়িয়া" নামে পরিচিত। ঋতুরাজ বসন্ত সমাগমে বনবিটপীসমূহ দীর্ঘকালপরিহিত পুরাতন পত্রবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক নবীন পল্লবে ও কুসুমভূষণে সুসজ্জিত হইয়া থাকে এবং মলয়ানিলসঞ্চারিত কুসুম-সৌরভে দশদিক্ আমোদিত করে। ফলতঃ সেই ভ্রমরগুঞ্জিত ও কোকিলকূজিত বসন্তের বনস্থলী একাধারে বিলাসীর বিলাসকুঞ্জ ও বিরাগীর শান্তিনিকেতন।

বনমধ্যস্থ রাজপথের মধ্যস্থল হইতে "গৌরাঙ্গমন্দিরের" অভ্রভেদী চূড়াসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। বনের পূর্ব্বপ্রান্তে পথিপার্শ্বেই মনোহর "গৌরাঙ্গভবন।" উহা দুই ভাগে বিভক্ত। শ্রীমন্দিরের পশ্চাদ্দেশে ভোগমন্দির ও সম্মুখে প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিক্ ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহদ্বারা পরিবেষ্টিত, পূর্ব্বপশ্চিমে দুইটি তোরণ ও মধ্যে নাট্‌শালা। পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট দক্ষিণদ্বারী মন্দিরাভ্যন্তরে শ্বেতমর্ম্মরবিনির্ম্মিত বেদিকার উপর গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের ধাতবমূর্ত্তি বিরাজিত।* মূর্ত্তিগুলি অতি সুন্দর। যে রূপের ছটায় একদিন সমগ্র বঙ্গভূমি আলোকিত হইয়াছিল, এবং জগাই মাধাইয়ের মত কত পাষণ্ডের আঁধারহৃদয় ধর্ম্মালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, এ সেই অপরূপ রূপমাধুরী—সেই ভুবনভুলান মোহনমূর্ত্তি। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত গৃহ আছে, তন্মধ্যে অতিথি, অভ্যাগত, সাধু, বৈষ্ণব ও ভিক্ষুকগণ আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মহাপ্রভুর প্রসাদ প্রাপ্ত হন। নাট্‌শালার দক্ষিণে গৌরাঙ্গমন্দিরের অনুরূপ আর একটি মন্দিরে স্বর্গীয়া মহারাণী পদ্মসুন্দরী দেবীর পাষাণময়ীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই ভক্তিমতী মহারাণীর আন্তরিক যত্নে গৌরাঙ্গ-

* ঐ মূর্ত্তির চিত্র অপর পত্রে দ্রষ্টব্য



ডাংমপাল শ্রীগৌরাঙ্গ



হেতমপুর— রঞ্জন-প্রাসাদ।

ভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; তজ্জন্ত তাঁহার স্বর্গারোহণের পর মহারাজ বাহাদুর এই দেবী-প্রতিমা স্থাপন করিয়াছেন। মহিষীর মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয়, যেন তিনি যোগাসনে উপবিষ্টা হইয়া ভক্তিভাবে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শন করিতেছেন। মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রস্তরফলকে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত আছে :—

রাণী পদ্মসুন্দরী দেবী
জন্ম ১২৬০।২৫ জ্যৈষ্ঠ
মৃত্যু ১৩১৩।৫ অগ্রহায়ণ
শ্রীরামরঞ্জনভক্ত ভূপতিমহিলা
নারীশিরোমণি গুণবতী পুণ্যশীলা
উত্তাল তরঙ্গ ভবজলধি ভীষণ
পরিত্রাণ হেতু সেতু করিলা বন্ধন
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রীমূর্ত্তিপ্রকাশ
পরম পাবন কৃষ্ণ কীর্ত্তনবিলাস
অন্তিমে অন্তিমপতি স্মরি নারায়ণ
অনিত্য ছাড়িয়া দিব্যধামেতে গমন
১৩১৪।২ ফাল্‌গুন

এই গৌরাঙ্গভবনের পূর্ব্বদিকে ও রাজবর্ত্মের উত্তরে অনুচ্চ ইষ্টকপ্রাচীর-বেষ্টিত ও পুষ্পোদ্যানশোভিত মহারাজভবন। মহারাজ বাহাদুরের কোন আত্মীয়-কুটুম্ব অথবা সম্ভ্রান্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আগমন করিলে তাঁহারা এই সুসজ্জিত প্রাসাদেই অবস্থান করেন। মহারাজভবনের পূর্ব্বদিকে আম্রকাননের মধ্যে রাজকাছারিগৃহ।

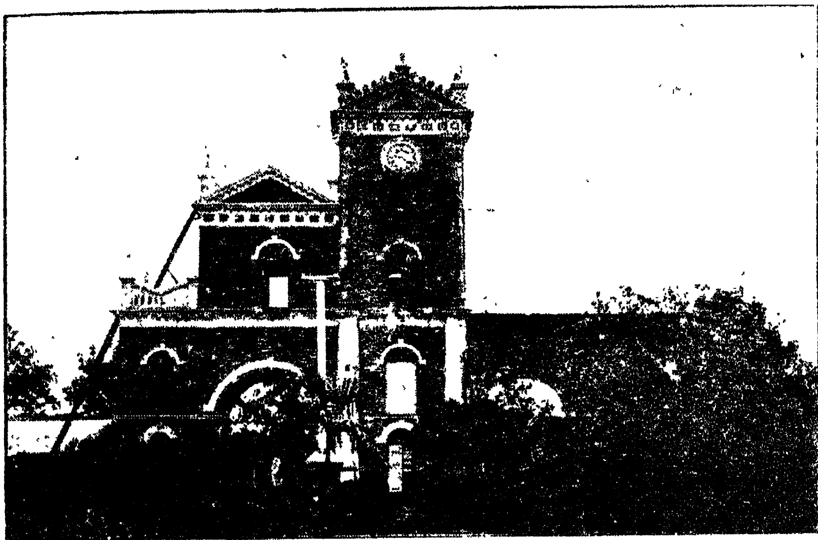
মহারাজভবন ও রাজপথের দক্ষিণে উচ্চ ইষ্টকপ্রাচীরবেষ্টিত মনোহর "রঞ্জনপ্রাসাদ।" রঞ্জনপ্রাসাদের তুল্য উচ্চ ও বৃহৎ অট্টালিকা বীরভূমের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা বহুদ্বারবিশিষ্ট বলিয়া সর্ব্বসাধারণে ইহাকে "হাজারদুয়ারী" বলে। হাজারদুয়ারীর সম্মুখে দুইটি সিংহদ্বারবিশিষ্ট অতি উচ্চ তোরণ, তদুপরি বহুমূল্য "টাউয়ার ক্লক্" সুশোভিত। এই ঘড়ির শব্দ বহুদূর

হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানকালে রাজপরিবার রঞ্জনপ্রাসাদে বাস করিতেছেন, এজন্য ইহাকে "নূতন রাজবাড়ী" বলে।

নূতন রাজবাড়ীর পরে গ্রামের প্রবেশপথে আর একটি ছাত্রাবাস আছে, সেটি স্কুলবোর্ডিং। হেতমপুর-হাইস্কুলের অনেকগুলি ছাত্র এখানে বাস করেন। স্কুলবোর্ডিংয়ের দক্ষিণাংশ কায়স্থপাড়া বা সীতারামপুর নামে অভিহিত। এই ছাত্রাবাসের পশ্চিমে "মুন্সীপুকুর" নামক একটি উচ্চ পাড়বিশিষ্ট পুরাতন পুষ্করিণী ও পূর্ব্বে মুন্সীর ভগ্নপ্রায় দ্বিতল অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশানচন্দ্র সেন(১) নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত সুবর্ণবণিক্ হেতমপুর-রাজষ্টেটে মুন্সীগিরি করিতেন। তিনি ঈশান মুন্সী নামে পরিচিত ছিলেন। ঈশান মুন্সী বিস্তর অর্থ ও বিষয়সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া এই বাড়ী নির্ম্মাণ ও মুন্সীপুকুর খনন করিয়াছিলেন এবং বাড়ীর মধ্যে ইষ্টকনির্ম্মিত শিবালয় ও চণ্ডীমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া শিবদুর্গা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রতিবৎসর মহা সমারোহে দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইত, কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষাবস্থায় বিষয়সম্পত্তি ও উৎসব-আনন্দ অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন কেবল পুরাতন বাড়ী ও তন্মধ্যে ভগ্নপ্রায় দেবালয় এবং এই মুন্সীপুকুর তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। তাঁহার বংশধরেরা এখন চাকুরী প্রভৃতির দ্বারা কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

ঈশান মুন্সীর বাড়ীর দক্ষিণাংশ সুবর্ণ-বণিক্‌গণের আবাসভূমি বলিয়া ইহা সাধারণতঃ "পোদ্দারপাড়া" নামে অভিহিত। পোদ্দারপাড়ার দক্ষিণে "গোবিন্দ-সায়ের" নামক একটি বৃহৎ জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। গোবিন্দসায়েরের ঈশানকোণে "কৃষ্ণচন্দ্র-কলেজ"। কলেজ-গৃহ দ্বিতল; উপর তলে কলেজ ও নীচের তলে এণ্ট্রেন্স স্কুল। স্কুল-কলেজের দক্ষিণে একটি বৃহৎ বাংলা আছে, উহা "বড় আটচালা" নামে পরিচিত। বড় আটচালায় কলেজের প্রিন্সিপাল মহোদয়ের বাসা। স্কুলকলেজের দক্ষিণে আর একপার্শ্বে দাতব্য চিকিৎসালয়, অন্যপার্শ্বে পোষ্টাফিস ও টেলিগ্রাফ আফিস। তাহার কিয়দ্দূর দক্ষিণে রাজপথের একদিকে টোলঘর নামক একটি ঘর, অন্যদিকে "লালদীঘী" নামক পুষ্করিণীর তটসংলগ্ন "রোজি ভিল্লা" বা বারদুয়ারী গৃহ। লালদীঘীর দক্ষিণে বাঁধাঘাটের

(১) ইহার প্রকৃত নাম কুঁচিলচন্দ্র সেন। বর্ত্তমান হেতমপুরপতি রামরঞ্জনের পিতামহ বিপ্রচরণ, কুচিলের পরিবর্ত্তে ঈশান নাম দিয়াছিলেন, কারণ বিপ্রচরণের কুচিলনামে এক খুল্লতাত ছিলেন। ঐ নাম ধরিয়া সম্বোধন করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন নাই, তাই এইরূপ নামের পরিবর্ত্তন।



বীরভূম-বিবরণ



উপর পাঁচটি পুরাতন শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। এই স্থানটির নাম "কদমতলা", কদমতলার দক্ষিণে ছোটতরফের প্রতিষ্ঠিত তিনটি শিবালয় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার দক্ষিণে পুরাতন রাজবাড়ী। পুরাতন রাজবাড়ী অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। এখানে মহারাজ বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺রাধাবল্লভজীউ নামক রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি বিরাজিত ও এই বাড়ীতে সরস্বতীপূজা হইয়া থাকে বলিয়া ইহা "ঠাকুরবাড়ী" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঠাকুরবাড়ীসংলগ্ন আর একটি পৃথক্ বাড়ীতে ৺মনসাদেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন, উহা মনসাবাড়ী নামে খ্যাত। পর্ব্ব ও শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে এই ঠাকুরবাড়ীতে ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রভৃতি সম্পন্ন হয়। রাজবংশীয় বরকন্যার বিবাহ-কুশণ্ডিকা প্রভৃতি মনসাবাড়ীতে সম্পন্ন হইবার প্রথা প্রচলিত আছে।

পুরাতন রাজবাড়ীর উত্তরাংশ রাধাবল্লভপুর ও দক্ষিণাংশ ঠাকুরপাড়া নামে প্রসিদ্ধ। এতদুভয়পল্লীতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস। শুনিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে এই স্থানে আড়াই শত ঘর ব্রাহ্মণের বসতি ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানকালে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছে। ঠাকুরপাড়ায় ৺রসিকনাগরজীউ ও ৺গোপালজীউর দুইটি প্রাচীন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। শিষ্যব্যবসায়ী অনেকগুলি ঠাকুরসন্তান, এই রসিকনাগরবিগ্রহের সেবাইত। রসিকনাগরের মন্দিরসংলগ্ন একটী শিলাগাত্রে '১৬৪০ সম্বৎ' খোদিত আছে। তদ্দ্বারা অনুমান করা যায় যে, উক্ত সংবতে এই মন্দির নির্ম্মিত ও বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে হেতমপুর গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব্ব এক মাইল ব্যবধানে রামপুরের রায়বংশের জনৈক দৌহিত্র বংশীবদন ঠাকুর উপনয়নকালেই সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিয়া সুদীর্ঘকাল তীর্থপরিভ্রমণের পর ৺বৃন্দাবনে ভেকাশ্রয় করেন। তিনি এখানে একটী শিলামূর্ত্তি পাইয়া ইষ্টদেবতার ন্যায় পূজা করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে তিনি জন্মভূমিদর্শনমানসে রামপুরে আগমন করেন। কিন্তু তথায় কয়েকদিনমাত্র থাকিয়া তিনি হেতমপুর গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে একটী পর্ণকুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করেন ও পূর্ব্বোক্ত বিগ্রহের সেবাপরিচর্য্যা করেন। তাঁহার তিরোভাবের সময় তিনি আপন ভাগিনেয় রসিকলাল রায়কে ডাকিয়া ৺বৃন্দাবন হইতে আনীত বিগ্রহ ও স্বীয় কাষ্ঠপাদুকা প্রদান করেন। রসিকরায় সেই শিলাবিগ্রহের পূজা করিতে থাকেন। পরে ১২৪০ সংবতে রসিকরায় 'রসিকনাগর' নামে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া অনুমান হয়। বংশীবদনের সেই শিলামূর্ত্তি ও

পাদুকা এখনও বর্ত্তমান আছে। বংশীবদন যে স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন তথায় "ঠাকুর-পুকুর" নামক একটী জলাশয় ও একটী প্রাচীন সিমুল-বৃক্ষ বর্ত্তমান আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, বংশীবদন এই সিমুলবৃক্ষতলে বসিয়া ভজন সাধন করিতেন, এবং তিনি স্বয়ং খন্তাদ্বারা উক্ত পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন।

গোপালমন্দিরটি আরও পূর্ব্বেকার স্থাপিত বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। এতৎসম্বন্ধীয় প্রচলিত প্রবাদ ও বিস্তৃত বিবরণ স্থানান্তরে বিবৃত হইবে।

ঠাকুরপাড়ার দক্ষিণে মুসলমানপাড়া। এই মুসলমানপাড়াই প্রকৃত হেতম-পুর। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাঠকবর্গ যথাসময়ে জানিতে পারিবেন।

ইতিপূর্ব্বে যে কদমতলা নামক স্থানের উল্লেখ করিয়াছি, তথায় একটি প্রাচীন বৃহৎ কদম্বৃক্ষ ছিল; কিন্তু সে বৃক্ষটি নষ্ট হইয়াছে। কদমতলার নাম বজায় রাখিবার জন্য বর্ত্তমানকালে তথায় একটি কদম্বের চারা রোপিত হইয়াছে। এই কদমতলার পূর্ব্বদিকে হাটতলা। বহুকালাবধি এই হাট প্রচলিত আছে। প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবারে এই হাটে বহুবিধ তরকারী, মৎস্য প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ আনীত হয় এবং বৃহস্পতিবারে দেশী সূতা ও দেশী কাপড় বিক্রীত হয়। হাটতলার চতুর্দ্দিকে কয়েকটি দোকান আছে, তথায় চাউল, ডাল, লবণ, কলাই, সন্দেশ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ দ্রব্যই পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত রাজপথ এই হাটতলার মধ্য দিয়া বরাবর দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। মধ্যে একটি প্রাচীন অশ্বত্থমূলে সর্ব্বমঙ্গলাদেবীর শিলামূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে "গড়ের মাঠ" নামক সুবিস্তৃত প্রান্তর। এই প্রান্তরমধ্যে একটি গড়বন্দী বাড়ীর ভগ্নস্তূপ ও "শয়ানে বিবির" সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। গড়ের মাঠের পূর্ব্বাংশে "হাপুস্ খাঁর বাঁধ" নামক একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা আছে, ইহার বিশাল গর্ভে বর্ত্তমানকালে শত শত শস্যক্ষেত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। হাপুস্ খাঁর বাঁধের অনতিদূরে ঈশানকোণে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্গ কৃষ্ণনগর নামক পল্লী গ্রামের নিকটবর্ত্তী, বর্ত্তমানকালে লোকে ইহাকে "জয়নগরের গড়" বলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা হেতমপুরের গড়। উক্ত গড়, বাঁধ ও গড়বন্দী বাড়ী এক ব্যক্তিরই নির্ম্মিত ও অধি ছিল। এতৎসম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ যথাস্থলে বিবৃত হইবে।

গড়ের মাঠের পূর্ব্বে ও দক্ষিণে সুবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রসমূহ

প্রাবৃট্‌কালে সুন্দর শ্যামল শোভায় সুশোভিত ও হেমন্তে কনককান্তি-বিভূষিত হইয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য শতগুণে বৃদ্ধি করে, আবার কখন বা শস্যসম্পদ্‌শূন্য হইয়া ভাবুকের মনে সৌন্দর্য্যের নশ্বরতা অঙ্কিত করিয়া দেয়। এই শস্য-ক্ষেত্রের দক্ষিণে ক্ষীণকলেবরা "শালনদী"। বর্ষাগমে এই ক্ষুদ্র তটিনীর কূলপ্লাবী তরঙ্গভঙ্গে উভয় তীরবর্ত্তী ক্ষেত্রসমূহ সমধিক উর্ব্বর ও শস্যশালী হইয়া থাকে।

মানসায়ের বোর্ডিং হইতে শালনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজপথের পার্শ্বে বা নিকটে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। অতঃপর গ্রামের অন্যত্র কোথায় কি আছে, তাহা বলা আবশ্যক।

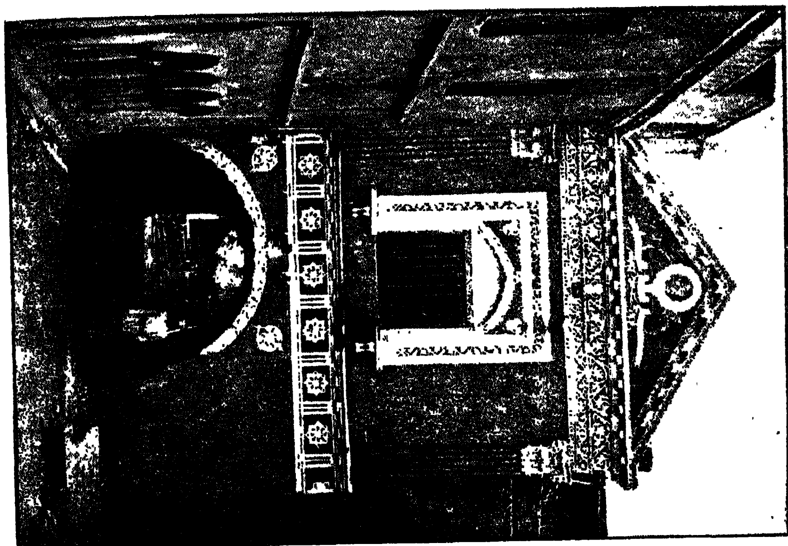
পূর্ব্বকথিত গোবিন্দ-সায়ের পুষ্করিণীর পশ্চিমাংশে কতকগুলি আম্রকানন, মধ্যে মধ্যে সরোবর ও স্থানে স্থানে অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃহৎ বনস্পতিসমূহ পরিলক্ষিত হয়। এই আম্রকানন-সংলগ্ন একটি বহু প্রাচীন অশ্বত্থমূলে পূর্ব্বভাগে দেবী অরণ্যষষ্ঠী ও দক্ষিণভাগে দক্ষিণাকালীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে। এই বৃহৎ বিটপীর শাখার সহিত আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা বিবিধ বন্যলতিকার বন্ধনে পরস্পর বিজড়িত হইয়া কালিকাদেবীর মস্তকোপরি চন্দ্রাতপের আকার ধারণ করিয়াছে। স্বর্গগতা মহারাণী পদ্মসুন্দরীদেবী কালিকাদেবীর এই অধিষ্ঠানভূমির চতুঃপার্শ্বে মণ্ডলাকার একটি অনুচ্চ ইষ্টকমণ্ডপ, একটি আলোকস্তম্ভ এবং পুরো-ভাগে একটি সুন্দর পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে স্থানের শোভা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায়, এই স্থানে একটি পঞ্চমুণ্ডীর আসন আছে; অনেক যোগী সন্ন্যাসী এখানে আসিয়া রাত্রি যাপন করেন। এখানে আসিলে হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় ভক্তি ও সুবিমল শান্তিরসে আপ্লুত হয়। কালিকাদেবী সর্ব্বফলদাত্রী; লোকে যে কামনা করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করে, তাহার সে কামনা পূর্ণ হয়। মহা-নবমীর দিন মধ্যাহ্নে ও শ্যামাপূজার দিন রাত্রিতে গ্রামের আব্রাহ্মণ চণ্ডাল দেবীর পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু রাজবাড়ী হইতে নিত্যসেবা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

গ্রামের উত্তরে প্রথমতঃ শস্যক্ষেত্র, তৎপরে "গিরিডাঙ্গা" নামক সুদূর-প্রসারিত প্রান্তর। প্রান্তরের মধ্যস্থলে মহারাজ বাহাদুরের একটি উদ্যানবেষ্টিত বাড়ী আছে। এই স্থানের সুস্নিগ্ধ দৃশ্য উত্তপ্ত মরু প্রদেশবর্ত্তী ওয়েসিস্

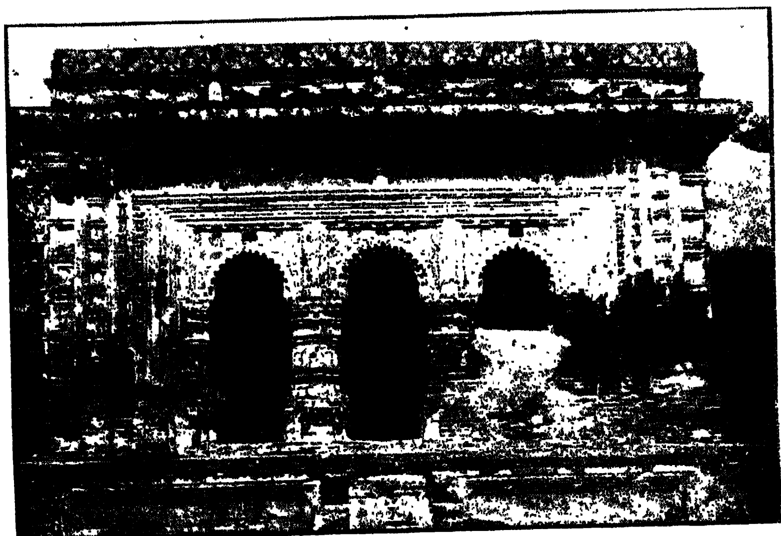
বা মরূদ্যানসদৃশ। গ্রামের মধ্যে কোন সংক্রামক পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইলে রাজপরিবার এই শান্তিময় নির্জ্জন স্থানে বাস করেন।

হেতমপুরে প্রায় সর্ব্ববিধ পূজা ও পর্ব্ব প্রচলিত আছে। রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, দুর্গোৎসব, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, কার্ত্তিক-পূজা, মনসাপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা, সরস্বতীপূজা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, অন্নকূট, চড়ক, গোষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ পূজা ও উৎসব দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন রাধাবল্লভ, রসিকনাগর, গোপাল, গৌরাঙ্গ, দধিবামন, রঘুনাথ, লক্ষ্মীজনার্দ্দন, বাণলিঙ্গ শিব, সর্ব্বমঙ্গলা, দক্ষিণাকালী, সিংহবাহিনী, মঙ্গল-চণ্ডী প্রভৃতি কতিপয় বিগ্রহের নিত্যনিয়মিতসেবা প্রতিষ্ঠিত আছে। পুণ্যময় বৈশাখ ও কার্ত্তিকমাসে হরিনাম-সংকীর্ত্তন, রামায়ণগান ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়া থাকে।

রাজবাড়ীতে প্রতি বৎসর মহাসমারোহে সরস্বতীপূজা হইয়া থাকে। এই সময় কৃষ্ণচন্দ্র-কলেজ হইতে পুরাতন রাজবাড়ী পর্য্যন্ত ও কদমতলা হইতে হাটতলা পর্য্যন্ত রাজপথের উভয় পার্শ্বে সপ্তাহব্যাপী একটি বৃহতী মেলা হয়। এই মেলায় হেতমপুরের চতুঃপার্শ্বস্থ ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে বিস্তর লোক সমাগত হয়। সরস্বতীপূজার সময় ব্রাহ্মণভোজন, কুটম্ব-আমন্ত্রণ, যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপ, সার্কাস, বাইনাচ, খেমটানাচ, কবির গান, ঝুমুর সঙ্গীত, নটের নাচ, পুতুলনাচ, সাঁওতালনাচ, নহবৎ, রসনচৌকি ও ব্যাণ্ডবাদ্য, ছায়াবাজী, আতসবাজী, আলোকসজ্জা প্রভৃতি বিবিধ আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে। গড়ের মাঠে স্কুল কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে ফুটবলম্যাচ্ হইয়া থাকে এবং ছোট ছোট বালকগণ নানাবিধ ব্যায়াম প্রদর্শন করে। রাজবাড়ীর পদাতিক ও মল্লগণের মধ্যে ব্যায়ামক্রীড়া, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি হইয়া থাকে। এই সমস্ত ক্রীড়ার পর সকলকেই যথাযোগ্য পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই মেলার মধ্যে একটি কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনী হয়, তাহাতে বিবিধ শস্য, ফল-মূল ও কারুকার্য্য, কলকারখানা, ছবি, চিত্র প্রভৃতি সজ্জিত হয় এবং ছাগ, মেষ, মহিষ ও গবাদি পশু আনীত হয়। প্রদর্শিত দ্রব্যের সফলতা ও যোগ্যতা অনুসারে পুরস্কার বিতরিত হয়। ফলতঃ সেই কয়দিন গ্রামখানি জনকোলাহলে ও বাদ্যধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে এবং পতাকাশোভিত ও আলোকরঞ্জিত হইয়া যেন হাসিতে থাকে।



হেতমপুর—পুরাতন রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার।



ভমপুর একটী প্রাচীন মন্দির।

ফলতঃ বর্ত্তমানকালে হেতমপুর যথেষ্ট উন্নত ও সুখ-সমৃদ্ধিশালী। সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী, মনোহর পুষ্পোদ্যান, স্বচ্ছসলিলা সরসী, প্রশস্ত রাজপথ, বিবিধ পণ্যপুঞ্জ, আপণশ্রেণী, গ্রামের বিচিত্র শোভা সম্পন্ন করিতেছে; সাধারণের উপকারার্থে স্কুল, কলেজ, সংস্কৃত-চতুষ্পাঠী, দাতব্য চিকিৎসালয়, পোষ্টাফিস ও তাড়িতবার্ত্তা সংস্থাপিত হইয়াছে। গ্রামে প্রতি মাসে বিবিধ আনন্দোৎসব সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। মহারাজ বাহাদুর ও সুযোগ্য রাজ-অমাত্যগণ হেতমপুরের পূর্ব্ব গৌরব ও কীর্ত্তিকলাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সতত যত্ন ও প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। হেতমপুর পল্লীগ্রাম বটে, নগর বা সহর নহে, কিন্তু এখানে গ্রাম্য ও নাগরিক ভাবের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও সুধাধবলিত সৌধমালা, কোথাও পর্ণকুটীরশ্রেণী। কোথাও অভ্রভেদী চূড়াবিশিষ্ট দেবমন্দির, কোথাও গ্রাম্য চণ্ডীমণ্ডপ। কোনও স্থানে প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন রাজপথ; আবার কোনও স্থানে অপরিস্কৃত সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য পথ। এক দিকে ইষ্টকপ্রাচীরবেষ্টিত মনোহর পুষ্পোদ্যান, অন্যদিকে বাঁশঝাড়, শরঝোপ ও আগাছার জঙ্গল। কোথাও কেরাচি, টম্‌টম্ জুড়ি, বাইসিকেল, ও মটরগাড়ী ছুটিতেছে, আবার কোথাও ধান্যাদি শস্যের বোঝা লইয়া গো-গাড়ী মন্থরগতিতে চলিয়াছে। কোথাও স্কুল ও কলেজ, মাষ্টার ও প্রফেসারগণ দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি উচ্চশিক্ষা প্রদান করিতেছেন, আবার কোথাও পাঠশালার গুরুমহাশয় বেত্রহস্তে বালকগণের কোমল অন্তঃকরণে ভীতি সঞ্চার করিতেছেন। স্কুল কলেজের ছাত্রগণ কোথাও ফুট্‌বল টেনিস্ ক্রীড়া করিতেছে, কোথাও হোরাইজোণ্টালবারে ও প্যারেলাল বারে ব্যায়াম ক্রীড়া করিতেছে, আবার কৃষক-তনয়েরা ও রাখালগণ হেরে ডুগ্‌ডুগ্ ও ডাণ্ডাগুলি লইয়া উন্মত্ত। পূজা ও পর্ব্ব উপলক্ষে যাত্রা, থিয়েটার, বাইনাচ, খেমটানাচ, বায়স্কোপ, সার্কাস্ প্রভৃতি হইয়া থাকে, আবার কাবর গান ও ঝুমুর নাচেরও অভাব নাই। সন্ধ্যার সময় দেবমন্দিরসমূহে কাঁসর ঘণ্টার মধুর ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায়, আবার মাদলের বিকট বাদ্যে ও ইতরলোকের কর্কশ কণ্ঠে নৈশগগন প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। রাত্রিকালে কোথাও ইলেক্‌ট্রিক লাইট ও কোথাও গ্যাস্ লাইটের অত্যুজ্জ্বল আলোকে যেন রাত্রিকে দিন করিয়াছে, আবার কোথাও সূচীভেদ্য অন্ধকারে পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই বলিতেছি, এরূপ পল্লী ও সহরের সম্মিলিত দৃশ্য—

বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্ত্তী মধুর কৈশোরভাব সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

হেতমপুরের বর্ত্তমান অবস্থা আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত হইল। যাঁহারা হেতমপুরে বাস করেন, অথবা যাঁহারা এখানকার সমস্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য বুঝিতে পারিবেন যে, হেতমপুরের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তন্মধ্যে অতিরঞ্জিত বা স্বকপোলকল্পিত কিছুই নাই, যেরূপ দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই সংক্ষেপে বলা হইল মাত্র। তবে এস্থলে এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া অসম্ভব নহে যে, হেতমপুরের বিষয় যাহা বলা হইল, তাহাতে কেবল ভালর দিক্‌টাই বলা হইল, কেবল সুখস্বচ্ছন্দতা ও সুবিধার কথাই বলা হইল, কিন্তু ভালমন্দ, সুখ-দুঃখ, সুবিধা অসুবিধা লইয়া যখন জগৎ, তখন হেতমপুরে কি মন্দ, দুঃখজনক বা অসুবিধাজনক কিছুই নাই? অনেকেরই মনে এ প্রশ্ন উদিত হইতে পারে। এতৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারতের হর্ম্ম্যপ্রাসাদমণ্ডিত রাজধানী কলিকাতানগরীতে অথবা অমরাপ্রতিম লণ্ডন মহানগরীতেও বহুবিধ দুঃখ ও অসুবিধা আছে। কিন্তু মানবগণ স্বকৃত কর্ম্মফলে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। অভাগার বৈকুণ্ঠে সুখ নাই এবং ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাণিতে হয়, কিন্তু তা বলিয়া বৈকুণ্ঠ অথবা স্বর্গের নিন্দাবাদ কখনও কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে হেতমপুর-কাহিনীতে আমাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির সে সব দুঃখের কাহিনী বলিবার আবশ্যক কি?

এখন এই হেতমপুর ও তদন্তর্গত আসদগঞ্জ, বরকতিপুর, সীতারামপুর, রাধাবল্লভপুর, ধামুড়িয়া, রসিকবাজার প্রভৃতি পল্লীসমূহ কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক কখন্ কিরূপে স্থাপিত হইয়াছে ও এই সকল গ্রামে পূর্ব্বকালে কি কি প্রধান স্মরণীয় ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ ধারাবাহিক রূপে বর্ণিত হইবে।

হেতমপুর গ্রাম যে কখন স্থাপিত হয়, তাহা সুনিশ্চিতরূপে স্থির করা দুঃসাধ্য; তবে আমরা যে সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার সাহায্যে যতদুর সম্ভব উক্ত গ্রামস্থাপনের কালনির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

১৭৬৭ খৃঃ রেনেল সাহেবকৃত সার্ভে ম্যাপে হেতমপুরের অদূরে ঈশান কোণাংশে স্থিত কৃষ্ণনগরের নাম দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু হেতমপুরের কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

প্রাচীন ও বর্ত্তমান হেতমপুরের সংস্থানের কিছু অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। কেন্দুলার উত্তর এবং পূর্ব্বাংশে প্রাচীন হেতমপুরের অবস্থান ছিল বলিয়া মনে হয় এব· এই অনুমান যে যুক্তির উপর নির্ভর করিতেছে, তাহা দেখাইবার জন্য অগ্রে কেন্দুলার বিবরণ পাঠকগণের জানা উচিত।

হেতমপুর-সন্নিকটস্থ কেন্দুলাগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কেন্দুলা যে কোন্ রাজার রাজত্বের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা জানিবার উপায় নাই। নামপ্রকরণ হইতে বুঝা যায় যে, এই গ্রাম হিন্দুকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। বোধ হয় ইহার পুর্ব্বনাম কেন্দুবিল্ব; কিন্তু বর্ত্তমানকালে কেন্দুবিল্ব, কেন্দুল বা কেন্দুলা নামে নামান্তরিত হইয়াছে। জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিল্বেরও অনুরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে তাহা কেন্দুলী নামে পরিচিত। কেন্দু শব্দে আব্‌লুস্ বা কেন্দ্ এবং বিল্ব শব্দে বেলগাছ বুঝায়। এক সময় কেন্দুলা প্রভৃতি স্থানে ঐ সকল বৃক্ষের অভাব ছিল না। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে এই গ্রামে মুসলমানগণের প্রাধান্য হয়। জনশ্রুতি এই যে, সেই সময় কেন্দুলা গ্রামে জনৈক মল্লিক-উপাধিধারী সমৃদ্ধিশালী মুসলমান বাস করিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মল্লিকপুষ্করিণী অদ্যাপি বর্ত্তমান এবং এই জলাশয়ের পশ্চিম তীরে তাঁহার সমাধিস্থল এখনও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তাঁহার সমসাময়িক জনৈক হাজরা-বংশীয় ব্রাহ্মণ উক্ত গ্রামে বাস করিতেন। মুসলমান আমলে হাজরা-সৈন্যের অধিকারভুক্ত ব্যক্তিগণ হাজরা উপাধিতে ভূষিত হইত। হাজরা-প্রতিষ্ঠিত 'হাজরা পুষ্করিণী' অদ্যাপি কেন্দুলায় বর্ত্তমান আছে। শুনা যায়, তিনিও একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। এক সময় হাজরার সহিত মল্লিকের এরূপ দারুণ বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাহাতে কতকগুলি মুসলমান গ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক কেন্দুলার অদূরে পূর্ব্বাংশে একটি মাঠে আসিয়া বসতি করে, সেই স্থানটিকে মাঝপাড়া বলিত। কিন্তু আবার বহুদিন অতীত হইল ইহা বসতিহীন ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, সেখানে কেবল একটি পীরের আস্তানামাত্র বিদ্যমান আছে। 'মাঝা' বলিলে সচরাচর কোন গ্রামের মধ্যবর্ত্তী পল্লীকেই বুঝায়, কিন্তু কেন্দুলা গ্রামের পুর্ব্বসীমাকে মাঝপাড়া বলিয়া থাকে। হয়ত কোন সময়ে হেতমপুর কেন্দুলার প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, হেতমপুর ও কেন্দুলার মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ডের উপর উক্ত পল্লী প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই উহাকে মাঝপাড়া বলিত। বর্ত্তমান সময়েও নিত্য পরিবর্ত্তনকারী কালের প্রভাবে হেতমপুর ও কেন্দুলা পরস্পর কিঞ্চিৎ দুরবর্ত্তী হইয়া পড়িলেও উহাকে মাঝপাড়ার মাঠ বলিয়া থাকে।

আমরা যথাস্থানে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, সম্ভবতঃ ১৭১৭।২৪ খৃঃ অব্দে হেতমপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।* কিন্তু রেনেল সাহেব তাহার বহু পরে এ প্রদেশ জরিপ করিলেও তাঁহার মানচিত্রে হেতমপুরের নাম নাই, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, তখন হেতমপুর শ্রীভ্রষ্ট হইয়া একটি নগণ্য ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ের মানচিত্রে বরকতিপুর প্রভৃতি কয়েকটি পল্লীর নাম দৃষ্ট হইলেও হেতমপুরের নাম সন্নিবিষ্ট নাই; অনুমান হয়, বর্ত্তমান কালের মানচিত্রকরগণ রেনেলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে হেতমপুর নামে কোনও গ্রামের উল্লেখ কোনও পুস্তকে বা প্রবাদমুখে জানা যায় না। পূর্ব্বে সমগ্র বীরভূম ঘন শালজঙ্গলে আবৃত ছিল (১) এবং এই অরণ্য দক্ষিণে ছোটনাগপুর এবং উত্তরে রাজমহল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভবিষ্যপুরাণ (২) প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থেও বীরভূমের অরণ্য সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত বীরভূম গভীর অরণ্যময় ছিল তাহা হাণ্টার সাহেবও তাঁহার পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন (৩)। এই সময় যে হেতমপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান অরণ্যসঙ্কুল ছিল তাহার অপর প্রমাণ আছে (৪) এবং লোকমুখেও শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়েও হেতমপুর গ্রামের পশ্চিমে ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে শালজঙ্গল বিদ্যমান আছে।

এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, রাঘবানন্দ রায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-কুমার বহুযত্নে জঙ্গল কাটাইয়া কতিপয় প্রজা সংগ্রহপূর্ব্বক বর্ত্তমান ভগ্নদুর্গের দক্ষিণে শালনদীর উপকূলে এক ক্ষুদ্র গ্রাম স্থাপন করেন এবং স্বীয় নামানুসারে এই গ্রামের নাম রাঘবপুর রাখিয়াছিলেন। তদবধি এই অরণ্যপ্রদেশ তিনি নিষ্কররূপে ভোগদখল করিতেন। কোন্ সময়ে এই গ্রামের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, রাঘবপুরের প্রতিষ্ঠাতা রাঘবানন্দ রায়

* ৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(১) Rev. Jones Long's the Grand Trunk road, its localities, p. 18. Pamphlet 8 vo Calcutta গ্রন্থে লিখিত আছে A land of hill and dale, wood and water.

(২) "তমাল-তাল-হিন্তাল-শাল-তাল বিরাজিতম্।
জগ্মতুস্তৌ গৌড়দেশে মিলিতং কাননং মহৎ।" ভবিষ্যৎপুরাণ।

(৩) Hunter's Annals of Rural Bengal, Page 13 "almost impassable jungles"

(৪) হেতমপুর-রাজের প্রাচীন দপ্তরে হেতমপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে জঙ্গলের কথা উল্লেখ আছে, "Sailumpour is bounded by the great wood" Page. 110 Journals of Major J, Rennell হেতমপুর ঐ শাহালামপুর পরগণাভুক্ত।

তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই, তবে তিনি খাজা কমল খাঁয়ের রাজত্বসময়ের শেষভাগে ও আসাদুল্লার রাজত্বসময়ে জীবিত ছিলেন এরূপ প্রবাদ শুনা যায়। উক্ত রাজদ্বয় প্রায় ১৬৯৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭১৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বীরভূমের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই কারণে অনুমান হয় যে, রাঘবানন্দ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিম্বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উক্ত রাঘবপুর গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেন। হেতমপুরের রায়বংশের মুখে শুনা যায় যে, রাঘবানন্দের পূর্ব্ব-বাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মেমারির সন্নিকট হরকলা-বাওয়া ছিল। তথা হইতে আসিয়া তিনি রাজনগররাজের জনৈক কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়েন। তিনি তলোয়ার ও লাঠিখেলায় বিশেষ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এইজন্য রাজা সাহেব তাঁহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন এবং রায় মহাশয়কে সমরকৌশলে বিশেষ পারদর্শী দেখিয়া তাঁহাকে সৈনিক বিভাগে স্থানান্তরিত করেন, এই সময় উক্ত রাজার মৃত্যু হয়। রায়বংশের বংশধর মহাশয় রাজার নাম বলিতে পারেন না। কিন্তু আমাদের অনুমান হয় উক্ত রাজার নাম খাজা কমল খাঁ ছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর আসাদুল্লা খাঁ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। রাঘব চিরকাল স্বাধীন-চিত্ত ছিলেন। তিনি অযথা তোষামোদ করিতেন না। সেই জন্য নূতন রাজার সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটায় কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক এ অঞ্চলে আসিয়া রাঘবপুর নামক নূতন পল্লী প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় বাস করেন। তাঁহার তেজস্বিতা ও পরোপকারিতাগুণে রাঘবপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অধিবাসিগণ তাঁহার অনুগত ও বশীভূত ছিল। তিনি তান্ত্রিক ছিলেন, শুনা যায়, তাঁহার বাটীতে অতি সমারোহে কালীপূজা হইত।

রাঘবানন্দ ও সাহালামপুরের তহশীলদার

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বীরভূম রাজনগরের মুসলমান রাজগণের শাসনাধীন ছিল এবং সেই সময় রাজা বাদি-উল্-জমান খাঁ রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। একদা সাহালামপুরের তহশীলদার কোনও কার্য্য উপলক্ষে রাঘবপুরে গমন করিয়া রাঘবানন্দ-প্রতিষ্ঠিত রাঘব-বেড়া নামক উদ্যানে শিবির সংস্থাপন করেন। এই সময় রাঘবানন্দের সহিত তহশীলদারের বিরোধ উপস্থিত হয়[১]। এই সম্বন্ধে দুইটি প্রবাদ

(১) "হেতমপুরকাহিনী"-প্রণেতা লিখিয়াছেন যে, উক্ত ঘটনা আসদুল্লা খাঁর সময় সংঘটিত হয়, কিন্তু আসদুল্লা খাঁর রাজত্বকাল ২১ বৎসর মাত্র এবং তাঁহার সময়ের কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা লোকমুখে শুনা যায় না। যদি তাঁহার রাজত্বকালে এই ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু রাজা বাদী-উজ্জমান খাঁই হাতেম খাঁকে বিদ্রোহদমন জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন—ইহাই লোকমুখে প্রচলিত আছে।

প্রচলিত আছে। প্রথম প্রবাদ অনুসারে কতকগুলি রমণী রাঘব-বেড়ার পার্শ্ব দিয়া শালনদীর ঘাটে জল আনিতে যাইতেছিল। অদূরে তহশীলদার সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতে যাইতেছিলেন, তিনি তাহাদের মধ্যে কোন এক সুন্দরী রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে অনুচর দ্বারা বলপূর্ব্বক নিজশিবিরে আনয়ন করেন। রাঘবানন্দ এই অত্যাচার-সংবাদ শুনিবামাত্র তহশীলদারের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং গ্রামবাসিগণও উত্তেজিত হইয়া রাঘবানন্দের অনুসরণ করিল। এই রমণী লইয়া রাঘবানন্দের সহিত তহশীলদারের বিশেষ তর্ক-বিতর্ক চলিতে লাগিল এবং অবশেষে উভয় পক্ষে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা উপস্থিত হইল। এই সংঘর্ষণে তহশীলদার পরাস্ত হইয়া শিবির ত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, তহশীলদারের মাহুত হাতীর জন্য উক্ত রাঘববেড়ার বৃক্ষচ্ছেদন করিয়াছিল। রাঘবানন্দ ইহাতে প্রতিবাদ করায় তহশীলদার তাঁহাকে কটুভাষায় গালি দেন, সেই জন্য গ্রামবাসী উত্তেজিত হইয়া তহশীলদারকে প্রহার করে। তহশীলদার অনন্যোপায় হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়েন। আমরা প্রথমোক্ত প্রবাদ সমীচীন বলিয়া বোধ করি।

রাঘবানন্দ ও কোম্মর খাঁ

ক্ষোভে ও লজ্জায় মর্ম্মাহত হইয়া রায় মহাশয়ের উপর সমস্ত দোষ অর্পণপূর্ব্বক তহশীলদার বীরভূমরাজের নিকট এই দুঃসংবাদ প্রেরণ করিলেন এবং বীরভূম-নরপতির নিকট হইতে বিদ্রোহ-কারীকে দমন করিবার আদেশ আসিলে তহশীলদার কোম্মর খাঁ নামক জনৈক নীচাশয় কর্ম্মচারীর উপর উক্ত কার্য্যের ভারার্পণ করেন। কোম্মর এতদঞ্চলের ঘাটোয়াল সৈন্য সমভিব্যাহারে রাঘবপুরে উপস্থিত হইয়া রায় মহাশয়ের বৃক্ষাদি কর্ত্তন ও নানারূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। রাঘব এই সকল অত্যাচারে বাধা দিবার নিমিত্ত বহু লাঠিয়াল সহ বিপক্ষগণের সম্মুখীন হয়েন, কিন্তু অচিরকালমধ্যে পরাভব স্বীকার করিয়া তাঁহাকে পলায়ন করিতে হইল। সম্মুখ যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা নাই দেখিয়া রাঘব পরোক্ষে এতদঞ্চলের সমস্ত প্রজাগণকে উত্তেজিত করিয়া সমস্ত রাজকর বন্ধ করিয়া দিলেন এবং ইহাতে তহশীলদার প্রজাগণের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিলে সমগ্র সাহালামপুরে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন তহশীলদার বুঝিলেন, ব্যাপার গুরুতর এবং ইহা দমন করা তাঁহার সাধ্যাতীত। এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি আনুপূর্ব্বিক বিবরণ

বীরভূমরাজের নিকট জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করেন। রাজা বাদি উজ্জমান খাঁ বিদ্রোহ-দমনের নিমিত্ত হাতেম খাঁ নামক জনৈক বিচক্ষণ কর্ম্মচারীকে এতদঞ্চলে প্রেরণ করেন।

রাঘবানন্দের বিদ্রোহ ও হাতেম্ খাঁ

শুনা যায় যে, হাতেম খাঁ রাজা সাহেবের জনৈক আত্মীয় ও সেনাপতি। বয়োবৃদ্ধি হেতু তাঁহাকে রাজস্বসচিবপদে নিযুক্ত করা হয়, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান্, বিজ্ঞ ও সুচতুর ছিলেন। খাঁ সাহেব কয়েকজন অশ্বারোহী ও শতাধিক পদাতিক সৈন্য এবং অন্যান্য বহুলোক ও হাতী ঘোড়া ও উট প্রভৃতি সমভিব্যাহারে বর্ত্তমান হেতমপুরের দক্ষিণপূর্ব্বপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া দুর্গাকারে শিবির সন্নিবেশপূর্ব্বক কূটনীতিজাল বিস্তারপূর্ব্বক কৌশলে রাঘব রায়কে বন্দী করিলেন। তখন সাহালামপুরের অন্যান্য প্রজাগণ রাজাসাহেবের বশ্যতা স্বীকার করেন। তহশীলদারও হাতেম্ খাঁয়ের অনুরোধে বীরভূমরাজও রাঘবানন্দের নিকট হইতে রাঘবপুর বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহা কোম্মর খাঁকে লাখেরাজরূপে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

পাঠানসর্দ্দার কোম্মর খাঁ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ বহুকাল রাঘবপুর ভোগদখল করিয়া ছিলেন, কিন্তু কালচক্রের আবর্ত্তনে রাঘবপুর গ্রামখানি একবারে জনশূন্য হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সেই প্রাচীন পল্লীর অধিকাংশ স্থান ধান্যক্ষেত্রে পরিণত। কেবল কতকগুলি গৃহের ভগ্নস্তূপ ও রাঘব রায়-প্রতিষ্ঠিত রাঘব-বেড়ার একটিমাত্র আম্রবৃক্ষ রাঘবপুরের অতীত স্মৃতি-রক্ষা করিবার জন্য দণ্ডায়মান আছে। কোম্মর খাঁএরও আর কিছুই নাই, কেবল তৎপ্রতিষ্ঠিত একটি পুষ্করিণী 'কোম্মর খাঁর বাঁধ' নামে বর্ত্তমান আছে। যাহা হউক, যতদিন রাঘবপুরের নাম ও রাঘব-বেড়া বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন রাঘবানন্দের নাম বিলুপ্ত হইবে না।

বীরভূমরাজ বৃদ্ধ হাতেম খাঁর এবম্বিধ দক্ষতায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া এই বিদ্রোহ-দমনকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ অনতিবিলম্বে তাঁহাকে রাজোপাধিতে ভূষিত করিলেন১। হাতেম খাঁ বিদ্রোহদমন জন্য যখন এই স্থানে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহিত বহুতর সৈন্য, ভৃত্য, মুটে, মজুর,

(১) হেতমপুরকাহিনী প্রণেতা হেতমখাঁকে রাজা উপাধি দানের কথা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু এতদঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে রাজা হেতমখাঁ বলিয়া জানে। অবশ্য এই প্রবাদ-মূলে কোনও সত্য নিহিত আছে।

হাতী, ঘোড়া, গাভী, উট প্রভৃতি সঙ্গে আসিয়াছিল, এবং তাহাদের জন্য তাঁহাকে গ্রামের বর্ত্তমান ভগ্নদুর্গের পশ্চিমে ও কেন্দুলা গ্রামের অনতিদূরে পূর্ব্বপার্শ্বে অনেকগুলি ছাউনি প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল।

বিদোহ প্রশমিত হইলেও হাতেম এ প্রদেশ শত্রুহস্ত হইতে সুরক্ষিত করিবার জন্য যত্নবান্ ছিলেন। হাতেম খাঁএর অনুরোধে বীরভূমরাজ হেতমপুর দুর্গ স্থায়ী করিবার আদেশ প্রদান করেন। ঐতিহাসিক মুন্সী সেখ ফয়েজউদ্দীন্১ লিখিয়াছেন যে, হেতমপুর অঞ্চলের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ও উৎকৃষ্ট বলিয়া পীড়াগ্রস্ত সৈনিকদিগকে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এখানে আনিয়া রাখা হইত। সৈন্যদিগের ব্যায়ামশিক্ষা ও শস্ত্রশিক্ষার জন্য ইহার স্থানে স্থানে ব্যায়ামাগার প্রভৃতি শিক্ষাক্ষেত্র ছিল। এখানে এক সময়ে অস্ত্র-নির্ম্মাণশালাও ছিল। এখানে অনেক কারীকর কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, অল্পকালমধ্যেই হেতমপুরের দুর্গ অন্যান্য দুর্গের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

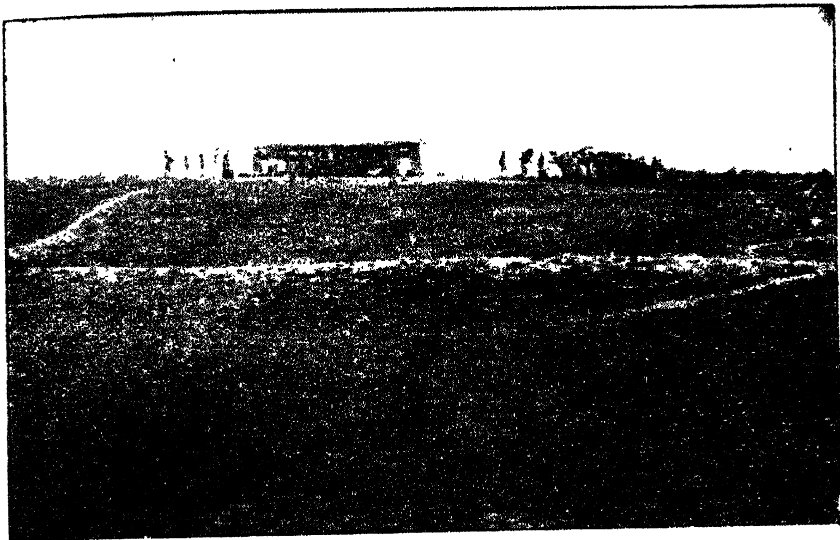
বিদ্রোহ-প্রশমনের পর বৃদ্ধ হাতেম খাঁ আর রাজকার্য্যের দুর্ব্বহ ভার বহন করিতে জনকোলাহলপূর্ণ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন নাই। তিনি এই দুর্গের তত্ত্বাবধায়কস্বরূপ এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক বীরভূম-রাজের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে তিনি এইস্থানের জঙ্গল কাটাইয়া গড়ের উত্তর পশ্চিমে একটি নূতন পল্লী স্থাপন করেন এবং সেই পল্লীতে কেবল মুসলমানের বসবাস করাইয়া ছিলেন। কারণ এখনও সেই স্থানে কেবল মুসলমান ভিন্ন অন্য জাতির বাস নাই। তাহা ছাড়া এখানে একটি ছড়া প্রচলিত আছে, তাহা হইতেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হেতমপুরে প্রথমতঃ হিন্দুর বাস ছিল না :—

হাতেম্ খাঁ-স্থাপিত পল্লী হইতে হেতমপুর নামের উৎপত্তি

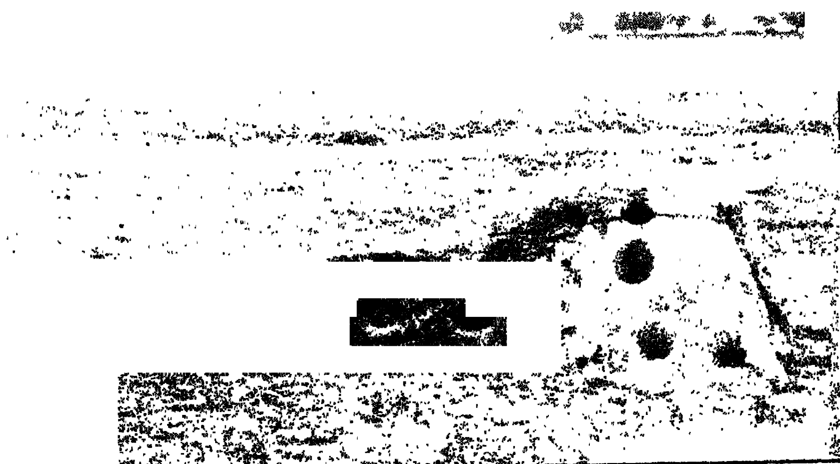
"হেতমপুরে হিন্দুন ান্তি মুলুকে চাভিরামপুরে।"

রাজাসাহেব হাতেমের স্মৃতি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তদীয় নামানুসারে ঐ পল্লীর নাম হাতেমপুর রাখিলেন; হাতেমপুর কালক্রমে হেতমপুর নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

(১) ফয়েজ উদ্দীনের হস্তলিখিত পুস্তিকায় এই বিবরণটি পাওয়া যায়। ৺ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী ফয়েজ উদ্দীনের উক্ত পুস্তিকা আমাকে দেখাইয়াছিলেন।



হেতমপুরের প্রাচীন গড়



হেতমপুর - গড়কৃষ্ণনগরের গোলা-ঢালা চাঁদ পাথর

পরে হেতমপুর কিরূপে হিন্দুপ্রধান স্থান হইয়া উঠে, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

হাতেমখাঁর জীবিতকাল ও মৃত্যুর তারিখ নিরূপণ

এক্ষণে আমরা হাতেম খাঁর জীবিতকাল ও মৃত্যুর আনুমানিক তারিখ সংক্ষেপে স্থির করিতে চেষ্টা করিব।

হাতেমখাঁ কত বয়সে এই স্থানে আসিয়াছিলেন এবং কতদিন জীবিত ছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে স্থির করা কঠিন, তবে তিনি প্রাচীন বয়সে এই অঞ্চলে আসিয়াছিলেন এইরূপ জনশ্রুতি আছে। লোকে সাধারণতঃ ৬০ বৎসরের উপর হইতেই প্রাচীন বলিয়া কথিত হয়, সেই জন্য আমরা হাতেমখাঁর আগমনকাল ৬০ বৎসর বয়সের সময় ধরিয়া লইতে পারি এবং পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অর্থাৎ বাদীউজ্জমানের রাজত্বের প্রথম ভাগে এইস্থানে আগমন করিয়া ছিলেন, এই অনুমান স্বীকার করিয়া লইলে, ১৬৫৭ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার জন্মকাল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এক্ষণে তিনি কতকাল জীবিত ছিলেন, তাহা স্থির করা আবশ্যক।

রাঘবপুরের বিদ্রোহ দমন করিতে হাতেমখাঁর কিছুদিন গত হইয়াছিল; তাহা আমরা ন্যূনসংখ্যায় এক বৎসর ধরিয়া লইতে পারি। তাহার পর হেতমপুরে জঙ্গল কাটাইয়া গ্রাম বসাইতে অন্ততঃ তিন চারি বৎসর গত হওয়া সম্ভব। গ্রামপ্রতিষ্ঠার পরও তিনি কিছুদিন জীবিত ছিলেন; সেও অন্ততঃ দুই এক বৎসর কাল হইতে পারে। অতএব তিনি এই প্রদেশে আসিবার পর ৬।৭ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন, এরূপ ধরিয়া লইলে অসঙ্গত হয় না, এবং এই যুক্তি ধরিয়া মীমাংসা করিলে ৬৮ হইতে ৭০ বৎসর বয়সের মধ্যে হাতেমখাঁর মৃত্যু হইয়া থাকিবে। মানুষ দীর্ঘজীবী হইলে সাধারণতঃ এই বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।

হাতেম-প্রতিষ্ঠিত "হাতেমখাঁর পুকুর" নামক পুষ্করিণীর উত্তরপশ্চিম তীরে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল; সেই সমাধিস্থান এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। উহা শোভা ও আড়ম্বরহীন ধ্বংসাবশেষমাত্র হইয়া পড়িয়া আছে।

বাবু কিশোরিলাল সরকার তৎপ্রণীত "হেতমপুরকাহিনীতে" লিখিয়াছেন যে, হাতেমখাঁ ও তাঁহার মৃত্যুর পর হাফেজখাঁ বিনা খাজনায় হেতমপুর মৌজা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু আমরা একথার পোষকতা করিতে পারি না, কারণ হাতেমখাঁ বা হাফেজখাঁ হেতম-

পুরের স্বত্বাধিকারী হইলে, প্রাচীন কাগজে ও ছাড়পত্রে তাঁহাদের সহি-মোহর দেখা যাইত, কিন্তু সেরূপ কোন কাগজপত্র আদৌ দৃষ্ট হয় না, তাহার পরিবর্ত্তে সেই সময়ের বীরভূমপতির মোহর ও দস্তখৎযুক্ত অনেক কাগজ ও সনন্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্য আমাদের অনুমান হয় যে তাঁহারা বীরভূমরাজের অধীনে হেতমপুরের উচ্চ কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন মাত্র। হাতেমখাঁর কার্য্যকুশলতা ও বিদ্রোহদমন জন্য বীরভূমরাজ তাঁহাকে রাজো-পাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্যই এই গ্রামের নাম হাতেমপুর রাখা হয়। হাতেমপুরই যে বর্ত্তমান হেতম-পুর তাহা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। হেতমপুর গ্রাম সম্বন্ধে ইহা ছাড়া হাতেমখাঁ বা হাফেজখাঁর বিশেষ কোন বৈষয়িক অধিকার ছিল বলিয়া জানা যায় না।

হাতেমখাঁ ও শেরিণা বিবি

অতঃপর আমরা হাফেজখাঁ ও তাঁহার পত্নী শেরিণা বিবির জীবনকথা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। হাতেমখাঁর মৃত্যুর পরে এই হাফেজ-খাঁ হেতমপুরের দুর্গরক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। হেতমপুর-ইতিহাসের সহিত হাফেজখাঁ ও শেরিণা বিবির নাম একান্তভাবে জড়িত। তাঁহারা কিরূপে হেতমপুরে আগমন করেন, তৎসম্বন্ধে যে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

-০০-

শুনা যায় যে, হাফেজখাঁর প্রকৃত নাম ওসমান ও শেরিণার প্রকৃত নাম সা আমিনা* ; ওসমান দিল্লীর বাদশাহের অধীনস্থ জনৈক সেনাপতির পুত্র এবং আমিনা বাদশাহের কন্যা, আমিনা ওসমানের শৈশবসঙ্গিনী ও বাল্যসহচরী, শৈশবকাল হইতে উভয়ের মধ্যে এরূপ ভালবাসা জন্মিয়াছিল যে, একজন আর একজনকে তিলার্দ্ধ না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিলে তাঁহাদের সেই মধুর বাল্যপ্রণয় প্রগাঢ় দাম্পত্যপ্রেমে পরিণত হইয়াছিল। বাদশাহ আমিনার বিবাহের কাল সমাগত দেখিয়া, স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হোসেন শার† সহিত বিবাহ দিবেন এইরূপ স্থির করিলেন। তখন ওসমান ও আমিনা অনন্যোপায় হইয়া গৃহত্যাগপূর্ব্বক নানা দেশ, গিরি, নদ, নদী ও অরণ্য অতিক্রম করিয়া নিরাপদ্ হইবার মানসে সুদূর হেতমপুরে উপস্থিত হইলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে হাতেমখাঁর আশ্রয় পাইলেন।

ক্রমে হাফেজখাঁ কার্য্যকুশলতা ও শীলতাগুণে হাতেমখাঁকে এতই মুগ্ধ করিলেন যে, বৃদ্ধ হাতেমখাঁ তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। পরে হাতেমখাঁর মৃত্যু হইলে বীরভূম-রাজ হাফেজখাঁর উপর হেতমপুর-দুর্গের সমস্ত ভার অর্পণ করিলেন।

এদিকে দিল্লী হইতে ওসমান ও আমিনার পলায়নের পর হোসেন শা তাঁহাদের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া সন্ধান করিতে করিতে বীরভূমে আসিয়া পৌঁছিলেন। বীরভূমে আসিয়া হোসেন যে উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক

* সা আমিনার দরবারে হামিদ সা নামক একজন ফকির ছিলেন। প্রাচীন জমাবন্দীর কাগজেও হামিদ্ সার নাম দৃষ্ট হয়।

† দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহের সময়ে সৈয়দদিগের মধ্যে হোসেন আলি নামক এক ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু তিনি ১৭২১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই ঘাতকের হস্তে নিহত হয়েন; পরন্তু তিনি মহম্মদ শার ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন না। মহম্মদ শার ভ্রাতুষ্পুত্র হোসেন শা ইতিহাসে বিশেষ বিখ্যাত নহেন। ওসমান ও বিশেষ পরিচিত নহেন। মহম্মদ শার কন্যা আমিনার নামও সাধারণতঃ কোন ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু বীরভূমে ওসমান ও আমিনা সম্বন্ধে এই প্রকার জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়।

শেরিণা বিবিকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা পরে বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইব। যে ঘটনাপরম্পরায় হোসেন শেরিণার সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হন, তাহা বুঝাইবার জন্য এক্ষণে অন্য একটি বিষয়ের অবতারণা করা আবশ্যক।

মোগলের অধঃপতনকাল নিকট বুঝিয়া স্বীয় বাহুবলে ভারতে হিন্দুরাজত্ব পুনঃ স্থাপিত করিবার মানসে এই সময়ে মহারাষ্ট্রশক্তির অভ্যুত্থান হয়। সেই শক্তির মহাতেজে বঙ্গদেশ দগ্ধীভূত হইয়াছিল। দিল্লীর বাদশাহের প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে "চৌথ" (রাজকরের চতুর্থাংশ) ধার্য্য করিয়া স্ব স্ব প্রভুত্ব ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিল এবং বাহুবলে সর্ব্বস্থানে প্রাপ্য কর বুঝিয়া লইবার জন্য ক্রমে বাঙ্গালাদেশেও পদার্পণ করিল। তাহারা বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের মধ্য দিয়া পঙ্গপালের ন্যায় বঙ্গদেশে আসিয়া পড়িল। বঙ্গের ইতিহাসে ইহাই বর্গীর হাঙ্গামা নামে প্রসিদ্ধ।

বর্গীর হাঙ্গামা

বর্গীর হাঙ্গামার কথা বর্ত্তমান কালে উপকথার ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে। এক্ষণে ইহা ইতিহাসের জীর্ণস্তরে মলিন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বর্গীর নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠিত। এখনও এদেশের জননীগণ শিশুদিগকে "ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এলো দেশে" এই বলিয়া ভয় দেখাইয়া ঘুম পাড়াইয়া থাকেন; সে কালে এই বর্গীর হাঙ্গামাই বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছিল। পশ্চিম প্রদেশ হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণ ছোটনাগপুর পার হইয়া বাঙ্গালার প্রবেশদ্বার বীরভূম ও বিষ্ণুপুর বিধ্বস্ত করিয়া একেবারে কাঁটোয়া পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িল। সে কালে কাঁটোয়ায় একটি সামান্য দুর্গ ছিল, সুতরাং গিরি-দুর্গ-বিজয়ী মহারাষ্ট্রীয় সেনার পক্ষে কাঁটোয়া-দুর্গ জয় করিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল না। আলিবর্দ্দীখাঁ স্বয়ং অসিহস্তে মহারাষ্ট্রীয়শক্তি দমনে বহির্গত হইলেন, মহারাষ্ট্রীয়গণ নবাবের সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল না; দলে দলে বিভক্ত হইয়া যথেচ্ছ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল।

রঘুজী ও বালাজী

১৭৪১ খৃঃ অব্দে বিপুল মহারাষ্ট্রীয় বাহিনী দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। বেরার প্রদেশে রঘুজী ভোন্‌সলে এবং পুণাপ্রদেশে বালাজী বাজী-রাও পেশোয়া পদ লাভ করিবার জন্য উভয়ে উভয়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে স্বয়ং রঘুজী ভোন্‌সলে বঙ্গদেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি যে সময়ে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া গ্রাম ও নগর প্রভৃতি

বিধ্বস্ত* করিতেছিলেন, সে সময়ে বালাজী বাহুবলে বাদশাহকে বশীভূত করিয়া এগার লক্ষ টাকা চৌথ আদায়ের ফরমাণ লইয়া বিহারঅঞ্চল লুণ্ঠন করিতে করিতে মুর্শিদাবাদের অনতিদূরে উপনীত হইলেন।

দুই দিক্ হইতে দুইটি প্রবল চমূ একই সময়ে "যুদ্ধং দেহি" রবে সগর্ব্বে অগ্রসর হইল, আলিবর্দ্দী একাকী কোন্ দিক্ রক্ষা করিবেন? অগত্যা তিনি বালাজীকে বিপুল উৎকোচদানে হস্তগত করিয়া রঘুজীর দমনার্থ অগ্রসর হইলে, রঘুজী পশ্চিমাঞ্চল দিয়া পলায়ন করেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বীরভূম ও বাঁকুড়া মহারাষ্ট্রীয়গণের বঙ্গদেশে পদার্পণ করিবার প্রবেশদ্বার ছিল এবং বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ সিহুড়ী, রাজনগর, হেতমপুর প্রভৃতি স্থান দিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ যাতায়াত করিত। রঘুজীভোন্সলে পলায়নের সময়েও ঐ সকল দেশ লুণ্ঠন করিতে বিস্মৃত হন নাই।

ভাস্করপণ্ডিত ও আলিবর্দ্দী

এক বৎসরও নিরুদ্বেগে অতীত হইল না। ১৭৪৪ খৃঃ বর্ষাশেষে রঘুজীর আজ্ঞাবহ সেনানায়ক ভাস্কর পণ্ডিত ৪০ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করিলেন। এবার ভাস্করসৈন্যের সহিত নবাবসৈন্যের মানকরের প্রান্তরে সম্মুখযুদ্ধের আয়োজন হইল, কিন্তু যুদ্ধ হইল না, আলিবর্দ্দী অর্থদানে তুষ্ট করিবার প্রলোভন দেখাইয়া ভাস্করকে আপন শিবিরে নিমন্ত্রণ করিলেন। অর্থলোভে ভাস্কর নিঃশঙ্কচিত্তে অল্প কয়েকজন অনুচর লইয়া নবাবশিবিরে আগমন করেন। ইঙ্গিতমাত্রেই নবাবসৈন্য শার্দ্দূলের ন্যায় ভাস্করের উপর নিপতিত হইয়া তাঁহাকে অসি দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। ভাস্কর তাঁহার শাণিত অসি কোষ-মুক্ত করিবারও অবসর পাইলেন না।

রঘুজীর বঙ্গদেশে পুনরাগমন

ভাস্করপণ্ডিতের হত্যাকাণ্ডের কথা মহারাষ্ট্রদেশে প্রচারিত হইবামাত্র প্রতিশোধ লইবার জন্য বিপুল বর্গীবাহিনী সংগ্রহ করিয়া রঘুজী স্বয়ং বঙ্গে পুনরাগমন করিলেন।

এবার বর্গীর অত্যাচারে বঙ্গদেশ কম্পিত হইয়া উঠিল। লুণ্ঠন-পরায়ণ মহারাষ্ট্রীয় সেনা গ্রাম ও নগর লুণ্ঠন করিয়া গৃহে গৃহে অগ্নিসংযোগ করিল।

* Cutting of ears, noses and hands of any of the inhabitants, sometimes carrying their barbarity so far as cutting off the breasts of women & & p. 134 (Interesting Historical Events, by T. Z. Holwell Esqr.)

অশ্বপদতাড়নায় শস্যক্ষেত্র দলিত হইয়া শস্যশূন্য হইল, পিতা পুত্রের মমতা ত্যাগ করিয়া পলাইল, মাতা প্রাণের প্রাণ স্তন্যজীবী শিশুকে নিজবক্ষ হইতে ভূমে নিক্ষেপ করিয়া আপন সম্মান রক্ষা করিল, কোনও হতভাগ্য দস্যুগণের করাল-কবলে নিপতিত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণ হারাইল, কোনও গৃহলক্ষ্মী সতীত্ব হারাইয়া পাপের কলুষময় পাথারে নিক্ষিপ্ত হইল। নাসাকর্ণছেদন, হস্তপদাদি কর্ত্তন প্রভৃতি যত প্রকার ভীষণ অত্যাচার হইতে পারে, মহারাষ্ট্রীয়গণ তাহা অবাধে সম্পন্ন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গ্রাম-নগর জনশূন্য হইয়া গেল, শস্য-ক্ষেত্র কণ্টকবনে পরিণত হইল, শিল্প-বাণিজ্য ক্রমে বন্ধ হইতে লাগিল। ভীষণ দস্যু, মায়ামমতাহীন মহারাষ্ট্রীয়গণ ১৭৪৫ খৃঃ অব্দের বর্ষাকালে বর্দ্ধমান ও দক্ষিণ বীরভূম অধিকার করিয়া, সিউড়ির পশ্চিমাংশে কেন্দুয়ার সুবিস্তৃত প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশ করিল এবং তথা হইতে চতুর্দ্দিক্ লুণ্ঠন করিয়া গ্রাম পল্লী বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। সিউড়ি হইতে দুবরাজপুরের প্রাচীন রাস্তার উভয় পার্শ্বে রায়পুর, কচুজোড়, সাতকিন্দুরি প্রভৃতি যে সকল গ্রাম ছিল, তাহা বর্গীর অত্যাচারে শ্মশানে পরিণত হইল। অদ্যাবধি তথায় প্রাচীন বসতির ভগ্নস্তূপাবলী, সেই সকল অত্যাচারের প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিবার জন্য শ্রীভ্রষ্ট হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মহারাষ্ট্রীয় অত্যাচারে বঙ্গদেশে আত্ম-রক্ষার চেষ্টা

চতুর্দ্দিকে মহাবিপ্লব! আলিবর্দ্দী একাকী মহারাষ্ট্রীয়গণকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে আপনাপন ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য তিনি সকলকেই যথাযোগ্য ক্ষমতা দিতে বাধ্য হইলেন। সেই ক্ষমতাবলে অধীনস্থ রাজন্যবর্গ নিজ নিজ রাজ্য শত্রুহস্ত হইতে নিরাপদ করিবার জন্য দুর্গাদি প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। এই সময় কাশিমবাজারে একটা ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মিত হইল। কলিকাতা রক্ষার জন্য মহারাষ্ট্রখাত্ খনিত হইয়া কলিকাতা ও অন্যান্য বাণিজ্যস্থানে সৈন্য সন্নিবিষ্ট হইল। এই সময় বীরভূমরাজ বাদীউজ্জমানখাঁ তাঁহার সুবৃহৎ রাজ্যের অরক্ষিত স্থান-সমূহে দুর্গ নির্ম্মাণ দ্বারা শত্রুহস্ত হইতে প্রজাবর্গকে নিরাপদ করিলেন। এই মহারাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় হেতমপুর-গড় হাফেজখাঁর দ্বারা হেতমপুরের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তরে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং উহা উচ্চ প্রাচীর* ও

* এক্ষণে সাতটি প্রাচীর স্তূপ বর্ত্তমান আছে

পরিখা * দ্বারা পরিবেষ্টিত ও তদুপরি স্থানে স্থানে কামান সংস্থাপন করিয়া উভয় দুর্গ সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। এই দুর্গটী এক্ষণে দুই ভাগে বিভক্ত হইল, কৃষ্ণনগর অংশে সেনানিবাস ও অস্ত্রাগার এবং হেতমপুর অংশে সৈন্যাধ্যক্ষের আবাস নির্দ্দিষ্ট এবং এই উভয় অংশ হাফেজখাঁয়ের বাঁধ † নামক সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা দ্বারা সংযুক্ত করা হইল। যাহা হউক, হাফেজখাঁ এই-রূপে দুর্গের নানাবিধ উন্নতিবিধান ও শিক্ষিত সৈন্য দ্বারা বলবৃদ্ধি করিয়া তথায় সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধির বিধান চিরকাল একরূপ থাকে না। এই সময় এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হইল।

হোসেনশা ও রঘুজী

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, হোসেন শা আমিনা ও ওসমানের অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি নানাদেশ ঘুরিয়া অবশেষে বীরভূমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের হেতমপুরে আগমন ও তথায় অবস্থান সম্বন্ধে সংবাদ অবগত হইলেন। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে মীরহবীব্ বর্দ্ধমানের যুদ্ধে মহা-রাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে বন্দী হইবার পর হইতে তাঁহাদের বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে মহারাষ্ট্র-শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন। হোসেন শা বীরভূমে আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া সিহড়ীর দক্ষিণে কেন্দুয়ার বিস্তৃত প্রান্তরে স্থাপিত মহারাষ্ট্র-শিবিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি মীরহবীবের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক বহুমূল্য দ্রব্যাদি ও মণিমাণিক্যের প্রলোভন দেখাইয়া রঘুজী ভোন্‌সলেকে হেতম-পুর-দুর্গ আক্রমণ করিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে রঘুজী ও মীরহবীব অগ্রণী হইয়া বহু সৈন্য সহ উক্ত দুর্গ আক্রমণ করিবার সংকল্পে যাত্রা করিলেন। হোসেনও তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন।

শুনা যায় যে, ওসমান বা হাফেজ পূর্ব্বে এই আক্রমণের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রতিরোধসংকল্পে যথাসাধ্য আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু এই বিপদের সময়ে তাঁহার প্রিয়তমা আমিনা একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন।

* পরিখার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

† হাফেজখাঁর বাঁধ নামক সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা হাফেজখাঁ কর্ত্তৃক খনিত হইয়াছিল। এই বাঁধ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, হাফেজ এই দীর্ঘিকায় নৌকা-রোহণে শীতল সান্ধ্যসমীরণ সেবন করিতেন এবং হেতমপুরের দুর্গ হইতে কৃষ্ণনগরদুর্গে যাতায়াত করিতেন।

মহারাষ্ট্রীয়গণ রজনীর শেষভাগে মহাকোলাহলে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া হেতমপুর-গড় আক্রমণ করিল এবং উভয় পক্ষে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ওসমানের অসাধারণ বীরত্বে ও রণনৈপুণ্যে ক্রমে জয়শ্রী তাঁহারই যেন অঙ্কশায়িনী হইবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু সহসা তাঁহার পরম শত্রু হোসেন গুপ্তভাবে তাঁহাকে ভীষণ অস্ত্রাঘাত করিল, তাহাতেই বীর ওসমান পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ওসমানের মৃত্যুতে তাঁহার সৈন্যগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইবার উপক্রম করিল।

মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক হেতমপুর-দুর্গ আক্রমণ

প্রিয়তমের এইরূপ শোচনীয় মৃত্যু সংবাদে নব প্রসূতি আমিনা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দারুণ জিঘাংসার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বীরাঙ্গণাবেশে যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণা হইলেন। তাঁহার ভয়ঙ্করী রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি-দর্শনে হেতমপুর-দুর্গের নিরাশ সৈন্যগণ আবার নবোৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিল। বীরবংশসম্ভূতা বীরাঙ্গণা আমিনার পরাক্রমে বিপক্ষগণ পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। তখন শেরিণা অসি নিক্ষেপ করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক যথায় হাফেজ মহানিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন, তথায় ধীরপদবিক্ষেপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার চরণযুগল বক্ষে ধারণ করিয়া উর্দ্ধনেত্রে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

আমিনা ও হাফেজের মৃতদেহ

অবশেষে হাফেজের মৃত দেহ গোরস্থ হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাকে কোথায় গোর দেওয়া হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত ভাবে নির্ণয় করা কঠিন। তবে হাফেজ ও শেরিণার মৃত্যু কয়েকদিন অন্তর ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়, যেস্থানে হাফেজখাঁ কবরস্থ হইয়াছিলেন, তাহার পার্শ্বেই পতিপরায়ণা সতী শেরিণাও চিরদিনের জন্য শয়ন করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ কালবশে হাফেজখাঁর নাম বিলুপ্ত হইয়া উক্ত স্থানটি শেরিণার সমাধিমন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সেই স্থানটী বর্ত্তমান দুর্গস্তূপের ঈশান কোণে বিদ্যমান।

ইতিমধ্যে দিল্লির বাদ্শা, হোসেন শার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া আমিনাকে বন্দী করিয়া দিল্লী পাঠাইবার জন্য রাজনগররাজ বাদিউজ্জমানখাঁর প্রতি আদেশ পাঠাইলেন। বীরভূমরাজ বাদশাহের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া হেতমপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, * হোসেন শাও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

* এই স্থানে তাঁহাদের আগমনের সময় লইয়া কিছু গোলযোগ দেখা যায়। "হেতমপুর-কাহিনী" প্রণেতা বলেন যে হাফেজখাঁ যে দিন মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহার কিছুক্ষণ পরেই

হাফেজ বিহনে শেরিণার দুঃখের দিন

শেরিণার দিন যে কিরূপে অতিবাহিত হইতেছিল, তাহা পাঠকবর্গ সহজেই অনুমান করিতে পারেন। একে স্বামিবিয়োগবিধুরা অনাথিনী, তদুপরি অমানুষিক পরিশ্রমে এতই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে আর তাঁহার দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না। পতিবিয়োগদুঃখপ্রশমনের নিমিত্ত শেরিণা শিশু সন্তানটীকে বক্ষে ধারণ করিয়া দরবিগলিত ধারায় সোহাগ করিতেন, স্বামীর আশীর্ব্বাদ যাহাতে পুত্রের মস্তকে বর্ষিত হয়, তজ্জন্য স্বামীর উদ্দেশে করযোড়ে প্রার্থনা করিতেন, যাহাতে স্বামীর নিদর্শন বংশের একমাত্র প্রদীপ এই পুত্র সন্তানটীর প্রাণরক্ষা হয়, সে দীর্ঘজীবন লাভ করে ও সুখস্বচ্ছন্দে থাকে, সেই নিমিত্ত খোদার নিকটে কায়মনোবাক্যে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেন, কিন্তু তাঁহার সে সাধে বাধা পড়িল। একদিন রাত্রিকালে পুত্রটীকে বক্ষে লইয়া নীরবে রোদন করিতে-ছেন—এমন সময় অদূরে তূর্য্যনিনাদ হইল, শেরিণা চমকিয়া উঠিলেন, শুইয়া ছিলেন গাত্রোত্থান করিলেন। বিপদ্ বুঝিয়া নবজাত শিশু-সন্তানটীকে বক্ষে লইয়া দুর্গপ্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন এবং অদূরে সৈন্যগণের মধ্যে হোসেন শার উপর তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল।

হোসেনের পুনরাগমনের উদ্দেশ্য শেরিণা সহজেই বুঝিয়া লইলেন। তিনি এবার আপনাকে নিতান্ত নিরুপায় মনে করিলেন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবনের উৎসাহ, বল, আশা, ভরসা, সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি দিবারাত্র চিন্তা করিয়া তাঁহার নিজের অবস্থা এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার নবজাত শিশুর অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। শেরিণা তাঁহার নিজের ও তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবনের সম্মুখে একটা ঘনান্ধকার দেখিতে লাগিলেন। আশঙ্কা ও বিপদের নানারূপ বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়কে মথিত করিতেছিল। এই আসন্ন বিপদ্ দেখিয়া তিনি মনোমধ্যে ভাবিতে লাগিলেন যে নিজের জীবন শেষ না করিলে হোসেন শাহের হাত হইতে রক্ষা পাইবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। কিন্তু তিনি গেলে শিশুর

রাজা সাহেব সসৈন্যে আমিনার উদ্ধারসাধন জন্য হেতমপুর-দুর্গে উপস্থিত হন। হোসেনও উৎসাহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে রাজাসাহেবের সহিত যোগদান করেন। অপর প্রবাদ এই যে মহারাষ্ট্র-আক্রমণের সাত দিন পরে আমিনার উদ্ধার সাধন জন্য বীরভূমরাজ হেতমপুরে গমন করিয়াছিলেন, সেই জন্য আক্রমণের সময় বিশিষ্টরূপে নিরূপিত না হইলেও ইহা হইতে বুঝা যায় যে মহারাষ্ট্র-আক্রমণের বা হাফেজখাঁর মৃত্যুর অনতিবিলম্বে আমিনার উদ্ধার-সাধন জন্য, বীরভূমরাজ সসৈন্যে হেতমপুর-দুর্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

দশা কি হইবে? তাঁহার আশায় বঞ্চিত হইলে হোসেন শা ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলের ন্যায় এই বালকের উপর তাহার পাশবিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া শেরিণা পুত্রকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক দরবিগলিত ধারায় ভাসিতে লাগিলেন।

শেরিণার শোচনীয় আত্মত্যাগ

দেখিতে দেখিতে বীরভূম-রাজের সৈন্য অন্দরে প্রবেশ করিল। হোসেন শা তৎসঙ্গে ইতস্ততঃ তন্ন তন্ন করিয়া শেরিণার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষে প্রাসাদশিখরে আসিয়া শেরিণার দর্শন পাইলেন। হোসেন শা যেমন তাঁহাকে দুই বাহু প্রসারণ করিয়া ধরিতে যাইবেন, অমনি শেরিণা বা আমিনা বক্ষোধৃত শিশু সহ দুর্গপ্রাঙ্গণস্থিত সরোবরের গভীর জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। প্রতিমার বিসর্জ্জন হইল। প্রেমের জয়পতাকা চিরদিনের জন্য অনন্ত গগনের বক্ষে উত্থিত হইল। যতকাল ইতিহাস থাকিবে, ততদিন সেই পবিত্র প্রেমের গীতি এতদঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে গীত হইবে। যে কার্য্যের জন্য এত নরশোণিতপাত হইল তাহার উদ্ধার সাধন হইল না। কেবল হোসেনের নিষ্ফলা কামকামনাকলুষিতাপ্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি নরকাগ্নির ন্যায় তাঁহার হৃদয়কে দগ্ধ করিয়া শূন্য শ্মশানে পরিণত করিল।

শেরিণার সম্মান

রাজা বাদিউজ্জমানখাঁ শেরিণার এরূপ পতিভক্তি দেখিয়া অত্যন্ত মোহিত হইলেন এবং তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য দুর্গমধ্যে শেরিণার সমাধিমন্দির প্রস্তুত করাইলেন। শেরিণা এক্ষণে হিন্দুমুসলমান সকলেরই পূজিতা। পথিক মন্দিরপার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় তাঁহাকে সভক্তি প্রণাম করিয়া যায়। মুসলমানগণ প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার সমাধিমন্দিরে আলোক প্রদান করেন ও মহম্মদীয় পর্ব্ববিশেষে সম্রাট্‌কন্যার আত্মার কল্যাণকামনায় নমাজ পড়িয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত মনস্কামনাসিদ্ধ্যর্থে অনেক হিন্দুমুসলমান পবিত্র সমাধি স্থানে মানসী (মানত) করিয়া থাকে।

হাফেজ ও শেরিণার জন্ম-মৃত্যুর সময়-নির্দ্ধারণ

এক্ষণে আমরা ওসমান ও তৎপত্নী আমিনার জন্মমৃত্যুর সময়-নির্দ্ধারণের প্রয়াস পাইব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ওসমান আমিনার বাল্যসখা ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। তখন এ অনুমান করা যাইতে পারে যে ওসমান হইতে আমিনার বয়ঃক্রমের বিশেষ তারতম্য ছিল না, তবে ন্যূনসংখ্যায় তিন চারি বৎসর পার্থক্য ধরিয়া লইলে জনশ্রুতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারা যায়। কারণ প্রচলিত প্রবাদে বুঝা যায় যে হাফেজ আমিনা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

যখন ওসমান ও আমিনা হেতমপুরে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন তাঁহারা যুবক যুবতী ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। সুতরাং ওসমানের বয়ঃক্রম তখন ২১।২২ বৎসর এবং আমিনার বয়ঃক্রম ১৬।১৭ বৎসর ধরিয়া লইলে বিশেষ অযৌক্তিক হয় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে হাতেমখাঁর মৃত্যুর আনুমানিক এক বৎসর পূর্ব্বে ওসমান ও আমিনা তাঁহার শরণাগত হইয়াছিলেন এবং হাতেম-খাঁর মৃত্যুকাল আমরা ১৭২৮ হইতে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছি এবং সেই খৃষ্টাব্দ হইতে গণনা করিলে দেখা যায় যে হাফেজ ও আমিনা ১৭০৮ ও ১৭১৩ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৪৫ খৃঃ অব্দে যথাক্রমে ৩৭ ও ৩২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহাদের মৃত্যু হয়। জনপ্রবাদেও তাঁহাদের মৃত্যুকাল এই বয়সেই শুনা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

-❋-

হাফেজখাঁর মৃত্যুর পর এই দুর্গ বাঁকা দিলীপচাঁদ সরকারের কর্তৃত্বাধীনে রক্ষিত হয়। এই সময় বাদীউজ্জমানের পুত্র আলীনকী, আসদজ্জমান ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বরকৎখাঁর হেতমপুর-দুর্গে অবস্থানের কথা শুনা যায়। কিন্তু কি কারণে তাঁহারা এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। বোধ হয় মহারাষ্ট্রীয়গণের অত্যাচার এতদঞ্চলে প্রবল হওয়ায় তাহা দমনার্থে তাঁহারা কিয়ৎকাল হেতমপুর-দুর্গে বাস করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর-গড়ের দক্ষিণপ্রান্তে ও 'হাফেজখাঁএর বাঁধ' নামক বিস্তৃত দীঘিকার পূর্ব্ব প্রান্তে একটী আম্রোদ্যান আছে, উহাকে লোকে "অলীখাঁর বাগান" বলে। স্থানীয় লোকমুখে শুনা যায় যে এই উদ্যানটী আলীনকী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কালক্রমে আলীখাঁর বাগান অলীখাঁর বাগান নামে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। কয়েক বৎসর গত হইল বাগানের উত্তরাংশ বৃক্ষহীন হইয়াছে। ইহা ব্যতীত এতদঞ্চলে তাঁহার নামে একটী পরগণা প্রতিষ্ঠিত হয়, অদ্যাপি তাহাকে আলীনগর পরগণা বলে। মঙ্গলডিহি প্রভৃতি গ্রাম সেই পরগণার অন্তর্গত। হেতমপুর-দুর্গে আলীনকী ও বরকৎখাঁ

হাতেমপুর-দুর্গের পশ্চিমে, হাতেমখাঁ প্রতিষ্ঠিত মুসলমান পল্লীর সহিত সংলগ্ন ভাবে তাহার উত্তরপূর্ব্বে আসদগঞ্জ নামক আর একটী পল্লীর প্রতিষ্ঠা হয়। শুনা যায় যে আসদজ্জমানখাঁর হেতমপুর-দুর্গে অবস্থানকালে এই পল্লী তাঁহার নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। আসদগঞ্জ

বরকৎখাঁও সেইরূপ হেতমপুর-দুর্গের দক্ষিণপশ্চিমের বনাকীর্ণ ভূভাগ পরিষ্কৃত করাইয়া তথায় নিজ নামানুসারে বরকৎপুর পল্লী স্থাপন করেন। নূতন বরকৎপুর অনেক দূরে স্থানান্তরিত হইয়া গ্রামের উত্তরপ্রান্তে স্থাপিত হইয়াছে। কালক্রমে ইহার নামও রূপান্তরিত হইয়া বরকতিপুর হইয়াছে। এই পল্লীর পূর্ব্ব সংস্থান এখন 'বরকতিপুরের মাঠ' বলিয়া অভিহিত। এখনও সময়ে সময়ে কর্ষণকালে ঐ মাঠ হইতে ভস্ম, দগ্ধমৃত্তিকা ও ভগ্নমৃৎপাত্র আদি মনুষ্যবাসের চিহ্ন সকল পাওয়া যায়। কখন্ এবং কি কারণে এইরূপ স্থান-পরিবর্ত্তন ঘটিল তাহা জানা যায় না। তবে অনুমান হয় যে প্রথমতঃ পল্লীটি বরকৎপুর



হেতমপুর- গৌরনাথবাবুর সমাধি ।



হেতমপুর —কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ

দুর্গের অতি সন্নিকট থাকা হেতু পল্লীবাসী স্ত্রীলোকগণের নানারূপ অসুবিধা ঘটিত। দ্বিতীয়তঃ এই পল্লী অন্যান্য গ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে অবস্থিত ছিল বলিয়া অধিবাসিগণের আপদে বিপদে অন্যান্য পল্লীর সাহায্যপ্রাপ্তি বিশেষ কষ্টসাধ্য হইত। তৃতীয়তঃ আসদ্জ্জমান্খাঁর রাজত্বের শেষভাগে তাঁহার প্রভাব* ক্ষীণ হইয়া আসিলে দস্যু-তস্করের অত্যাচার অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠে, এই সময় সেই সকল অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পল্লীবাসিগণ বোধ হয় পুরাতন বরকৎপুর ত্যাগ করিয়া হেতমপুরের উত্তরপ্রান্তে বাস করিয়া নূতন বরকৎপুরের প্রতিষ্ঠা করেন। শুনা যায় যে, আসদ্জ্জমান্ ও বরকৎখাঁ উক্ত আসদ্গঞ্জ ও বরকৎপুর পল্লীস্থাপন করিয়া আসদ্গঞ্জে স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সদ্গোপ, ময়রা, মুদী, সূত্রধর, তন্তুবায়, ধীবর প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও বরকৎপুর বা বরকতিপুরে প্রধানতঃ সুবর্ণ-বণিক্ আনাইয়া বসবাস করাইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় এবং স্থানীয় লোকমুখেও শুনা যায় যে উক্ত রাজকুমারদের সময় হেতমপুরে প্রথমতঃ হিন্দুর বাস হয়।

ধামুড়িয়া

বর্ত্তমান নূতন বরকতিপুরের পশ্চিম প্রান্তে কয়েক ঘর ধুনুরি আসিয়া বাস করে। ক্রমে ইলামবাজার হইতে কয়েক ঘর নরি আসিয়া তথায় বসবাসপূর্ব্বক গালা ও আলতার ব্যবসা আরম্ভ করে। সেই সময়ে কয়েক ঘর কলু আসিয়া নরিদের সহিত বাস করিতে লাগিল। ধুনুরিয়াদের প্রথম বাস বলিয়া লোকে প্রথমতঃ উহাকে ধুনুরিয়া পাড়া বলিত, কিন্তু কালক্রমে উক্ত নাম রূপান্তরিত হইয়া ধামুড়িয়া নামে পরিণত হইয়াছে এবং ধুনুরিয়া বংশেরও একবারে বিলোপ ঘটিয়াছে।

আসদ্জ্জমান্ ও বরকৎখাঁর সময়ে হাতেমপুর গ্রাম নানা পল্লীতে বিভক্ত হইয়া উত্তরে এবং পূর্ব্বে বর্দ্ধিত হইল এবং অধিবাসীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইলে সমস্ত পল্লী মিশিয়া এক হইয়া গেল।

হেতমপুর-কাহিনী-প্রণেতা লিখিয়াছেন যে আসদ্জ্জমানের উপদেশক্রমে হেতমপুর ভিন্ন অপর পল্লীত্রয়ের অর্থাৎ আসদ্গঞ্জ, বরকৎপুর ও ধামুরিয়া বাস্তু ও উদ্বাস্তুর জমা ধার্য্য হয়। তিনি বলেন, হাতেমখাঁ হাতেমপুরবাসী কোন প্রজার নিকট বাস্তুর কর গ্রহণ করেন নাই। আসদ্খাঁও সেই বন্দোবস্ত বাহাল রাখিয়া হাতেমখাঁর সম্মান রক্ষা করেন। ইহার কারণ এই অনুমান হয় যে প্রথমে গ্রাম নগর বসাইতে কোন

* বীরভূম-রাজবংশ দ্রষ্টব্য।

রকম প্রলোভন না দেখাইলে প্রজাগণ স্বজন ও আত্মীয়গণ পরিবেষ্টিত স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া জনমনুষ্যহীন স্থানে আসিয়া বাস করিতে সম্মত হয় না। সেই জন্য প্রথমতঃ গ্রাম বা নগর বসাইতে যত কষ্ট বোধ হয়, এক বার বসিয়া গেলে তাহার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করা পরে আর তত কষ্টকর হয় না। বিশেষতঃ এই ভূখণ্ড বহুবিস্তৃত শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যে পূর্ণ ছিল, সেই কারণে বোধ হয় হাতেমখাঁ বীরভূমরাজের নিকট হইতে হাতেমপুরের প্রজাগণের জন্য একেবারে চিরস্থায়ী লাখেরাজ সনন্দ আনাইয়া দেন। তজ্জন্য হেতমপুরপল্লীবাসী সেই লাখেরাজস্বত্ব স্থায়িভাবে উপভোগ করিয়া আসিতেছে।

অন্যান্য পল্লীত্রয় বন্দোবস্তের জন্য রাজা বাদীউজ্জমানখাঁ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থবংশীয় সীতারাম ঘোষ নামক জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে এই স্থানে প্রেরণ করেন। তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন আমীন ও মুহুরী আসেন, তাঁহারাও অনেকে কায়স্থ ছিলেন বলিয়া জানা যায়। সীতারাম ঘোষ দীর্ঘকাল এ স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক পল্লীত্রয়ের জরিপ করিয়া বাস্তু ও উদ্‌বাস্তুর জমা ধার্য্য করেন। তাঁহার কার্য্যকুশলতায় আসদ্‌খাঁ বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কার প্রদান করিতে ইচ্ছুক হয়েন। কিন্তু সীতারাম ঘোষ অন্য পুরস্কার গ্রহণ না করিয়া হেতমপুরবাসের অনুমতি ও তজ্জন্য কর্ম্মচারিবর্গ লইয়া নূতন বরকতিপুরের পশ্চিমদক্ষিণাংশে যে স্থানে বাস করিতেছিলেন সেই স্থানটী লাখেরাজ প্রার্থনা করেন। সীতারাম ঘোষ

এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে বৃদ্ধ সীতারাম ঘোষ যে স্থানে বাস করিতেন, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত পতিত ভূমি আসদ্‌খাঁ অশ্বারোহণে প্রদক্ষিণ করিয়া অশ্বপদচিহ্নের মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ড সীতারাম ঘোষকে লাখেরাজ স্বরূপ প্রদান করেন এবং সীতারামের নামানুসারে এই পল্লীর নামকরণ হয়, কিন্তু ইংরাজের প্রথম অধিকারের সময় যে থাকবস্তার জরিপ হইয়াছিল, তাহাতে সীতারামপুর লাখেরাজ বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। অদ্যাবধি সেই ক্ষুদ্র পল্লীতে কায়স্থগণের বাস আছে।

এইরূপে কায়স্থ ও নবশায়ক সম্প্রদায় গ্রামে বাস করিলে পর ব্রাহ্মণগণ এ স্থানে কিরূপে আনীত হয়েন তাহা লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। হেতমপুরের বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ চৈতন্যচরণ চক্রবর্ত্তী সঙ্গীত-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া, হাফেজখাঁ কর্ত্তৃক তিনি রাজনগর হইতে প্রথমে হেতমপুরে আনীত হয়েন। এতদ্ব্যতীত অপরাপর ব্রাহ্মণগণের আগমন শ্রীনিবাস গঙ্গোপাধ্যায়

সম্বন্ধে দুইটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে—প্রথম, হেতমপুরে মুসলমান আধিপত্যের সময় বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রসার হইলে অনেক হিন্দু তথায় গমনাগমন করিতেন; কিন্তু তাঁহাদিগের থাকিবার ও খাইবার বিশেষ কষ্ট হওয়ায় হেতমপুর-দুর্গের অধ্যক্ষ রাজনগরের সন্নিকটস্থ গাঙ্‌মুড়ি বা গাঙ্গটে হইতে শ্রীনিবাস গঙ্গোপাধ্যায়কে হেতমপুরে আনয়ন করেন; তাঁহার বংশবৃদ্ধিহেতু ও তৎকর্ত্তৃক আরও অনেক ব্রাহ্মণ আনীত হইলে ক্রমশঃ এখানে ব্রাহ্মণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে মুলিরাম সৌ নামক জনৈক শৌণ্ডিক এখানে বাস করিতেন। তিনি সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত "মূলে পুষ্করিণী" এখনও বর্ত্তমান আছে। তিনি বর্ত্তমান বুড়োশিব নামক অনাদিলিঙ্গের পূজার ব্যবস্থার জন্য কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেন, সেই সম্পত্তি অদ্যাবধি বর্ত্তমান। মুলিরাম তাঁহার ইষ্টদেবের ইষ্টদেব কিষণ নায়ককে এই শিবের সেবাইত নিযুক্ত করেন। কিষণ নায়ক প্রতিষ্ঠিত "কিষু নায়ক পুষ্করিণী" অদ্যাপি বর্ত্তমান। এই দেবোত্তরসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ জন্য কিষণ নায়ক তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীনিবাস গঙ্গোপাধ্যায়কে আনয়ন করিয়াছিলেন।

প্রথমাধ্যায়ে কথিত রাঘবপুরনিবাসী রাঘব রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র সন্তান জীবিত ছিলেন। বাদীউজ্জমানখাঁ গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। তিনি পরে রাঘবরায়ের স্বাধীনপ্রকৃতি ও বীরত্বের পরিচয় পাইয়া আপনার ভ্রান্তি বুঝিতে পারেন, এবং মৃত মহাত্মার প্রতি অবিচারের প্রতিকার স্বরূপ তাঁহার একমাত্র পুত্রকে রাজনগরে আহ্বান করিয়া কুণ্ডহিত প্রভৃতি ২২ পরগণার নায়েব নিযুক্ত করেন এবং সাঁওতালপরগণা মধ্যে একটি মৌজা লাখেরাজ দান করিয়া নবপল্লী হেতমপুরে বাস করিতে আদেশ প্রদান করেন। এই সকল নবাগত ব্রাহ্মণগণের আদানপ্রদান-ব্যাপারে অনেক কুলীন-ব্রাহ্মণও আনীত হন। এইরূপে হেতমপুরে হিন্দু ও ব্রাহ্মণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় জনশ্রুতিটী আমাদের অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। কারণ নবশায়কগণের কোন ক্রিয়াকলাপ ব্রাহ্মণ ভিন্ন সম্পন্ন হয় না। সুতরাং তাঁহারা হেতমপুরে বাস করিলে তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন জন্য যে এই সকল ব্রাহ্মণ এখানে আনীত হইয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বাঁকা দিলীপ-চাঁদ

পূর্ব্বেই বাঁকা দিলীপচাঁদের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার প্রকৃত নাম রূপ-চাঁদ দাস। রাজনগরের অন্তর্গত রাধানগরে তাঁহার বাস ছিল। তিনি উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্যনির্ব্বাহ করায় তিনি রাজসরকার হইতে "বাঁকা দিলীপচাঁদ" উপাধি প্রাপ্ত হন। সীতারাম ঘোষ সপরিবারে সীতারামপুরে বাস করিলে পর দিলীপচাঁদও তথায় বাস করিবার জন্য রাজনগররাজের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং সেই সঙ্গে হেতমপুরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে কিছু নিষ্কর জমীর জন্য আবেদন করেন।

রাজা সাহেব তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। তিনি স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া সীতারামপুরে বাস পরিবর্ত্তন করিলেন। রাজা সাহেব তাঁহার আবেদনমত এখানে ৪০ বিঘা লাখেরাজ জমী প্রদান করেন।* রূপদাসকে লাখেরাজ দানের সনন্দের তারিখ দৃষ্টে অনুমান করা যায় যে, ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ হাফেজখাঁর মৃত্যুর পর এবং বঙ্গাব্দ ১৬৬৩ বা ১৭৫৭ খৃঃ অব্দ অর্থাৎ রূপদাসের লাখেরাজ সনন্দপ্রাপ্তির তারিখের মধ্যে পূর্ব্বলিখিত নূতন পল্লীত্রয়ের প্রতিষ্ঠা এবং হেতমপুরে ব্রাহ্মণ, নবশাখা ও শূদ্রগণের বসতি হইয়াছিল।

বীরভূমরাজ বাদীউজ্জমানের সিংহাসন-পরিত্যাগ।

ইহার পর বীরভূমরাজ্যে কথঞ্চিৎ অশান্তি ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।† বাদীউজ্জমানের চিত্ত ক্রমশঃ ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইলে তিনি সৈফুলহক্ নামক জনৈক ফকিরের সহিত মিলিত হইয়া কোরাণ শ্রবণে দিন অতিবাহিত করিতেন। সুতরাং রাজকার্য্যে শৈথিল্য উপস্থিত হইল। তদৃষ্টে পুত্র আহম্মদ ও আলীনকী নবাব আলীবর্দ্দিখাঁর নিকট গমন করেন এবং নবাবের আদেশমত তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ফকিরকে গুপ্তাঘাতে হত্যা করেন। এই হত্যাকাণ্ডের কথা শ্রবণ করিয়া রাজাসাহেব একেবারে মর্ম্মাহত

* এই জমী প্রদানের সনন্দের প্রথম ৫ লাইন পারসী ভাষায় লিখিত আছে, তাহার পর যে বাঙ্গলা লিখিত আছে তাহার অবিকল নকল নিম্নে লিখিত হইল—

"ইঃ শ্যামরায় শিকদার পং সাহালামপুর বেদানন্দ সাকিম রাধানগরের রূপচন্দ্র দাস হুজুরের জাহির করিলেক যে পরগণে সাহালামপুর মধ্যে মৌজে বরকতিপুরের মাঠে মোয়াজি ৪০/ বিঘা জমী পতিত বক্সিস হুকুম হয় তবে আবাদ করিয়া ভোগ করি ইহার যেমন হুকুম হয় অতএব দাস মঞ্জুরকে পং সাহালামপুরের মধ্যে মৌজে বরকতিপুরের মোয়াজি ৪০/ বিঘা এরাজি পতিতে বক্সিস হুকুম করিলে নিশাদা করিয়া দিহ যেন আবাদ ভোগ করে। ইতি সন ১১৬৪ সাল তারিখ ২৫শে ফাল্গুন।"

† বিশেষ বিবরণ বীরভূম-রাজবংশে দ্রষ্টব্য।

হইলেন এবং সেই সময় হইতে বিষয়কর্ম্মে সম্পূর্ণ বীতরাগ হইয়া ধর্ম্মে আরও প্রগাঢ়রূপে মনোনিবেশ করিলেন। এই ঘটনায় রাজভ্রাতা আজিমখাঁ বড়ই চিন্তাকুল হইয়া রাজকুমারগণের মধ্যে একজনকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। সকলের পরামর্শানুসারে ও নবাবের অনুমতিক্রমে চতুর্থ পুত্র আসদ্জ্জমানকে ১৭৫২ খৃঃ অব্দে বা ১১১৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে বীরভূম-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

ইহার চারি বৎসর পরে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব আলিবর্দ্দীর মৃত্যু হয় এবং সিরাজ-উদ্দৌল্লা সেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, কিন্তু সিরাজের ভাগ্যে এক বৎসর মাত্র রাজ্য ভোগ ঘটিয়াছিল, তৎপরে সমগ্র বঙ্গরাজ্যে এক ভীষণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন যে, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর সমরপ্রাঙ্গণে সিরাজের পরাজয় ঘটিলে তৎপরিবর্ত্তে বঙ্গে বৃটীশ্ রাজ্যের সূচনা আরম্ভ হয়।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী সিরাজের সেনাপতি মীরজাফরআলীখাঁকে মুর্শিদাবাদের নবাব-তক্তে অধিষ্ঠিত করিলেন। আবার কিছুদিন পরে উক্ত নবাব সিংহাসনচ্যুত হইলে তাঁহার জামাতা মীরকাসিমআলীখাঁ তৎপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি অন্যান্য জমিদারের ন্যায় বীরভূমরাজকেও বর্দ্ধিত হারে কর দাখিল করিতে আদেশ করেন। বীরভূমরাজ কর দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় মীরকাসিম ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে (২) নগর হইতে ১০।১২ ক্রোশ দূরে বুধগ্রামে শিবির-সন্নিবেশ করিলেন। নবাব সেই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক খাজা-মহম্মদী খাঁ, মেজর ইয়র্ক ও গুর্গণ খাঁকে রাজার দমনার্থ সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন।

নবাব মীরকাসিম আলীর সহিত বীরভূমরাজ আসদজ্জমানের সংঘর্ষ

এদিকে আসদ্জ্জমানখাঁ পিতা বাদীউজ্জমানখাঁকে দেওয়ানস্বরূপে রাজ-কার্য্যপরিচালনের ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তিনি সিহড়ীর দুই মাইল পশ্চিমে করিধা নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া, তথায় চারি পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী ও দুই শত পদাতিক সৈন্যসহ শিবির-সংস্থাপন করিলেন, এবং সেই স্থান হইতে রাজ্যের প্রত্যেক ঘাটে অজস্র সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। জয়শ্রী বীরভূমরাজের পক্ষ অবলম্বন করিতে উদ্যত হইলেন।(৩)

করিধায় বীরভূম রাজের শিবির সন্নিবেশ

(১) The Seir Mutaqherin, vol. II. P. 394.
(২) Long's Selections from Govt. Records, P. 241.
(৩) The Seir Mutaqherin, vol. II. P. 395-96.

কিন্তু একটী আকস্মিক ঘটনাতে তাহা হইল না। যুদ্ধের প্রারম্ভেই মীরকাসিমের অনুরোধে কোম্পানী-বাহাদুর-প্রেরিত মেজর হোয়াইট সসৈন্যে বর্দ্ধমানে আসিয়া শিবিরস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নবাব-সৈন্যের দুর্দ্দশার সংবাদ পাইয়া বহু তেলেঙ্গা সিপাহীর সহিত পশ্চাৎ হইতে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া আসদজ্জমানকে পরাজিত করিলেন।

আসদজ্জমানের পরাজয়

অতঃপর মীরকাসিমআলিখাঁ ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষকে পত্র লিখিয়া জ্ঞাপন করিলেন, "আমি ২৮শে জমেদ উল্ আউয়াল্ সংবাদ পাইয়াছি, আমাদের সৈন্যের আগমনে ভীত হইয়া বীরভূমরাজ তাঁহার রাজধানী নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক বনাকীর্ণ পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করিয়াছেন।" এই সংবাদ প্রচারিত হইবার পরে মেজর ইয়র্ক নির্ব্বিবাদে রাজনগরের দুর্গ অধিকার করিলেন।(১)

আসদজ্জমানের পুনরুদ্যোগ

আসদ্জ্জমান পলায়নের পরেও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি শিওভটকে আহ্বান করিলেন। শিওভট তাঁহার আহ্বানে দুই তিন সহস্র অশ্বারোহী ও বহুপদাতিক সৈন্যসহ তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।(২)

তকিখাঁ ও ম্যাক্লিয়নের সমর-আয়োজন

মীরকাসিম বীরভূমরাজের এই সমর-আয়োজনের বিষয় অবগত হইয়া, সেনাপতি মহম্মদ তকিখাঁকে বীরভূমে পাঠাইয়া সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক সমর-আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন।(৩) এদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এল্ ম্যাক্লিয়নের অধিনায়কত্বে বহু সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং সিহুড়ীতে একটী দুর্গ স্থাপন করাইলেন।

এই সময়ে দেশের বাণিজ্য-শুল্ক-সংক্রান্ত গোলমালের উপলক্ষে ব্যবসায়ী ইংরাজ কোম্পানীর সহিত নবাব কাসিমআলীখাঁর মনোমালিন্য সূচিত হইল। শত্রুপক্ষের মধ্যে বিচ্ছেদের আভাস পাইয়া, আসদ্জ্জমান অবিলম্বে সেনাপতি সুরাজবেগের অধীনে তিন শত অশ্বারোহী, পাঁচ শত পদাতিক ও পাঁচটী কামান ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ইংরাজ সেনাপতি ম্যাক্লিয়নও সসৈন্যে এই বাহিনীর দিকে অগ্রসর হইলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর (৪) সিহুড়ীর নিকট করিধার প্রান্তরে উভয় পক্ষের ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল।

(১) Long's Selections from Govt. Records, P. 249.
(২) Long's Selections from Govt. Records, P. 250.
(৩) Long's Selections from Govt. Records, P. 279.
(৪) Long's Selections from Govt. Records, P. 329.

সেই যুদ্ধে সুরাজবেগ পরাজিত ও বিতাড়িত হইলেন। ম্যাক্লিয়ন তাঁহার সমস্ত কামান হস্তগত করিলেন; কিন্তু এই যুদ্ধাবসানের দুই ঘণ্টা পরেই সংবাদ আসিল যে, বীরভূমরাজের সেনাপতি কন্দরখাঁ ছয় হাজার অশ্বারোহী পাঠান-সেনা, কতিপয় পর্ত্তুগীজ ও আর্ম্মাণী সৈন্য এবং কয়েকটী কামান লইয়া ছয় ক্রোশ দূরে উপস্থিত হইয়াছেন।(১) আমাদের দৃঢ় অনুমান, কন্দরখাঁ হেতমপুরদুর্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন; কারণ হেতমপুর করিধা হইতে ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত এবং পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তথায় নগররাজের একটী সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। তদ্ব্যতীত হেতমপুরে একটী জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, তথাকার দুর্গে নগররাজের সহিত ইংরাজ ও নবাবের যুদ্ধ হইয়াছিল।

কন্দরখাঁর হেতমপুর-দুর্গ আক্রমণ

ম্যাক্লিয়ন পূর্ব্ব-যুদ্ধের বিজয়-গৌরবে মত্ত হইয়া সসৈন্যে আমোদ-প্রমোদ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এইরূপ প্রতিকূল সংবাদ আসায়, তাঁহার হর্ষ বিষাদে পরিণত হইল। তিনি বিপক্ষের এই বিশাল বাহিনীর সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না। তখন স্বপক্ষের কামানগুলির মুখে সীসা গলাইয়া ঢালিয়া তাহাদিগকে বিপক্ষের ব্যবহারানুপযোগী করিয়া দিলেন। তৎপরে সিহড়ীর দুর্গ ও চালাদি অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিলেন। এই সকল কার্য্য-সম্পাদন করিয়া, তিনি তথা হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে মহম্মদ তকি-খাঁকে নবাব পক্ষের সমস্ত সৈন্য লইয়া আসিতে দেখিলেন। এখন এই উভয় বাহিনী একত্র মিলিত হইয়া সবেগে হেতমপুরদুর্গাভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং হেতমপুরদুর্গ আক্রমণ করিলেন। হেতমপুর-দুর্গে বীরভূমরাজের সৈন্যের সহিত ইংরাজ ও নবাবের সম্মিলিত বাহিনীর যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার বিশেষ বিবরণ সম্বন্ধে এতদঞ্চলে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

নবাবসৈন্য-কর্ত্তৃক হেতমপুর-দুর্গ আক্রমণ

রাজা আসদ্জ্জমানখাঁ এই সময় হেতমপুর-দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। ম্যাক্লিয়ন্ ও তকীখাঁ সসৈন্যে গুপ্তাক্রমণ করিলে বীরভূমরাজের সৈন্যগণও ভীমবেগে প্রতি-আক্রমণপূর্ব্বক ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত করিল। বীরভূমরাজের হেতমপুরদুর্গের হিন্দু সেনাপতি দিলীপচাঁদ ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহাদের সমর-আয়োজন-বার্ত্তা জানিতে পারিয়া রাজনগর ও দুর্ল্লভপুর হইতে বহু সৈন্যসংগ্রহ করিয়াছিলেন। রাজনগর হইতে যে সৈন্য আসিয়াছিল, তাহাই পূর্ব্বোক্ত কন্দরখাঁ-পরিচালিত

(১) Long's Selections from Govt. Records, P. 329.

বাহিনী ; এবং গোরাচাঁদ রায়(১) ঘাটচুল্লভপুর হইতে আগত সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। এই হিন্দু সেনাপতিদ্বয় ও কন্দরখাঁ আজ অদম্য বীরত্ব ও অসীম সমর-নৈপুণ্যের সহিত ম্যাক্লিয়ন ও তকীর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। এই সম্বন্ধে একটি ছড়া প্রচলিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"আগে যায় বাঁকা দীপচাঁদ পিছে গোরারায়।"

দিলীপচাঁদও গোরাচাঁদের মৃত্যু

কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর বিপক্ষের একটী গোলা আসিয়া গোরাচাঁদকে আহত করিল। সেই আঘাতে তিনি সমরক্ষেত্রে পতিত হইলেন। গোরাচাঁদের মৃত্যুতে দিলীপচাঁদ বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া সমস্ত বাহিনীর পরিচালনভার স্বয়ং গ্রহণপূর্ব্বক বিপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু সহসা বিপক্ষদল হইতে ভীমবেগে একটি বর্ষা আসিয়া দিলীপচাঁদের বক্ষঃস্থল ভেদ করিল। তিনি ঘোটকারোহণে ছিলেন, সেই অবস্থায় ঘোড়া তাঁহাকে পৃষ্ঠে করিয়া সমরপ্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে ছুটিল এবং দিলীপচাঁদের বাটীর অনতিদূরে নিপতিত হইয়া প্রভুসহ জীবনলীলা সংবরণ করিল। (২) বীর দিলীপ শত্রুদল মথিত করিয়া সম্মুখ সংগ্রামে দেহত্যাগপূর্ব্বক দেবগণের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া হাসিতে হাসিতে স্বর্গে চলিয়া গেলেন। দিলীপচাঁদের মৃত্যুর পর কন্দরখাঁর অধীনে বীরভূমসৈন্য সমভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

আসদজ্জমান হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক দুর্গাভ্যন্তর হইতে উভয় পক্ষের সমরক্রীড়া দর্শন করিতেছিলেন। রাজদর্শনে বীরভূমের সৈন্যগণ ঘোর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল। তাহাদের ভীম আক্রমণে নগরের সৈন্য ও ইংরাজের সৈন্যগণ হতাশ হইয়া পড়িল। এমন সময় সহসা বিপক্ষদল হইতে একটী গোলা আসিয়া রাজার হস্তীর কপোলদেশে আঘাত করিল। এ সম্বন্ধে আর একটা জনশ্রুতি শুনা যায় যে, সাঁওতালপরগণার অন্তর্গত পুণ্ডহিতের নিকট বনকাটী গ্রামের ধোপা-বংশীয় জনৈক ব্যক্তি আসদজ্জ-মানখাঁর দেওয়ান ছিলেন। তিনি যুদ্ধকালে রাজার সহিত হস্তি-পৃষ্ঠে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বিপক্ষদলের নিকট হইতে পূর্ব্বাহ্নে

(১) [বীরভূম-রাজবংশ ৯৫ পৃষ্ঠা] গোরাচাঁদের বংশধর মাখন ও বেলুমাল রাজমিস্ত্রীর কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে।

(২) কৃষ্ণকিঙ্কর সেনের যে স্থানে খামার বাটী হইয়াছে, তাহার প্রাচীরের বাহিরে রাস্তার পার্শ্বে একটি আম্রবৃক্ষ ছিল, তাহাকে লোকে 'রুইমুড়া আমগাছ' বলিত। প্রাচীন লোকমুখে শুনা যায় যে, এই স্থানে দিলীপচাঁদ মানবলীলা সংবরণ করেন, এই বৃক্ষ হইতে দিলীপচাঁদের বাড়ী ৩০।৪০ হাত দূরে অবস্থিত।

উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন বীরভূম-রাজের সৈন্যগণ ভীম পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া শত্রুগণকে বিধ্বস্ত করিতেছিল, সেই সময় রাজা-সাহেব দুর্গস্থিত কতক সৈন্য লইয়া শত্রুগণকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণের সঙ্কল্প করেন। কিন্তু দেওয়ান মহাশয় তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "ভীরু কাপুরুষগণই পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করে, বীরগণ সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। আর আমাদের সৈন্যগণ যখন বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছে, তখন আমাদের পশ্চাদ্ভাগ হইতে আক্রমণ করিয়া নিন্দাভাজন হইবার প্রয়োজন কি? চলুন, আমরা সম্মুখে শত্রুদিগকে আক্রমণ করি।" এই প্রবঞ্চনাবাক্যে বিশ্বাস করিয়া রাজা যেমন হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক শত্রু-সম্মুখীন হইলেন, অমনি বিপক্ষদলের একটী গোলা আসিয়া হস্তীর কপোলদেশে আঘাত করিল। হস্তী সেই আঘাতে উন্মত্ত হইয়া রাজাকে পৃষ্ঠে করিয়া ভীষণ-বেগে পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইল। ক্রমে কিছুদূর অতিক্রম করিয়া তালবেড়িয়ার জঙ্গলে প্রবেশ করিল। রাজা-সাহেব বর্ত্তমান মানসায়েরের সন্নিকটে একটি বটবৃক্ষের ডাল ধরিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। কিন্তু তিনি সেই ডালটী ধারণ করিয়া বেশীক্ষণ থাকিতে না পারায় ভূপতিত হয়েন। সেই পতনে তাঁহার একটি পা ভগ্ন হইয়া যায়। বহু ক্লেশভোগের পর রাজার জীবনরক্ষা হইল বটে, কিন্তু পা আর ভাল হইল না। তদবধি সাধারণে তাঁহাকে 'খোঁড়া রাজা' বলিত। রাজাসাহেবকে হস্তিপৃষ্ঠে সহসা পলায়নপর দেখিয়া সৈন্যগণ হতাশ হইয়া পড়িল; হঠাৎ রাজার অদর্শনে তাহাদের উদ্যমভঙ্গ হইল। সেনাপতি কন্দর খাঁ আর তাহাদিগকে স্থির রাখিতে পারিলেন না। সেই ঘোর যুদ্ধে রাজ-সৈন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিশৃঙ্খলার সহিত চতুর্দ্দিকে পলায়নপর হইল। নবাব ও ইংরাজ-সৈন্য জয়লাভ করিয়া অনায়াসে হেতমপুরদুর্গ অধিকার করিল। এই সময় হইতে আসদুজ্জমান স্বরাজ্যে বঞ্চিত হইলেন। এই যুদ্ধের পর হইতে হেতমপুরদুর্গ ক্রমশঃ ভগ্ন ও ধ্বংসমুখে পতিত হয়। হেতমপুর নামক গ্রামখানিও তখন তেমন প্রসিদ্ধ ছিল না। প্রাচীন মানচিত্রাদিতে তজ্জন্যই ইহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। উপসংহারে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, হেতমপুর গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণতির সূত্রপাত হেতমপুরগড় ধ্বংস হওয়ার সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল।

আসদুজ্জমানের রাজ্যনাশ

চতুর্থ অধ্যায়

আসদজ্জমান রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইবার পর হেতমপুরে কয়েকটী প্রসিদ্ধ বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। হেতমপুরের প্রাচীন-কাহিনী যাহা বিবৃত হইল, হেতমপুরের বর্ত্তমান কাহিনী বিবৃত না করিলে তাহা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। তজ্জন্য শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার প্রণীত "হেতমপুর-কাহিনী" হইতে এবং লোক-পরম্পরা-প্রচলিত কিম্বদন্তী প্রভৃতি অবলম্বনে অবশিষ্ট বিবরণ সংগৃহীত করিয়া দিলাম।(১) আসদজ্জমান খাঁ রাজ্যচ্যুত হওয়ার পরবর্ত্তী প্রধান ঘটনা হেতমপুর-রাজবংশের ক্রমাভ্যুদয়। হেতমপুরে সে সময় আরও কয়েকটী সম্ভ্রান্ত বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল; সুতরাং হেতমপুর-রাজবংশ বিবরণীর সহিত তাঁহাদের বিবরণীও প্রদত্ত হইল। [প্রকাশক]

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,—মুলিরাম সৌ নগরাধিপতির কর্ম্মচারী হইয়া হেতমপুরে আগমন করেন। তিনি অর্থশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ বর্ত্তমান আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা অতি শোচনীয়; মস্ত-বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ হয়। উক্ত মুলিরাম সৌ দ্বারা কিষণ নায়ক হেতমপুরে আনীত হন। শুনা যায়, তিনি সাঁওতাল-পরগণার অন্তর্গত জঙ্গল-প্রদেশে ব্যবসা করিয়া অর্থশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত "কিষু-নায়ক পুষ্করিণী" হইতেও তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। কিষণ নায়ক তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীনিবাস গাঙ্গুলিকে আনয়ন করেন। এইরূপ শুনা যায় যে, শ্রীনিবাস এখানে আসিয়া বাস করাতে তাঁহাকে তাঁহার আত্মীয়-কুটুম্বগণ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। কথিত হয়, গাঙ্গুলী-উপাধিযুক্ত ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বে "গাঙ্গুল" নামক গ্রামবিশেষের অধিবাসী ছিলেন। জাতীয় ইতিহাসের সুযোগ্য লেখক, কীর্ত্তিমান্ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উক্ত ইতিহাস-পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, এই গ্রামের নাম হইতে উক্ত উপাধি গৃহীত হইয়াছে। শ্রীনিবাস অতি ধার্ম্মিক ও বৈষ্ণবধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বিশেষ অভাবতাড়িত হইয়া স্বগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক মাতুলাশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি হেতমপুর আসিলে কিছু নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি স্বীয় অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি বালগোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিত থাকায় মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্র অচ্যুতানন্দকে উক্ত-বিগ্রহ-স্থাপনবিষয়ে বিশেষ অনুরোধ করিয়া যান।

শ্রীনিবাস গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁহার বংশধরগণ

পুত্রও পিতার ন্যায় বৈষ্ণবধর্ম্মে বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। তিনি ক্রমশঃ সাঁওতাল-পরগণায় ধান, চাল, সরিষার কারবার ও তেজারতি করিয়া বিশেষ বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া উঠেন। আমাদের অনুমান হয় যে, কিষণ নায়কের মৃত্যুর পর তাঁহার সাঁওতাল-পরগণার ব্যবসায় অচ্যুতানন্দের হস্তগত হয়।

এই সময় তিনি একদিন "সার টমাস" (দেওঘরের সন্নিকট) নামক জঙ্গলে বসিয়া

(১) শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার প্রণীত হেতমপুর-কাহিনী পাঠ করিয়া মনে হয় "হেতমপুর রাজবংশের আদিপুরুষ মুরলীধর চক্রবর্ত্তী অতি দরিদ্র ছিলেন এবং এই বংশে রাধানাথ চক্রবর্ত্তী অতি হীনাবস্থা হইতে ক্রমে উন্নত হন"। কিন্তু অনুসন্ধানে যাহা অবগত হইয়াছি, তাহা সরকার মহাশয়ের কথিত বিবরণীর সম্পূর্ণ বিপরীত। যথাস্থানে সে সমস্ত সন্নিবেশিত হইল।

তাঁহার পিতার অন্তিম ইচ্ছা কিরূপে পূর্ণ হইবে, কোথায় সেরূপ বালগোপালমূর্ত্তি পাওয়া যাইবে ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একজন ব্রহ্মচারী একটী অষ্টধাতুনির্ম্মিত বালগোপাল ও একটি শ্রীধরমূর্ত্তি লইয়া উপস্থিত হইলেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত মূর্ত্তি দুইটী প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মচারী তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করেন। ২৭।২৮ বৎসর গত হইল, শঙ্করানন্দ স্বামী নামক ৬৪।৬৫ বৎসর বয়স্ক একজন উদাসীন এখানে মধ্যে মধ্যে আসিতেন। তিনি গল্প করিতেন যে, তাঁহার গুরুর গুরু শিবানন্দ বৈষ্ণব উক্ত গোপাল ও শ্রীধরমূর্ত্তি অচ্যুতানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়াছিলেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় মহোল্লাসে শ্রীশ্রীগোপালজীউ বিগ্রহ স্থাপন করেন। জঙ্গল-মহালে ও ঘরে নানারূপ কারবার করিয়া যদিও বিশেষ অর্থসম্পন্ন ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি ৺গোপালজীউর জন্য পূজারী নিযুক্ত করেন নাই, অচ্যুতানন্দ স্বয়ং সেবাপূজা করিয়া হৃদয়ে তৃপ্তিলাভ করিতেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের পঞ্চাশ হাজার গোরু ছিল। হেতমপুরদুর্গের পশ্চিমে তৎপ্রতিষ্ঠিত "গাঙ্গুলী পুষ্করিণী" অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। তাঁহার রচিত একটি সংগীত আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

গীত।

গৌর হয়ে হরি কাল হতে আর সাধ কেন,
গোরারূপে কত মজা তবে তুমি কেন মলিন।
তুমি আমার কাঁচা সোণা, আমিত কাল জানি না,
এক কালের কাল ঘুচিয়েছি কাল শ্রীঅঙ্গ করি মার্জ্জন॥
ঠাকুর যদি তুমি হও হে কাল, তবে আর কে হবে ভাল,
আমার মনের কালি কে ঘুচাবে ওহে কালীয়-দমন।
এস আজ ঘুচিয়ে দিয়ে তোমার কালী, বাড়াই তোমার ঠাকুরালী,
দেখো অন্তে তোমার অচ্যুতে ভুলো না যেন॥

অচ্যুতানন্দের মৃত্যুর পর গঙ্গোপাধ্যায়-বংশের দুই তিন পুরুষ পর্য্যন্ত অবস্থা ভাল ছিল। তৎপরে তাঁহার জনৈক বংশধর কুক্রিয়াসক্ত হইয়া অনেক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলে, তদবধি তাঁহাদের অবস্থা হীন হইতে আরম্ভ হয়; এক্ষণে ২৫।২৬ বৎসর গত হইল সে বংশের বিলোপসাধন হইয়াছে।

রাঘবানন্দ রায়ের বংশধরগণ

শ্রীনিবাসের সমকালেই সম্ভবতঃ রায়বংশের অভ্যুত্থান হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রাঘবরায়ের কনিষ্ঠ পুত্র হেতমপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহাকে বাদিউজ্জমান ২২ পরগণার নায়েব করিয়া দেন। গাঙ্গুলীগণ ধনসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু রাঘবপুত্র ধনবান্ ও প্রতিপত্তিশালী লোক হইয়া উঠেন। তিনি কতকাল জীবিত ছিলেন তাহা জানা যায় না। তৎপুত্র বিকলরাম রায় পিতার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনিও রাজনগরের রাজার অধীনে উক্ত ২২ পরগণার মালিক হয়েন এবং পিতার ন্যায় প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়া উঠেন। তৎপুত্র নীলাম্বর রায়। হেতমপুরের বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রাধানাথ ও কুচিল চক্রবর্ত্তীতে যে মোকদ্দমা হইয়াছিল, সেই দলিল দৃষ্টে জানা যায় যে, নীলাম্বর রায় ১১৮৭ সালে জীবিত ছিলেন এবং তখন এত প্রবীণ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার শক্তি একেবারে রহিত হইয়াছিল। তিনি পিতার ন্যায় উপযুক্ত ছিলেন না বলিয়া ২২ পরগণায় নায়েব হইতে পারেন নাই। তিনি কুণ্ডহিত পরগণার আদায়কারী নিযুক্ত হয়েন এবং হেতমপুরের অন্তর্গত মোহনপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী চাঁপানগরী প্রভৃতি মৌজার ইজারাদার ছিলেন। নীলাম্বর রায় অত্যন্ত দয়ালু ও ভক্তিমান্ ব্যক্তি ছিলেন। রায়বংশ চিরকাল অন্নদানে মুক্তহস্ত ছিলেন, নীলাম্বর রায়ের সময় তাহা বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি মহাসমারোহে দুর্গাপূজা সম্পন্ন করিতেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত শিব ও "রায়ের পুষ্করিণী" নামক একটী পুকুর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাঁহার পুত্র মাগারাম রায় ও কৃপারাম রায়।[১] রাধানাথ ও কুচিল চক্রবর্ত্তীর মোকদ্দমার কাগজ হইতে জানা যায় যে, ১১৯১।৯২ সালে মাগারাম চাঁপানগরী প্রভৃতি হুদার এতমামদার ছিলেন। উক্ত দলিল হইতে আরও জানা যায় যে, কৃপারাম রায় ১৭৫২ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন্ সালে মৃত্যু হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। ইনি রাধানাথ চক্রবর্ত্তীর তরফে কার্য্য করিতেন। রায়বংশের বংশধরগণের নিকট হইতে ও জনশ্রুতিমুখে জানা যায় যে, মাগারাম রায় খাজনার টাকা দিতে না পারায় তাঁহাকে বীরভূমপতি মুর্শিদাবাদ-নবাব-দরবারে পাঠাইয়া দেন এবং তথায় তাঁহাকে ঢাকের ভিতর পুরিয়া সেই ঢাক টানিয়া লইয়া যাওয়া

নীলাম্বর রায়

মাগারাম ও কৃপারাম রায়

(১) কৃপারামের বংশধর শিতিকণ্ঠ রায় তাঁহাকে কৃপানাথ রায় বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রাধানাথ ও কুচিল চক্রবর্ত্তীর মধ্যে যে মোকদ্দমা হয় তাহাতে কৃপারাম রায় সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জবানবন্দীতে তিনি কৃপারাম রায় বলিয়া সহী করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার নাম কৃপানাথ নহে।

হয়, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। উক্ত মাগারাম রায়ের সময় হইতে তাঁহাদের অবস্থা হীন হইতে আরম্ভ হয়। কৃপারাম রায় বিশেষ ধার্ম্মিক ছিলেন, পূজা অর্চনায় তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত।

কালীশঙ্কর রায়

মাগারাম রায়ের পুত্র কালীশঙ্কর রায়। রাধানাথ ও কুচিল চক্রবর্ত্তীর মোকদ্দমার দলিল হইতে জানা যায়, কালীশঙ্কর রায় ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তল্লিখিত দলিল হইতে জানা যায় যে, তিনি ১৮১৮ খৃঃ অব্দে জীবিত ছিলেন, ইহা ব্যতীত তাঁহার মৃত্যুকালনির্ণয়ের কোনও উপায় নাই। ১৮০৫ সালে তিনি কুচিল চক্রবর্ত্তীর নিকট কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া রাধানাথ ও কুচিলের মোকদ্দমার কাগজে উল্লেখ আছে।

কালীশঙ্কররায়ের বংশধরগণ

কালীশঙ্করের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশ লোপ পায়। কৃপারাম রায়ের পাঁচ পুত্র,—পুরুষোত্তম, গণেশ, প্রাণকৃষ্ণ, অনন্ত ও ধনকৃষ্ণ। ইঁহাদের মধ্যে পুরুষোত্তম ও গণেশ দুবরাজপুরের মুনসেফীকোর্টে ওকালতি করিতেন। প্রাণকৃষ্ণরায় শ্রীযুক্ত মহারাজ রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের পিতা ৺কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর অধীনে কুণ্ডহিত পরগণার ইজারাদার ছিলেন। তাঁহার কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে ২০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি দান করিয়াছিলেন। অনন্তলাল রায় রাজষ্টেটের খাজাঞ্চিগিরি পদে নিযুক্ত ছিলেন। ধনকৃষ্ণ রায় রাজষ্টেটের অধীনে হেতমপুর, দুবরাজপুর, জালালপুর, মদনপুর ইত্যাদির ইজারাদার ছিলেন। রায়বংশ বরাবরই সুরসিক ছিলেন। তন্মধ্যে ধনকৃষ্ণ রায় এ বিষয়ে অধিকতর পারদর্শী ছিলেন। তিনি বাক্যবিন্যাসের দ্বারা অতি গম্ভীর প্রকৃতির ব্যক্তিকেও হাসাইতে পারিতেন, তাঁহার নিকটে থাকিলে লোকে দুঃখ ভুলিয়া যাইত। তিনি প্রজাগণের নিকট বিনা নালিসে এমন কৌশলে খাজনা আদায় করিতেন যে তাহাতে কেহ অসন্তুষ্ট হইতে পারিত না। তাঁহার সামান্য কবিত্বশক্তিও ছিল। তিনি হাস্যোদ্দীপক ছড়া ও গান রচনা করিতে পারিতেন। গণেশ রায়ের কত সালে মৃত্যু হয় তাহা জানা যায় না। প্রাণকৃষ্ণ রায় ১২৯৮ সালের ৩০শে চৈত্র তারিখে, অনন্ত রায় ১২৮৯ সালে, ও ধনকৃষ্ণ রায় ১২৯৩ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

রায়বংশের বিপদ ও দুরবস্থা

পুরুষোত্তম রায় ও প্রাণকৃষ্ণ অপুত্রক ছিলেন। গণেশরায়ের দুই পুত্র, সারদা ও বরদা। সারদা রায় রাজষ্টেটে খাজাঞ্চি ও বরদা রায় আস্তাবলের দারোগা ছিলেন। সারদা রায় বাক্যবিন্যাসে পটু ও উদারচরিত্র ছিলেন। ইনি ১৩০০ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অনন্ত রায়ের পুত্র রামলাল, এবং ধনকৃষ্ণ রায়ের পুত্র

শিতিকণ্ঠ। সারদা রায়ের প্রথম পুত্র শৈলজাকান্ত রায়ের পচুমা-নিবাসী রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কন্যার সহিত বিবাহ হয়। চক্রবর্ত্তী মহাশয় গাঁড়া পচুমা ইজারা লইলে অনন্তলাল রায় তাঁহার জামিন হন। কিন্তু উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাজার টাকা আত্মসাৎ করায় সমস্ত টাকার জন্য রায়বংশকে দায়ী হইতে হয়। কারণ রায়বংশীয়গণ বরাবরই একান্নবর্ত্তী ছিলেন। ধনকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহারা পৃথক্ হয়েন। এই দেনা পরিশোধ করিতে তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় হইয়া যায়। এক্ষণে রায়বংশ প্রায় লুপ্ত। শিতিকণ্ঠ রায় এবং আর কয়েকটী বালক বংশরক্ষা করিতেছে। শিতিকণ্ঠরায় রাজষ্টেটে কার্য্য করেন।

অধিভুঁই ও তাঁহার বংশ

অধিভুঁই নামক জনৈক তাম্বূলী রায়বংশের অভ্যুত্থানের সময়ে গ্রামের মধ্যে অর্থশালী ব্যক্তি হইয়া উঠেন, কিন্তু তিনি রায়বংশের ন্যায় প্রতিষ্ঠা বা ক্ষমতা লাভ করিতে পারেন নাই। শুনিতে পাওয়া যায় যে তিনি অচ্যুতানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়ের জঙ্গল মহালের সরবরাহকার ছিলেন এবং অনুমান হয় যে তিনি ঐ কার্য্যের দ্বারা কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া উক্ত জঙ্গল-মহালে নিজে ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং এই উপায়ে ক্রমশঃ অর্থবান্ হইয়া উঠেন। শুনা যায় যে তাঁহার অনেক হালের বলদ ছিল। প্রাচীন লোকগণ দেখিয়াছেন যে যখন জঙ্গল-মহাল হইতে তাহারা হেতমপুরে আসিত, তখন সেই সকল বলদের ঘণ্টা অনেক দূর হইতে শুনা যাইত এবং সেই সকল গোরু সমস্ত রাস্তা জুড়িয়া চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিত। তাঁহার পুত্রের নাম ব্রজলালভুঁই, ইহাঁর অবস্থাও পিতার ন্যায় ছিল। ইহাঁর জীবনের শেষ ভাগে জঙ্গল-মহালে সাঁওতালবিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় তিনি ব্যবসায়ে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন এবং সেই অবধি তাঁহাদের উন্নত অবস্থার হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। তৎপুত্র প্রাণকৃষ্ণভুঁইএর পিসা দুবরাজপুরনিবাসী শ্যাম থাগ একবার হিসাব করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায় যে জঙ্গল-মহালে ৪০ হাজার টাকা বাকী পড়িয়াছিল। অধিভুঁইর দুই ভগিনী ছিলেন, জ্যেষ্ঠ কমলা বুড়ি ও কনিষ্ঠ বিনোদিনী। কমলাবুড়ির নাম হইতে বুঝা যায় ও প্রবীন লোকমুখে শুনা যায় যে তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। ১২৩৮ সালে কমলা বুড়ি 'ভুঁই পুষ্করিণী' নামক সরোবর খনন করাইতে আরম্ভ করেন এবং খনন কার্য্যে বিলম্ব হওয়ায় বিপ্রচরণ[১] বাবু বলিয়াছিলেন যদি তিনি পুষ্করিণী খনন করাইতে অপারক হন তাহা হইলে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে, তিনি ঐ পুষ্করিণী

অধিভুঁইএর ভগিনীদ্বয়

(১) শ্রীযুক্ত মহারাজ রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের পিতামহ।

খনন করাইয়া দেন। তদুত্তরে কমলাবুড়ি জানাইয়াছিলেন, "কিছু না থাকিলেও এখনো এত সিকি দুয়ানী আছে যে, তাহার দ্বারা তাঁহাকে ডুবাইয়া দিতে পারি"। প্রাণকৃষ্ণ ভূঁইএর তিন পুত্র রাখাল, অভয় ও কালি। তাহারা চাল' কলাইয়ের সামান্য দোকান করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছে।

রায়বংশের অধঃস্তন পুরুষগণ ক্রমশঃ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে রাধানাথ চক্রবর্ত্তী নামক অপর এক ব্রাহ্মণসন্তান স্বীয় অদম্য অধ্যবসায়গুণে প্রভূত সম্পত্তিশালী হইয়া উঠেন। পিতৃ-পিতামহগণের গৌরবস্মৃতি হৃদয়বান্ মানবকে কিরূপ উন্নত করিয়া তোলে, রাধানাথ চক্রবর্ত্তী তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। "ভূস্বামি" হইবার উচ্চ আশা তাঁহার হৃদয়ে এত বলবতী ছিল যে, তিনি ঋণ করিয়াও জমিদারী খরিদ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। প্রকৃতপক্ষে রাধানাথ চক্রবর্ত্তীই হেতমপুর-রাজবংশের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। অতঃপর রাজবংশ-বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

হেতমপুর-রাজবংশ অতি প্রাচীন। বহু খ্যাতনামা পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া এই বংশকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। কুলপঞ্জিকায় দেখিতে পাই—এই বংশে "রুদ্র" রাজোপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।(১) রুদ্রস্তু পৃথিবীপালো রাজলোঁকহিতে রতঃ"। "মধুসূদন হাজরার(২) বিশেষণে কুলপঞ্জিকায় লিখিত হইয়াছে—"রাঢ়ে রসবতী ধন্যা যত্রাস্তে মধুসূদনঃ" "শ্রোত্রিয়ানাং মধুশ্রেষ্ঠো ঋষীনাং হি যথা ভৃগু, কুলকার্য্যে তথা দক্ষো যথা দক্ষঃ প্রজাপতি"॥ ইত্যাদি।(৩) ইহাঁরা বাৎস্যগোত্রীয় রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। শুদ্ধশ্রোত্রিয় শিমলাল গাঞী কর্ণবালের সন্তান বলিয়া পরিচিত। ক্রিয়াকাণ্ড যজুর্ব্বেদমতে নির্ব্বাহিত করিয়া থাকেন। কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ে আগত ক্ষিতীশাদি পঞ্চবিপ্রের অন্যতমের বংশধর "ছান্দড়" হইতে অধঃস্তন ১৬শ পুরুষ "কমলাকর" (কোনো অজ্ঞাত কারণে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া) বাণকুণ্ডা বা বাঁকুড়ায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।(৪) কিন্তু বাকুড়ার বাস স্থায়ী হয় নাই। তৎপুত্র মুরলীধর তস্করের উপদ্রবে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ১০৫৭ সালে জীবিকান্বেষণে বীরভূমে আগমন-পূর্ব্বক তদানীন্তন বীরভূমেশ্বর বাহাদুর খাঁর দরবারে কর্ম্মগ্রহণ করেন। বাহাদুর খাঁ অনুগ্রহ করিয়া রাজধানী "নগরেই" তাঁহার অবস্থিতির বন্দোবস্ত করিয়া দেন। শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন, সংসারে সহায়স্বজনশূন্য মুরলীধরের একমাত্র অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদের কুলদেবতা শালগ্রামশিলা "দধিবামন"।

(১) সম্বন্ধ-নির্ণয়, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি।

(২) কুলপঞ্জিকায় হাজরা শব্দের অর্থে অন্যত্র লিখিত হইয়াছে—"হাজরেতি সমাখ্যাতো সৈনাপত্যে ক্ষিতিভূজাং"।

(৩) বংশতালিকায় (১) (২) চিহ্নিত নামগুলি দ্রষ্টব্য।

(৪) কুলপঞ্জিকায় বাণকুণ্ডা বা বাঁকুড়ার উল্লেখ পাওয়া যায় না। পঞ্জিকাকারগণ "বৈদেশী কমলাকরঃ" মাত্র লিখিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন।

তাঁহার অবসর সময় এই দধিবামনের সেবা-পরিচর্য্যাতেই অতিবাহিত হইত। বৃদ্ধবয়সে তিনি দুইটী পুত্র লাভ করেন। জ্যেষ্ঠ চৈতন্যচরণ (জন্ম ১১০৬ সালে) কনিষ্ঠ প্রসাদ (জন্ম ১১১০ সালে) এই দুই (শিশু) পুত্রকে বর্ত্তমান রাখিয়া মুরলীধর প্রায় অশীতি বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। চৈতন্যচরণের কণ্ঠস্বর বড় মধুর ছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, অতি অল্পবয়সেই তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া রাজদরবারে উচ্চপদস্থ মুসলমান-রাজকর্ম্মচারীগণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। হাফেজ খাঁ (ইহার বিবরণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে) তখন হেতমপুরের শাসনকর্ত্তা। সঙ্গীতানুরাগী হাফেজের অনুরোধেই চৈতন্যচরণ কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসাদের সহিত হেতমপুরে আসিয়া বাস করেন।

যতদিন হাফেজ খাঁ জীবিত ছিলেন, ততদিন চৈতন্যচরণের কোনো কষ্ট ছিল না। কিন্তু হাফেজের মৃত্যুর পর চৈতন্যচরণের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পোষ্যসংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। তিনি ক্রমে চারিটী পুত্র ও দুইটী কন্যার জনক হইলেন।

চৈতন্যচরণ বড় আমোদপ্রিয় ছিলেন। দিবানিশি তিনি সঙ্গীতরসেই ভোর হইয়া থাকিতেন। সুতরাং দারিদ্র্যের পীড়ন তাঁহাকে তেমন উত্যক্ত করিতে পারিত না। কিন্তু বৃদ্ধবয়সে জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রজমোহনের অকাল-মৃত্যুজনিত শোক তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। ব্রজমোহনের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই চৈতন্যচরণ মানবলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে ছিল, কুলদেবতা দধিবামন, একখানি সামান্য বসতবাটী; একটী পুষ্করিণী ও একটী বৃক্ষ।

চৈতন্যচরণের পুত্রগণ—জ্যেষ্ঠ ব্রজমোহন বাল্যকালেই কালগ্রাসে পতিত হন। দ্বিতীয় রাধানাথ (জন্ম ১১৬৮ সালে), তৃতীয় কুচিল (জন্ম ১১৭১ সালে) চতুর্থ সনাতন চৈতন্যচরণের মৃত্যুর পর ভূমিষ্ঠ হন (১১৮১ সালে)। কন্যা ১মা সাধেশ্বরী, দমদমানিবাসী বলরাম বিশ্বাসের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।(১) বিশ্বাস মহাশয়ের পূর্ব্ব উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি রাজনগর-রাজের অধীনে খাজাঞ্চীর কার্য্য করিয়া বিশ্বস্ততার পুরস্কারস্বরূপ 'বিশ্বাস' উপাধি প্রাপ্ত হন। ২য়া প্রসাদমণি, বালিজুড়ি (বীরভূম) নিবাসী দর্পনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। উত্তরকালে রাধানাথ চক্রবর্ত্তী সম্পত্তিশালী হইয়া ভগিনীপতিদ্বয়কে হেতমপুরে আনিয়া বাস করান। বলরাম বিশ্বাসের বংশধর জয়কৃষ্ণ বিশ্বাস এবং দর্পনারায়ণের বংশধর রাধাশ্যাম মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

অগ্রজের মৃত্যুর পর বিধবা ভ্রাতৃজায়া এবং পিতৃহীন শিশুসন্তানগণের ভরণ-পোষণের ভার প্রসাদ চক্রবর্ত্তীই গ্রহণ করেন। তিনি হেতমপুরের নিকটবর্ত্তী

(১) "দমদমা" কোথায়? বিশ্বাসবংশধরগণ তাহা বলিতে পারেন না।

(চাঁপানগরী গ্রামে) একটী পাঠশালায় "শিক্ষকতা" এবং কয়েকটী মৌজার "গোমস্তাগিরি" করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। প্রসাদের একটী পুত্র ছিল, নাম নফরচন্দ্র। দরিদ্রের বংশবৃদ্ধি বিড়ম্বনা মাত্র। আপনার সামান্য আয়ে সংসার প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া প্রসাদ ভ্রাতৃজায়া ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে পৃথক্ করিয়া দিলেন। চৈতন্য-পত্নীর কষ্টের অবধি রহিল না। দারিদ্র্যের প্রবল পেষণে দারুণ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়া শারিরীক পরিশ্রমে তিনি সামান্য যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারা অতিকষ্টে কোনোরূপে সংসার প্রতিপালিত হইত মাত্র। এই সময় বালক রাধানাথ খুল্লতাতের পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতেন। আপনাদের অবস্থা বুঝিয়া অধ্যয়ন পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রসাদের নিকট হইতে তিনি "শালকহুদা" এৎমাম্ লইয়া সংসার প্রতিপালনে জননীর সহায় হইলেন। এই কার্য্যে তিনি যৎসামান্যই উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। কিন্তু জননীর নিকট আপনাদের বংশের অতীত গৌরব-কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনে "জমিদার" হইবার দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা এতই প্রবল হইয়া উঠে যে, অল্পদিন পরেই তিনি স্বাধীনভাবে কতকগুলি মৌজা ইজারা গ্রহণ করিয়া দুগ্ধের পিপাসা আপাততঃ ঘোলে নিবৃত্ত করিতে বাধ্য হন। বস্তুতঃ এই বংশগৌরব-স্মৃতিই তাঁহার সকল সৌভাগ্যের মূল।

চৈতন্য-পত্নীকে আর অধিক দিন কষ্টভোগ করিতে হইল না। মরণের চির শীতল কোলে আশ্রয় লইয়া তিনি সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। (১১৮২ সালের শেষভাগে) মাতার অন্তিম অনুরোধক্রমে রাধানাথ অনুজ কুচিলের সহিত তাঁহাকে গঙ্গাতীরে প্রেরণ করেন। তথায় সজ্ঞানে তাঁহার 'গঙ্গালাভ' হয়। এক্ষণে পরিবার পোষণের সমস্ত ভার রাধানাথের স্কন্ধে পতিত হইল। হেতমপুরের রায়পরিবারের অবস্থা তখন ভাল ছিল। তাঁহারা রাজনগরের রাজার অধীনে অনেক "মহালমজকুরের" ইজারাদার ও গোমস্তা ছিলেন। বালক রাধানাথ ১১৮৪ সালে নীলাম্বর রায়ের তরফ হেতমপুরান্তর্গত চক মোহনপুরে পুণ্যাহ করেন। ১১৮৫।৮৬ সালে তিনি মাগারাম রায়ের তরফ গোমস্তা ছিলেন। ১১৮৭ সাল হইতে ১২০৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি বহু মৌজা ইজারা গ্রহণ করেন।(১) বালক রাধানাথকে এই

(১) রাধানাথ যে সকল মৌজা ইজারা গ্রহণ করেন—

১১৮৭ সালে—হুদা খাঁড়গা (পার্ব্বতীপুর নিবাসী পঞ্চানন মল্লিকের সহিত)

১১৮৮ সালে—দেবীপুর ও রসিদপুর।

১১৮৯ সালে—হুদা-গোপালপুর (পঞ্চানন মল্লিকের সহিত)

১১৯০ সালে—তপ্পে নলী (পঞ্চানন মল্লিক, প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও খোষাল ঘোষের সহিত, ইজারা বণ্টন করিয়া লইলে মহম্মদবাজার দিঃ রাধানাথের অংশে পড়িয়াছিল)

১১৯১ সালে—ভুরকুনা। ১১৯২ সালে—হুদারসিদপুর। ১১৯৩ সালে—তালুক হুকমা

১১৯৪ সালে—দড়ি মৌড়েশ্বর। ১১৯৫ সালে—তালুক মল্লার (পঞ্চাননের সহিত)

দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যগ্রহণে অনেকেই নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সংসারে বড় হইব এই আশা হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া তিনি কাহারো কথায় কর্ণপাত করেন নাই। রাজনগররাজকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াও তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। কোনো বাধাবিপত্তিই তাহাকে গন্তব্যপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে নাই। মধ্যে ১১৯৬ সালে তিনি আলিনগর পরগণা তহশিল করিয়াছিলেন এবং ১১৯৭ সালে সুলতানপুরের ক্রোক সাজোয়াল ছিলেন।

এইরূপে ইজারা ও গোমস্তাগিরি করিয়া নিঃস্ব রাধানাথ অর্থসঞ্চয়পূর্ব্বক নিজে বিবাহ করেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপনয়ন ও বিবাহ দেন।(১) উভয় ভ্রাতার মোকদ্দমার সাক্ষীর জবানবন্দিতে দেখা যায় যে, ১২০৪ সাল পর্য্যন্ত তাহাদের ৩৩০০৲ টাকা সঞ্চিত ছিল। এই সময় রাধানাথ দুবরাজপুরনিবাসী গোলকসিংহের নিকট ১০০০৲ টাকা, বৃন্দাবন পোদ্দারের নিকট ১৫০৲ টাকা, দামোদর দত্তের নিকট ২৫০৲ টাকা, গোলোক ঠাকুরের নিকট ১০০৲ টাকা, ও উৎসবমণ্ডলের নিকট ৫০৲ টাকা কর্জ্জ করিয়া (১২০৫ সালে) ধন্না, জুনিদপুর ও হালসিনগর এই তিন লাট নীলামে খরিদ করেন। খুল্লতাত প্রসাদচক্রবর্ত্তীকে তিনি ১২০০ সাল হইতে আপনার নায়েব নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর লাট রূপুসপুর, জাহিদপুর ও নিজে এবং (১২০৭ সালে) গোপালনগর, বড়রা ও কুণ্ডহিত এই লাটত্রয়ের অংশ ও লাট ময়নাবুনি খরিদ করেন। ঋণভার বৃদ্ধি হওয়ায় ১২০৭ সালে লাট ধন্না ও জাহিদপুর বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় ঋণ পরিশোধপূর্ব্বক উদ্বৃত্ত টাকায় তিনি অন্য লাট খরিদ করিয়াছিলেন।

এই সকল মহাল পূর্ব্বে রাজনগরাধিপের ছিল। তাঁহাদের অবস্থা ক্রমশঃ হীন হইতে আরম্ভ হইলে (বাহাদুর জমাল খাঁর সময়ে) কালেক্টরীর খাজনা দিতে না পারায় পূর্ব্বোক্ত মহাল এবং আরো অনেক মহাল নীলামে বিক্রয় হইয়া যায়। এই সমস্ত মহাল প্রথমে কেহ খরিদ করিতে সাহসী হন নাই। রাধানাথ এই কার্য্যের পথপ্রদর্শক হইলে রাজনগরপতি কুপিত হইয়া রাধানাথকে বন্দী করিবার হুকুম দেন। রাধানাথ-পত্নী দাসুমণি তখন পূর্ণগর্ভা। এই সংবাদে ভীত হইয়া রাধানাথ গৃহ পরিত্যাগে বাধ্য হইলেন এবং পত্নীসহ নানাস্থানে লুক্কায়িত হইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপ দুঃসময়ে ১১৯১ সালে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিপ্রচরণের জন্ম হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, হেতমপুরের "বামনে" নামক এক ক্ষুদ্র সরসীতটে পত্নীসহ রাধানাথ রাত্রিযাপন করিতেছিলেন। সেই সময় বিপ্রচরণ ভূমিষ্ঠ হন। সূর্য্যোদয় হইলে দেখা গেল, এক বিষধর সর্পফণা বিস্তার করিয়া শিশুর বদনমণ্ডল ছায়াবৃত করিয়াছে।

কালে নগরাধিপের কোপ প্রশমিত হয়, এবং বিপ্রচরণের

১২০০ সালে—তপে খয়ি ও বড়রা (শ্রীকণ্ঠ বিশ্বাসের বেনামি)

১২০১ সালে—তপে খয়ি ও বড়রা (স্বনামে)

১২০২ সালে—পরগণে সাহালামপুর বড়রা; ১২০৩-৫ সালে—খয়ি ও বড়রা

(১) কুচিলের

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাধানাথের বিষয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। গোমস্তাগিরি ও ইজারাদারী কার্য্য গ্রহণের সময় হইতে রাধানাথের সাংসারিক অবস্থার উন্নতি আরম্ভ হয়। তিনি বীরভূম জেলার অন্তর্গত পেরুয়াগ্রামনিবাসী নিকুঞ্জনাথ চক্রবর্ত্তীর কন্যা দাসুমণি দেবীর পাণিগ্রহণ করেন এবং কুচিলের কানাইপুরের আচার্য্যগৃহে বিবাহ দেন।

১২১০ সালে রাধানাথ রাধাবল্লভজীউর সেবা প্রকাশ করিলেন, তদবধি এই ব্রাহ্মণপল্লীর নাম রাধাবল্লভপুর হইয়াছে। রাধাবল্লভমন্দিরে প্রত্যহ নিয়মিতরূপে এক আনা দক্ষিণাসহ ৯ জন করিয়া ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা এবং তদ্ব্যতীত আগন্তুক অতিথি অভ্যাগতের জন্য প্রসাদদানের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অদ্যাবধি সেই নিয়ম বর্ত্তমান আছে। রাধানাথপত্নী দাসুমণি একটি মনসাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবী পূর্ব্বে হেতমপুরের অদূরস্থিত কেন্দুলাগ্রামে ছিলেন। পরে রাধানাথপত্নীকে স্বপ্নযোগে আদেশ করেন যে তাঁহাকে হেতমপুরে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করা হউক। তদনুসারে রাধানাথজায়া দেবীকে হেতমপুরে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তাঁহারই অভিজ্ঞানস্বরূপ মাঝে মাঝে তাঁহার ভর হইত। এই দেবী কেন্দুলায় পূর্ব্বে যে মন্দিরে থাকিতেন এখনও সেখানে দেবীমূর্ত্তি না থাকিলেও বারিপূজা হইয়া থাকে।

৺রাধাবল্লভ জীউর সেবাপ্রকাশ

যে বৎসর ৺ রাধাবল্লভ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইল, সেই বৎসরেই তাঁহাদের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইল। কুচিল চক্রবর্ত্তী ১২১০ সালের ১০ই আশ্বিন তারিখে একান্নবর্ত্তিতা পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথক্ হইলেন। তৎপরে বীরভূম দেওয়ানী আদালতে কুচিল চক্রবর্ত্তী সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ প্রাপ্তির জন্য ১২১১ সালে ১৬ই আষাঢ় তারিখে ৭৮৩৩৮২ টাকার দাবীতে নালিশ করিলেন। তাহাতে রাধানাথ এরূপ মর্ম্মে জবাব দেন যে এই সম্পত্তি তাঁহার স্বোপার্জ্জিত, তাহাতে কুচিলের কোন স্বত্ব নাই। যাহা হউক নানারূপ বিচার ও আপিলের পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রকম ॥৶০ আনা ও কনিষ্ঠভ্রাতার ।৴০ আনা অংশ সাব্যস্ত হয়।

এইরূপ এই বংশে এগারআনী বা বড় তরফ ও পাঁচআনী বা ছোট তরফ এই দুই শাখার উৎপত্তি হইল। এই এগারআনী বড় তরফ হইতে বর্ত্তমান রাজবংশের উৎপত্তি। আমরা প্রথমে এই বংশের বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইব।

হেতমপুর-রাজবংশের বড় তরফ ও ছোট তরফ

রাধানাথের সম্পত্তি খরিদ

বঙ্গীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজনগরের অধিপতিগণ নানাকারণে ঋণজালে জড়িত হওয়ায়, তাঁহাদের বহুমূল্য সম্পত্তিসমূহ অল্পমূল্যে বিক্রীত হইয়া যায়। রাধানাথ সেই সম্পত্তির অনেক অংশ ক্রয় করেন। তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কিছুদিন ক্রোক আমিনের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১২১৬ সালের ২৫শে অগ্রহায়ণ তারিখে তিনি রাজনগর-রাজবাটীতে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে গিয়া গৃহপ্রবেশের চেষ্টা করেন। কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান প্রহরীগণ তাহাতে বাধা দেয়। তিনি ব্যর্থমনোরথ হইয়া মুর্শিদাবাদের কালেক্টর সাহেবের নিকট ১২১৬ সালের ১৩ই পৌষ তারিখে উক্ত ঘটনা রিপোর্ট করিয়া পুলীশ প্রহরীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাধানাথ কতদিন ক্রোক আমিনের কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না; তবে শুনিতে পাওয়া যায় যে তিনি অল্পকাল মধ্যে সম্পত্তিশালী হইয়া চাকুরী পরিত্যাগ করেন। ১২৮৭ সালে তিনি যশপুরের তালুকদার সেখ রেজারবক্সের নিকট চক্ মোহনপুর খরিদ করেন। মোহনপুরে তিনি একটি বাঁধ খনন করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

রাধানাথের বংশ

রাধানাথের দুইপুত্র ও চারিকন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম বিপ্রচরণ ও গঙ্গানারায়ণ; কন্যাগণের নাম রুক্মিণী, রামমণি, কৃষ্ণমণি ও শ্যামমণি। বিপ্রচরণ ১১৯৩ সালে ও গঙ্গানারায়ণ ১২০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

১২৪০ সালে গঙ্গানারায়ণ দুর্গোৎসব এবং বিপ্রচরণ সরস্বতীপূজা প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু সেই বৎসর চৈত্রমাসে গঙ্গানারায়ণের মৃত্যু হয়। পরবৎসর রাধানাথ আর গৃহে দুর্গাপূজা করিতে পারিলেন না। হেতমপুর-নিবাসী গয়ারাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের উপর দুর্গোৎসবের ভারার্পণ করিলেন। অদ্যাবধি তাঁহার বংশধরগণ সেই পূজা করিয়া থাকেন। পূজার ব্যয় রাজষ্টেট্ হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

বীরভূমজেলার অন্তর্গত কালদীঘী গ্রামের মজুমদারবংশে গঙ্গানারায়ণ বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন সন্তানাদি জন্মে নাই। গঙ্গা-নারায়ণ অতিশয় সাহসী ও অশ্বারোহণে বিশেষ পটু ছিলেন। আমোদ প্রমোদেই তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। শুনা যায়, একদা তিনি কোন কার্য্যবশতঃ অশ্বারোহণে সিহুড়ী গিয়াছিলেন, বাটী প্রত্যাগমনের সময় বক্রেশ্বর নামক নদীগর্ভে সহসা আতঙ্কজনক কোনও

দৃশ্য দেখেন এবং বাটী পঁহুছিয়াই জ্বরাক্রান্ত হন। সেই জ্বরেই তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইয়াছিল।

রুক্মিণী দেবী ১২০৫ সালের ৯ই শ্রাবণ জন্মগ্রহণ করেন। বীরভূম জেলার অন্তর্গত সাজিনাগ্রামনিবাসী কুলীনশ্রেষ্ঠ দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। দ্বারকানাথ পরে বিপ্রচরণের বিশেষ যত্নে দুবরাজপুর আদালতের মুন্সেফের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার লোকান্তরগমনের পর রুক্মিণীদেবী দীর্ঘকাল জীবিতা ছিলেন। তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রতানুষ্ঠান, তীর্থপর্য্যটন, ব্রাহ্মণভোজন প্রভৃতি সৎকর্ম্মে বৈধব্য-জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১২৮৮ সালের ৪ঠা ভাদ্র তারিখে রুক্মিণী দেবীর মৃত্যু হয়।

১২১৮ সালে রামমণির জন্ম হয়। বালীজুড়ীগ্রামনিবাসী শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পর অবধি তাঁহাদের বাস হেতমপুরেই স্থানান্তরিত হয়। ১২৬৩ সালে রামমণি পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্যাপি জীবিত আছেন।

কৃষ্ণমণি ১২২২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শান্তিপুরনিবাসী কুলীনপ্রবর জজ-পণ্ডিত (১) পীতাম্বর ভট্টাচার্য্যের পুত্র আনন্দমোহন ভট্টাচার্য্যের সহিত কৃষ্ণমণির বিবাহ হয়। বিবাহের পর তাঁহারা হেতমপুরে আনীত হইয়াছিলেন। আনন্দমোহন স্ত্রী ও পুত্র রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন তারিখে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। কৃষ্ণমণি ১২৬০ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্র প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। এই প্রতাপচন্দ্রের দুই পুত্র, সুরতচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন। ইঁহারা অদ্যাবধি জীবিত আছেন।

রাধানাথের অপর কন্যা শ্যামমণির শৈশবে অবিবাহিতাবস্থায় মৃত্যু হয়। তাঁহার জন্মমৃত্যুর তারিখ পাওয়া যায় না।

১২৪০ সালে গঙ্গানারায়ণের মৃত্যু হইলে বৃদ্ধ রাধানাথ পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইলেন এবং বৈষয়িক ব্যাপারে বীতস্পৃহ হইয়া উপযুক্ত পুত্র বিপ্রচরণের উপর সমুদয় সংসারের ভার অর্পণপূর্ব্বক ধর্ম্মালোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। ১২৪২ সালে কর্ম্মবীর রাধানাথ বিংশতিসহস্রাধিক মুদ্রা আয়ের

(১) পূর্ব্বে প্রত্যেক জজের নিকট একজন করিয়া পণ্ডিত নিযুক্ত থাকিতেন; তাঁহারা বিভাগবণ্টনাদি মোকর্দ্দমায় হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থা প্রদান করিতেন। তাঁহারা জজ-পণ্ডিত নামে অভিহিত হইতেন। পীতাম্বর ঐরূপ একজন জজ-পণ্ডিত ছিলেন।

সম্পত্তি রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি অনেক জলাশয় খনন করাইয়া যান। হেতমপুরের পশ্চিম প্রান্তে "বাঁধাপুকুর" নামক জলাশয় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এবং দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত রূপুসপুর মধ্যে "রাধাই চক্রবর্ত্তীর বাঁধ" তিনিই খনন করাইয়াছিলেন। লক্ষ হরিনাম-জপ ও শাস্ত্রালোচনা রাধানাথের দৈনন্দিন কর্ম্ম ছিল। হরিনামসংকীর্ত্তনে তিনি বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেন এবং নিজে অনেক কীর্ত্তনের গান রচনা করেন। তাঁহার রচিত প্রার্থনা নামক একটী গান এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল –

প্রার্থনা

"এস রাধানাথ, হৃদিপদ্ম কাননে
অনেকদিনের সাধ আছে হেরব নয়নে।
পরি'এস পীতধড়া মস্তকেতে মোহনচূড়া

ললিত ত্রিভঙ্গ ঠামে কিশোরী বামে
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর নটবর—
মনোহর—
তুলসীমঞ্জরী দিব যুগলচরণে ॥"

পঞ্চম অধ্যায়

রাধানাথের পরলোকগমনের পর তদীয় পুত্র বিপ্রচরণ সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইলেন। পিতার মৃত্যুর সময় পুত্রের বয়ঃক্রম ঊনপঞ্চাশ বৎসর হইয়াছিল। রাধানাথের পুত্র বিপ্রচরণ

রাধানাথের মৃত্যুর পর শত্রুগণ নানারূপ ষড়যন্ত্র ও মামলা মোকদ্দমার দ্বারা তাঁহাকে বিব্রত করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তিনি অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলে বিপক্ষগণের কুটিল কৌশলজাল ছিন্ন করেন। তাঁহার গুণগ্রামে সকলেই তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। বীরভূমের তদানীন্তন জজ ডানবার সাহেব বিপ্রচরণকে এত ভালবাসিতেন যে, তিনি বিদায়কালে ১৮১৯ খৃঃ অব্দের ৫ই জুন তারিখে তাঁহাকে সিহুড়ীর "বড়বাগান" নামক উদ্যান ও "লালকুঠী" নামক বাটী উপহার দিয়া যান। বিপ্রচরণের কার্য্যকৌশলে মুগ্ধ হইয়া রাজনগরাধিপতি দাওরজ্জমানখাঁ তাঁহাকে স্বীয় রাজষ্টেটের দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। বিপ্রচরণ ১২৪৪ সাল হইতে ১২৪৯ সাল পর্য্যন্ত অতীব প্রশংসার সহিত উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। রাজা দাওরজ্জমানখাঁ তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বংশগত "হুজুর" উপাধি প্রদান করেন।

সাঁওতালপরগণার অন্তর্গত বাগডহরী গ্রামনিবাসী শ্রীনাথ চৌধুরীর ভগিনীর সহিত বিপ্রচরণের বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের দুই বৎসর পরে অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার পত্নী-বিয়োগ ঘটিলে তিনি পুনরায় বীরভূম জেলার অন্তর্গত বেলেরা গ্রামের বক্‌সীবংশোদ্ভবা মন্দাকিনীদেবার পাণিগ্রহণ করেন।

বিপ্রচরণের তিন পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রগণের নাম প্রমথনাথ, আশুতোষ ও কৃষ্ণচন্দ্র এবং কন্যাদ্বয়ের নাম দোলগোবিন্দমণি ও কৃষ্ণবিনোদিনী। ১২৩০ সালে প্রমথনাথ, ১২৩২ সালে আশুতোষ এবং ১২৩৩ সালে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয়। বিপ্রচরণের বংশ

প্রমথনাথ একাদশবর্ষ বয়সে "ডিপ্‌থিরিয়া" রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কাল-কবলিত হন (১২৪০ সাল)। ইহার একবৎসর পরেই নবমবর্ষীয় বালক আশুতোষ ১২৪১ সালে কালগ্রাসে পতিত হন। জনকজননীর শোকের উপর শোক, ব্যথার উপর ব্যথা, তাঁহাদের মনঃপীড়ার আর সীমা থাকিল না।

এক্ষণে কৃষ্ণচন্দ্র একমাত্র বংশধর রহিলেন। একবিংশতিবর্ষে পদার্পণ করিলে

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সর্পীগ্রামে কৈলাসচন্দ্র রায় চৌধুরীর (১) জ্যেষ্ঠা কন্যা শিবসুন্দরীর সহিত ১২৫৪ সালের মাঘ মাসে কৃষ্ণচন্দ্রের বিবাহ হয়।

বিপ্রচরণ দুহিতৃদ্বয়কেও যথাকালে সৎপাত্রে সম্প্রদান করেন। বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতী ময়নাপুরনিবাসী খ্যাতনামা দেওয়ান কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রদ্বয় কুলদানন্দ ও তারকানন্দ তাঁহার জামাতা ছিলেন। জামাতৃগণ হেতমপুরে বসবাস না করিলেও তাঁহারা অধিকাংশ সময় হেতমপুরে থাকিতেন। বিপ্রচরণ তাঁহাদিগকে ভূসম্পত্তি ও বৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে কুলদানন্দ বাবু মুন্সেফী পদ প্রাপ্ত হইয়া পরে সদরআলা (Sub-Judge) হইয়াছিলেন। তারকানন্দও বিপ্রচরণের সুপারিশে পুলিস বিভাগে ইন্স্পেক্টর হয়েন। কুলদানন্দ বাবুর বর্ত্তমান বংশধরের নাম পারদাকিঙ্কর ও জ্ঞানদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়। এক্ষণে তাঁহারা সিউড়ী-নগরীতে বিপ্রচরণ-প্রদত্ত সুরম্য অট্টালিকায় বাস করিতেছেন ও তৎপ্রদত্ত সম্পত্তিসমূহ উপভোগ করিতেছেন।

বিপ্রচরণ নগররাজবংশসম্ভূতা বিবি রজবন্নেসাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করিয়া ১২৫৪ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কেন্দুলীনিবাসী মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের বিনামে আরও ৩৫ হাজার টাকা পণ দিয়া মহম্মদাবাদ খরিদ করেন। তৎপরে সাহালামপুরের কতক অংশ জমিদারীসত্বও তাঁহার হস্তগত হয়।

সন ১২৫৮ সালে বিপ্রচরণ পক্ষাঘাতরোগাক্রান্ত হইলেন। পিতৃ-আদেশে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে "জ্ঞানগঙ্গার" নিমিত্ত কাঁটোয়ায় লইয়া গেলেন, কিন্তু তিনি তথায় সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া হেতমপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কাঁটোয়ায় অবস্থানকালে বিশেষ কষ্ট হওয়ায় বিপ্রচরণ তথায় একটী বাটী নিম্মাণের সঙ্কল্প করেন। তদনুসারে ১২৬০ সালের ১২ই অগ্রহায়ণ তারিখে কাঁটোয়ায় একটী দ্বিতল অট্টালিকার নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হয়।

সাঁওতাল-বিদ্রোহ

সকলেই অবগত আছেন, ১২৬২ সালের শ্রাবণ মাসে সাঁওতাল পরগণায় ভয়ঙ্কর সাঁওতালবিদ্রোহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।(২) তত্রত্য বাঙ্গালী মহাজনগণ

(১) এই ব্যক্তি স্বনামধন্য রাজা অর্জ্জুন রায়ের বংশধর। কৈলাসচন্দ্রের জগবন্ধু রায় চৌধুরী নামে একপুত্র বর্ত্তমান। মহারাজ রামরঞ্জন তাঁহাকে হেতমপুর গ্রামে আনিয়া বাস করাইয়াছেন। জগবন্ধু অতি সজ্জন, পরোপকারী এবং অমায়িক ব্যক্তি।

(২) সাঁওতাল-বিদ্রোহ সম্বন্ধে একটী গ্রাম্য-কবিতা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে ঐ বিদ্রোহ সম্বন্ধে অনেক বিবরণ পাওয়া যায় বলিয়া তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

নানারূপ প্রবঞ্চনা প্রতারণা করিয়া নিরীহ সরল সাঁওতালজাতির যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহাদিগকে ক্রীতদাসের ন্যায় আবদ্ধ করিয়া বিশেষ উৎপীড়ন

শুন ভাই, বলি তায়, সভ্য জনের কাছে। শুভ বাবুর হুকুম পেয়ে সাঁওতাল ঝুঁকেছে॥
বেটারা কুক ছাড়িল, জড় হল, হাজারে হাজার। কখন এসে কখন লুটে থাকা হল ভার॥
হইল সব দুর্ভাবনা, রাঁড় কান্দনা, সবাই ভাবে বসে। ঘড়া ঘটী মাটিতে পুঁতে কখন লিবে এসে॥
বলে সব রাখ্‌বো কোথা, যেথা সেথা, এই কথা শুনে। রাখিতে মুলুক সোনা ভাবিছে কোম্পানি॥
বেটাদের শক্তি শুনে, প্রজাগণে, কহিছে ধীরে ধীরে। জিনিষ ছেড়ে পালাই নাথ সবাই থাক ঘরে॥
আমাদের আসিছে গোরা, সাঙ্গিন চড়া, জামা জোড়া গায়। বন্দুকেতে গুলিপুরা তুরুক-সয়ার তায়॥
বেটারা থাকে কোথা, সত্য কথা, শুধাই তোমারে। কেহ বলে দেখে এলাম মৌরক্ষি ধারে॥
আছে সব জড় হয়ে, পুর্ব্ব মুয়ে (খে), তীর মারিছে গাছে। কতশত কর্ম্মকার সঙ্গেতে এনেছে॥
তীরের ফলা বুনাইতে, বরাত মতে, যখন যেমন কয়। হাতে হাতে যোগায় ফলি পাছে টানা হয়॥
বেটাদের পোষাক চড়া, কপ্নি পড়া, পৈতে বেড়া বুকে। ভাঁড়ের উপর পূজা করে কুক ছাড়িছে মুখে॥
আগেতে নাগরা পিটে, কাটে ছিটে, মদে মাসে ভরা। প্রথমে বাঁশবুলি দিয়ে পল্ল গাছে ডেরা॥
দেখে সব লোক পলাইছে, টুকা পেছে, ল'য়ে লটাই থান। কেহ বলে রাখা রহল বড় মাছের থান॥
বলে ভাই পালা পালা, একি জ্বালা, করে কলরব। বেচারামকে কেটে বেটাদের রক্তমুখ সব॥
আর কি হাকিম মানে, বনে বনে, রাস্তা পেয়ে সুজা। সাদিপুরে লুটে গিয়ে কাপড়ের বোঝা॥
যথা উচিত বুচ্‌কা বেন্দে, নিল কান্দে, যত মনে ছিল। রাতারাতি হাতাহাতি বাপিষ্টেকে গেল॥
সকলই এমনি ধারা, দেয় নাগড়া, অহর্নিশি পিটে। খাবার বেলায় সাঁওতালদের মেয়েছেলে জুটে॥
বলে ভাই রাজা হব, টাকা পাব, করিয়ে মন্ত্রণা। দুইদিন বাদে পুড়াইল লাঙ্গুলের থানা॥
ঐ কথা শুনে, সিপাইগণে, বন্দুক নিল হাতে। দরগা মর্শার সঙ্গে দেখা হইল পথে॥
মনেতে ভয় পেয়ে, পশ্চিম মুয়ে, অমান গেল ফিরে। পোরের পুরে মকাম কৈল গয়ারামের ঘরে॥
যত সব চেলের গুলা, ভাঙ্গিল তালা, সকল বা'র করিল। মরা পেটে চড়া দিয়ে খিটন কারল॥
তখন সিপাই ঘেরা, সঙ্গীন চড়া, কাপ্তান সহিত। নদীর উপান্তে আসি হইল উপনীত॥
যত সব সিপাইগণে, ভাবে মনে, হয়ে সার্ সার্। দেখে শুনে মোরাক্ষির উপর না হয় পার॥
তীর বাঁশ তৈয়ার আছে, আগন সাজে, রণ নাইখ বাজে।
নদীর ধারে সাঁওতালরা নাগরা বাজায় নাচে॥
সেখানে সাধ্যকার, পারাপার, দুকুল বহে বান। হাতেতে কিরিচ ধরে দেখিছে কপ্তান॥
দেখিয়ে বহুৎসেনা, কি মন্ত্রণা, করে দুই জনে। বন্দুক তৈয়ার রাখ কহে সিপাহিগণে॥
দণ্ডচারি ছয় পরে, কহে হাওলদারে, সুবেদার প্রতি। নির্ণয় করিতে দুর্পিণ আন শীঘ্রগতি॥
বলে উঠ্‌ল গজে, হাওদা মাঝে, নয়নে দুর্পিণ। ছাড়ে ঝুরে আছে সাঁওতাল ক্রোশ দুই তিন॥
কিছু দূর পিছা হাট, বলি ঝাট, সাহেব গেল চলে। পবন বেগে ধায় সাঁওতাল পলাও পলাও বলে॥
করিয়ে বহু দম্প, দিল ঝম্প, পড়লো নদীর জলে। সাঁতারিয়ে পার হয় হাজার সাঁওতালে॥
বলে সব মার মার, ধর ধর, এই মাত্র রব। আজ সিউরী জেলা লুট্‌বো গিয়ে কর্‌বো পরাভব॥

করিতে থাকেন। অবশেষে অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া সাঁওতালগণ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল ; এই দাবানল সমগ্র বীরভূম পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

যাব সব জেহালখানা, দিব থানা, মুক্ত কর্‌বো চুরে। শুভ বাবু রাজা হবে জজ সাহবকে মেরে॥
আমরা খুচ্‌বো মাঝি, কাজের কাজি, মহুরি কর্‌বো বসে।
কৃষ্ণ সাহার দোকান ভেঙ্গে সরাপ খাব বসে॥
বলে সব শীঘ্রতর, অস্ত্রধর, আর বিলম্ব কেনে। কর্ম্মপাকে পড়লো সাঁওতাল সিপাইয়ের মাঝখানে॥
বেটারা তুচ্ছজাতি, নাইকো বুদ্ধি, কিবা জানে টের। আচম্বিতে হুকুম হাকে বলিয়ে ফায়ের॥
আলী হুকুম শুনে, সিপাইগণে, বন্দুক হাতে তুলে। পঞ্চাশ পঞ্চাশ গুলি মারে একককালে॥
যেমন তারা খসে, আশে পাশে, তেমনি গুলি ছুটে। পিঠেতে বাজিয়া কারু পার হয় গা ফেটে॥
অন্ধ সাঁওতাল যত, শত শত, পালাইয়া গেল। কুড়ি আট সাঁওতাল তার সেই দিনেতে মলো॥
তখন যত সাঁওতাল, করে বিকলি, পিছে নাহি চায়। সলাখ পাহারে যেএ সভাইরে জানায়॥
শুনে সব দুঃখ মনে, পর দিনে, হইল একাকার। জব্দী হইতে আনায় সাঁওতাল দ্বাদশ হাজার॥
নাহিক মৃত্যুভয়, সদারয়, ধনুকেতে চরা। নগর মকামে আসি বাজায় নাগরা॥
দেখে সব লোক পলাইল, বিষম হইল, তামলী পুদ্দার। সৎগোপ গোয়ালা পালায় কান্দে লয়ে ভার॥
পলায় সব বুড়াবুড়ি, দৌড়াদৌড়ি, হাতে লয়ে লড়ি। মুসমান ফকির পলায় মুখে পাকা দাড়ি॥
মুখে বলে আল্লা, বিশমোল্লা, একি বেটাদের তীর। এ বিপদে রক্ষা কর ওহে সত্যপীর॥
বলে প্রাণ বায়, হায় হায়, কি বিপদ হইল। কালু সেখের মা বলে আমার মুরগী কোথা গেল॥
পালায় সব দোড়াদৌড়ি, হুড়াহুড়ি উর্দ্ধমুখে ধায়। হাজার দুই সাঁওতাল তারা রাজবাড়ী সেন্দায়॥
লোটি ঘর সব, কলরব, করিয়ে বেড়ায়। মানুষ কাটা পল্ল্য সে দিন কুড়ি দুই আড়াই॥
পরে সাঁওতালগণ, হৃষ্টমন, দেয় টাঙ্গিতে শান। লাউজুরে নাড়া বেটাকে দিল বলিদান॥
গেল সব কুমরাবাদে, আপন ফোজে, কৈল একাকার। ঘরে অগ্নি দিয়ে বেটারা কল্লে ছারখার॥
পুরাইল ধানের গুলা, তিল কুন্‌লো, সর আদি যত। গোরু মোষ ছাগল ভেঁড়া পুর্‌লো শত শত॥
পূর্ব্বে হনুমান, লঙ্কাখান, যেমনে পুড়ায়। ঘরাঘরি অগ্নি দিয়ে সাঁওতাল বেড়ায়॥
অই গ্রাম-নিবাস, সাধুদাস, সঙ্গে জনাচারি। জজ সাহেবের কাছে গিয়ে কহিছে বিনয় করি॥
আর ত প্রাণ বাঁচে না, কি মন্ত্রণা, কচ্ছেন হুজুর বসে।
ঘরকন্না পুরায়ে আমার ভাইকে কাট্‌লে শেষে।
শীঘ্র উপায় কর, সাঁওতাল মার, রাখ প্রজাগণ। টাঙ্গীর চুটে, মুলুক কেটে, পতিত কল্লে বন॥
শুনে তখন, সিপাইগণ, কাঁদে বন্দুক নিল। রাতারাতি হাতাহাতি কুমরোবাদে গেল॥
যুদ্ধ যেমতে, বিস্তারিতে, হবে বহুক্ষণ। আকাশের চন্দ্র কোথা ধরয়ে বামন॥
বেটারা ধনুক ধরে, তীর মারে, করে মার্ মার্। সঙ্গেতে কুকুর আছে হাজার হাজার॥
সাহেব হুকুম দিলে, ফায়ের বলে, শুনে সিপাইগণ। হাজার হাজার সাঁওতাল মারে ততক্ষণ॥
অমনি ভাগরা হয়ে, পশ্চিম মুয়ে, পলাইয়া সত্বরে। জনা দশ বার গড়ে সেই দিনেতে মরে॥
লোকের কি যন্ত্রণা, কি লাঞ্ছনা, করলে সাঁওতালে। কত গর্ভবতী রাস্তায় প্রসবিল ছেলে॥

এই বিপ্লবের সময় বিপ্রচরণ তাঁহার নিজের পদাতিকগণকে রণনীতি-কৌশল শিক্ষা দিয়া বিদ্রোহী সাঁওতালগণের দমনের নিমিত্ত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে সৈন্ত-সাহায্য করায় বিশেষ সম্মান ও ধন্তবাদ প্রাপ্ত হন। (১)

১২৬৪ সালের কার্ত্তিক মাসে বিপ্রচরণ পুনরায় পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হইলেন। এইবার তাঁহার অন্তিম সময় আসিয়াছে বুঝিতে পারিয়া, পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া কাঁটোয়ায় গঙ্গাতীরে গমন করেন এবং ঐ সালেরই ২৬শে কার্ত্তিক তারিখে তিনি জাহ্নবীসলিলে অর্দ্ধ অঙ্গ নিমগ্ন করিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে ইহলীলা সংবরণ করেন।

তিনি স্বকীয় বুদ্ধিকৌশলে পৈতৃক সম্পত্তির অনেক উন্নতিসাধন করেন এবং হেতমপুরে অনেকগুলি দেবমন্দির ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। হেতমপুরের মধ্যস্থলে 'গোবিন্দসায়র' নামক যে বৃহৎ পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়,

এমনি সর্ব্বজরে, লুট করে, বেড়ায় সাঁওতাল। মনুষ্য কি কথা দেবতা পালান গোপাল॥
ভাণ্ডিবন ছেড়ে, পালান দৌড়ে, পূজারির মাথায়। বিক্রমপুরের কালিমায়ের বলিহারী যায়॥
রায় কৃষ্ণদাস বলে, চরণতলে, রেখো মা আমারে। কৃপাকরে নিজগুণে উদ্ধারিও মোরে॥
বার শ বাষট্টি সাল, বর্ষাকাল, বানের বড় বৃদ্ধি। আব্দারপুরের মানুষ কেটে কর্‌লে গাদাগাদি॥
রায় কৃষ্ণদাস ভণে, সাঁওতালগণে, রাখিল যে সুখ্যাতি। যে কিছু কহিলাম আমি সকলি তাহা সত্যি॥
কথা মিথ্যা নয়, সত্য হয়, শুন সকল ভাই। হরি হরি বল সবে দিন বহে যায়॥

(১) বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বীরভূম কালেক্টর সাহেব যে পত্র পাইয়াছিলেন, তাহার অবিকল নকল নিম্নে প্রদত্ত হইল—

No 2667.

From the Under Secretary to the Government of Bengal.
To I. Richardson Esq. Collector of Birbhum.

Dated Fort William, the 2nd Oct. 1855 Judicial.

I am directed to acknowledge the receipt of your diary of the 28th ultimo, and with reference to the intimation therein contained, of the public spirit evinced by Babu Bipracharan Chukerboty, in raising a force at his own expense, from among his dependents to aid the military with suppression of the Sonthal insurrection to inform you that Lieutenant Governor would be glad to hear more of the circumstance.

I have the honour &c.
A. W. Rupen
Under Secretary to the Govt. of Bengal.

তাহা ১২৪৯ সালে বিপ্রচরণ বাবু খনন করাইয়া, কন্যা দোলগোবিন্দমণির নামে প্রতিষ্ঠা করেন, তদনুসারে ইহার নাম গোবিন্দসায়ের রাখা হয়। বর্ত্তমান রাজ-কাছারীর পার্শ্বস্থ "বিরজাসায়র" নামক অনতিবৃহৎ সরোবর তিনি খনন করাইয়া তাঁহার স্বর্গীয় ভ্রাতা গঙ্গানারায়ণের বিধবা পত্নী বিরজাসুন্দরী দেবীর নামে প্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দসায়রের পূর্ব্বদক্ষিণকোণে 'সুখসায়র' নামক আর একটী পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, উহাও বিপ্রচরণ প্রতিষ্ঠা করেন। (১) হেতমপুর ও ভুবরাজপুরের মধ্যস্থলে বর্ত্তমান কলেজ বোর্ডিংএর সন্নিকটে পথিপার্শ্বে মানসায়র নামক যে পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, উহা বিপ্রচরণ কর্ত্তৃক ভাগিনেয়ী মনোমোহিনী (২) দেবীর নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'গোবিন্দসায়র' পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে লালদীঘি নামক একটী ক্ষুদ্র সরসী দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহার দক্ষিণতীরে পাঁচটী শিবের মন্দির আছে, এ সকল মন্দির ও সরসী কীর্ত্তিমান্ বিপ্রচরণের অন্যতম কীর্ত্তি। এতদ্ভিন্ন তিনি "নূতনপুকুর" নামক একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া স্বীয় ভগিনী রুক্মিণীদেবীর নামে প্রতিষ্ঠা করান। তিনি প্রত্যেক সরোবরতীরে সুরম্য পুষ্পোদ্যান ও গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করেন। তন্মধ্যে তাঁহার জীবিতাবস্থায় গোবিন্দসায়েরের উত্তরতীরে "বড় আটচালা" নামক একটী উচ্চ আটচালা এবং লালদিঘীর পূর্ব্বতীরে "বারদুয়ারী" নামক গৃহের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হয়। এই শেষোক্ত গৃহ বর্ত্তমান মহারাজ বাহাদুরের নাবালক অবস্থায় ভগ্ন হওয়ায় পুনরায় সংস্কৃত হইয়া "রোজিভিলা" নাম ধারণ করিয়াছে। অন্যান্য পুষ্করিণীর তীরেও গৃহনির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু তাঁহার পরলোকগমনহেতু সে সকল গৃহ সমাপ্ত হয় নাই, অদ্যাবধি অসমাপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিপ্রচরণ ১২৪০ সালে সরস্বতী-পূজার প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৫১ সালে বড় আটচালার উত্তরাংশে একটী সুবৃহৎ সরস্বতী বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান মহারাজ বাহাদুরের নাবালক অবস্থায় তাহাও ভগ্ন হওয়ায় তাঁহার দ্বারা উহা সংস্কৃত হইয়া তন্মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(১) পূর্ব্বে ইহার নাম "মিত্তিনি" ছিল। বিপ্রচরণ ইহাকে বৃহৎ করিয়া "সুখসায়র" নাম প্রদান করেন।

(২) মনোমোহিনীর ডাক নাম "মান" ছিল। সেই নামানুযায়ি পুষ্করিণীটীর নাম "মান সায়র" হইয়াছে।

কলেজের দক্ষিণাংশে বিপ্রচরণ একটী গোলাকার রাসমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন।

ইহা ব্যতীত গ্রামবাসিগণের সুশিক্ষার জন্য তিনি ১২৫৫ সালে একটী মডেল স্কুল স্থাপন করেন ও গ্রামের মধ্যে একটী হাট প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত ৺রাধাবল্লভজীউর সেবা পরিচর্য্যায় একান্ত অনুরক্ত ও দেবদ্বিজে শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তাঁহার ব্যবহৃত মোহরে খোদিত কবিতাপাঠে ও লোকমুখে এ বিষয় জানিতে পারা যায়। মোহরাঙ্কিত কবিতা এই ঃ—

"রাধাবল্লভ চরণে আশ,
শ্রীবিপ্রচরণ দ্বিজদাস।"

হরিনাম-সংকীর্ত্তনে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং তিনিও পিতার ন্যায় কীর্ত্তনের গান রচনা করিতেন। যে সমস্ত কীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"ব্রজাঙ্গনার মাঝে বিরাজে রাধা শ্যামরায়।
শ্যামজীমূতবেষ্টিত বিদ্যুৎ সব গোপিকায় ॥
হেরিলাম শ্রীরাসমণ্ডলবেষ্টিত গোপীমণ্ডল।
জ্ঞান হয় মণিমণ্ডল বিধু কি কুণ্ডল ॥
রাসসরোবর মাঝে, মদনমোহন বিরাজে।
গোপিগণ-সব হেমাম্বুজে ত্রিভঙ্গশ্যাম ভৃঙ্গ তায় ॥
মত্ত ময়ূর ডাকে "গড় গড়" কোকিল পঞ্চম গাওয়ে।
যত তরুকুল বিকসিত ফুল খসি' পড়ে দোঁহার গায় ॥"

বিপ্রচরণের মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারী হইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ১২৩৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন, পিতার মৃত্যুর সময় তাঁহার ৩১ বৎসর বয়স হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র মহাসমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া পুত্রের কার্য্য করিলেন। এতদুপলক্ষে বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে বহুতর পণ্ডিত এবং লক্ষ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।(১) ক্রমান্বয়ে আট দিন ধরিয়া কাঙ্গালী-ভোজন (কাঙ্গাল-ভোজন) হইয়াছিল।

(১) নিমন্ত্রণ-পত্রের রচিত শ্লোক—

"গঙ্গায়াং ত্যক্তদেহস্ত পিতুরাদ্যাক্রিয়া বুধাঃ।
স্বরমে রসমে যন্ত্রে সমাগত্য সমাপ্যতাম্ ॥"

এই শ্রাদ্ধে তিনলক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হয়। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় এই সময়ে ব্রাহ্মণ-ভোজনের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।(১)

এই সময়ে কৃষ্ণচন্দ্রের অপূর্ব্ব মহত্ত্বের এক প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, শ্রাদ্ধের সময়ে কাঙ্গালী-ভোজন হইয়াছিল। কাঙ্গালীগণ একে একে বিদায় গ্রহণ করিলে, কর্ম্মচারিগণ ও গ্রামবাসিগণ কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর অজস্র প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "এখনও কাঙ্গালী-বিদায় সম্পূর্ণ হয় নাই", এবং শ্রাদ্ধোপলক্ষে সমাগত ও ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি কার্য্যে সাহায্যকারিগণের মধ্যে নন্দগোপাল বন্দোপাধ্যায় ও তারাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক দুই জন ব্রাহ্মণকে নিকটে আহ্বান করিলেন।

এ স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে এই ব্রাহ্মণদ্বয় কৃষ্ণচন্দ্রের কর্ম্মচারী ছিলেন। নন্দগোপালের নিবাস পাঁচড়া এবং তারাচরণের নিবাস জয়দেব কেন্দুলি। এক সময়ে কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট নন্দগোপাল যাট হাজার ও তারাচরণ সাতাইশ হাজার টাকা ঋণ-গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঋণ-পরিশোধ তাঁহাদের অসাধ্য হইয়াছিল।

নন্দগোপাল ও তারাচরণ নিকটে উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণচন্দ্র উক্ত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদ্বয়ের ঋণ-গ্রহণ-পত্রিকা সহস্র খণ্ডে ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত ঋণদায় হইতে মুক্তি প্রদান করিলেন।

তৎপরে নন্দগোপাল ব্রাহ্মণ-ভোজনের দক্ষিণাস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে পাঁচড়া গ্রামখানি বিনা পণে পত্তনীস্বত্বে বন্দোবস্ত করিলেন। তাঁহার বংশধর কমলাকিঙ্কর বন্দোপাধ্যায় অদ্যাপি পত্তনীস্বত্বে ঐ গ্রামখানি দখল করিতেছেন।

বিপ্রচরণের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র

পিতার মৃত্যুর পর কৃষ্ণচন্দ্র পৈতৃক সম্পত্তির অনেক উন্নতি সাধন করেন। তিনি ১২৬৬ সালের প্রারম্ভে লাট ভবানন্দপুর ক্রয় করেন। এই সময় মহম্মদাবাদ পরগণা লইয়া এক ঘোরতর মোকদ্দমা উপস্থিত হয়।

(১) ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিতের ৪০ পৃষ্ঠায় এই ব্রাহ্মণ-ভোজন সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"হেতমপুর রাজবাটীতে একবার লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজন হইয়াছিল। তর্কবাচস্পতি মহাশয় তথায় ভোজনাদি সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধারক ছিলেন। এরূপ সমারোহে সুবন্দোবস্ত করিতে তাঁহার মত কাহারও ক্ষমতা ছিল না।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজনগরনিবাসিনী রজবন্নেসা দেনার দায়ে বিপ্রচরণ বাবুকে পরগণা মহম্মদাবাদ বিক্রয় করেন। উক্ত বিবির উহা বিক্রয় করিবার অধিকার নাই, এই মর্ম্মে রাজনগরাধিপতি মহম্মদ জওহারজ্জমান-খাঁ এক মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। কিন্তু উহা আদালতের সুবিচারে কৃষ্ণচন্দ্রের অনুকূলে নিষ্পত্তি হইল।

১২৬৬ সালে কৃষ্ণচন্দ্র পিতৃপ্রতিষ্ঠিত মডেলস্কুলটী মাইনার স্কুলে পরিণত করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী সর্পীগ্রামের কৈলাসচন্দ্র রায়চৌধুরীর কন্যা শিবসুন্দরীর সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের বিবাহ হয়। শিবসুন্দরীর গর্ভে কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কন্যাটী সর্ব্বজ্যেষ্ঠা, নাম রাজবালা সৌদামিনী। জন্ম ১২৫২ সালের ২৭শে চৈত্র। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্রগণের নাম রামরঞ্জন, রাখাল ও বাগাল। রামরঞ্জন ১২৫৭ সালের ৭ই ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন, রাখাল ১২৫৯ সালে ও বাগাল ১২৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৬১ সালের চৈত্রমাসে শ্রীরামনবমীর দিন বাগালকে সাত দিনের শিশু রাখিয়া শিবসুন্দরী সূতিকারোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১২৬৩ সালের ভাদ্রমাসে কনিষ্ঠ পুত্র বাগাল, ১২৬৪ সালে কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা বিপ্রচরণ ও পিতামহী দাসুমণি, এবং ১২৬৫ সালের প্রারম্ভে কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যম পুত্র রাখাল বিসূচিকা রোগে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

উপর্য্যুপরি শোক প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র অধীর হইয়া পড়েন। তৎকালে রামসুন্দর তর্কবাগীশ মহাশয় হেতমপুরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিবিধ শাস্ত্রপ্রসঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণচন্দ্রকে সান্ত্বনা দান করিলেন। অতঃপর গৃহপ্রবেশ করিলে স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির মৃত্যুর স্থান সকল নয়নগোচর হইবে বলিয়া তিনি আর আজীবন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেন নাই; মৃত্যুকালপর্য্যন্ত গোবিন্দসায়রের উত্তর তীরস্থ বড় আটচালা গৃহেই বাস করিয়াছিলেন।

১২৬৩ সালে সাজিনানিবাসী শিবাশরণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত রাজবালা সৌদামিনীর বিবাহ হয়। বিবাহের পর কৃষ্ণচন্দ্র অনেক ভূমিসম্পত্তি দান করিয়া জামাতাকে হেতমপুরেই স্থাপন করেন। রাজবালার চারিপুত্র ও তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ, মধ্যম সুরেন্দ্রনারায়ণ, তৃতীয় বীরেন্দ্রনারায়ণ। কনিষ্ঠ পুত্রটী শৈশবেই মারা পড়ে। বীরেন্দ্রনারায়ণ বিবাহের পর ২২।২৩ বৎসর বয়ঃক্রমে অদ্য চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইল মানবলীলা

সংবরণ করিয়াছেন। কন্যাগণের নাম মহাশ্বেতা, শ্বেতবরণী ও শ্বেতাঙ্গিনী। রাজবালা সন ১৩১৭ সালের ৪ঠা আশ্বিন তারিখে জ্বরপীড়ায় মৃত্যুগ্রাসে পতিতা হন।

তরুণ বয়সে পত্নীবিয়োগ ও পুত্রদ্বয়ের অকালমৃত্যুতে কৃষ্ণচন্দ্রের হৃদয়ে যে শোক-শেল বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার জীবনান্ত হয়। তিনি ১২৬৮ সালের শ্রাবণ মাসে উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলেন। ক্রমান্বয়ে সেই ব্যাধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় ১২৬৮ সালের কার্ত্তিক মাসে কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ৩৫ বৎসর বয়সে কৃষ্ণচন্দ্র নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

তিনি অত্যন্ত বিলাসী হইলেও অতীব পরোপকারী ছিলেন। গাড়ীঘোড়ায় তাঁহার বিশেষ সখ ছিল। তিনি যাবতীয় কর্ম্মফল শ্রীরাধাবল্লভের চরণে সমর্পণ করিয়া নিষ্কামভাবে সংসারধর্ম্ম পালন করিতেন। তাঁহার সময়ের সমস্ত কাগজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি রাধাবল্লভজীউকে যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারী করিয়া স্বয়ং সেবাইতরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার মোহরাঙ্কিত কথাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"রাখ মান কৃষ্ণচন্দ্র"

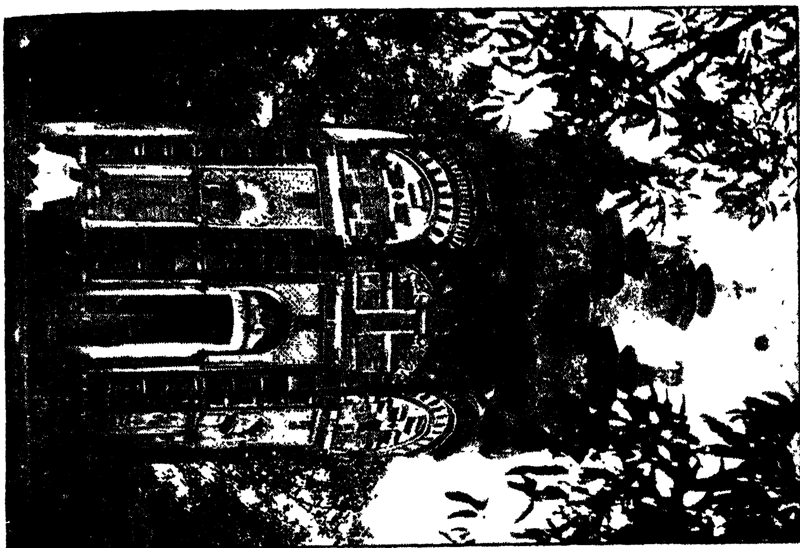
উল্লিখিত কয়েকটী কথায় তাঁহার হৃদয়ের গূঢ় ভাব প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।

কৃষ্ণচন্দ্র বাবু ১২৫৪ সালে গোবিন্দসায়েরের অগ্নিকোণে বিবিধ কারুকার্য্য-খচিত একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত চন্দ্রনাথ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরগাত্রে লিখিত আছে—

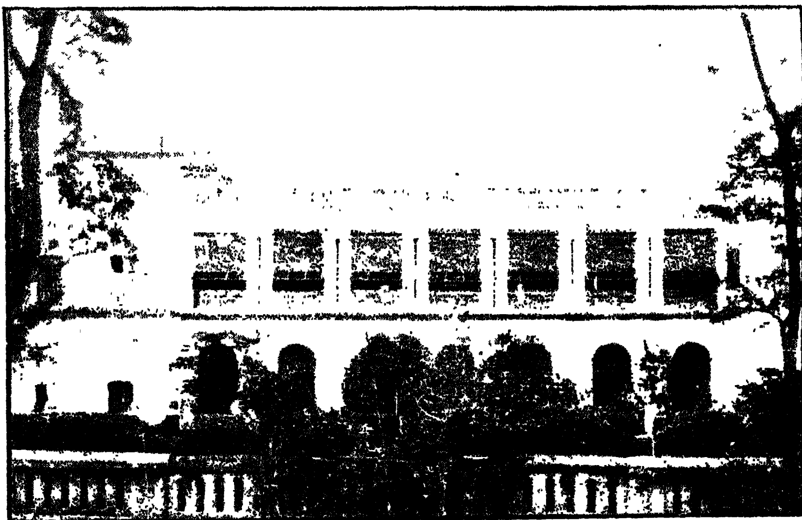
"স্থাপিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র মুদেকর
চন্দ্রনাথ শিবাচন্দ্র হরমেঙ্গী চন্দ্রশেখর"

তিনি বিশেষ সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তাঁহার সখের কবির দল ছিল। শারদীয়া ও ৺সরস্বতী পূজার সময় তাঁহার রচিত গীতগুলি ঐ দলে গীত হইত। কৃষ্ণচন্দ্ররচিত একটি গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"মথুরা যাই পাঠালে রাই
দেখি অপার নদী কাঁদি কৃষ্ণ ব'লে ॥



[illegible]পুর — স্বর্গীয় [illegible]চন্দ্রের শিবমন্দির।



হেতমপুর মহারাজ-ভবন

গোপীর বিচ্ছেদ অপার, কর বার বার শ্যাম পার
বিপদে পার কর এবার,
ভাসে তরঙ্গে জীবনতরী, তরাও ত তবেই তরি,
নারী যমুনা পার হতে নারি,
পারের কাণ্ডারী বংশীধারী হরি কোথা রহিলে ॥
তুমি ভিন্ন উপায় নাই,
তোমার নাম নিলে যায় ও পারে
পারে লয়ে যেতে আর কে পারে ?
কৃষ্ণ করুণা দান কর যারে
পারের ভয় কি আছে তারে ?
নিদানে নাম নিলে কত পাপী তাপী তরে,
আমার পারের বিধান, কর বংশীবয়ান,
নাসে কলঙ্ক হবে হরি আমায় না তরালে ॥"

মহারাজ রাম-রঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর

জননী মন্দাকিনীর হস্তে শিশুপুত্র রামরঞ্জন ও কন্যা রাজবালা সৌদামিনীকে অর্পণ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের সম্পত্তি কিরূপে রক্ষিত হইবে, কে তাঁহার অভিভাবক হইবেন, কে জমিদারীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে, ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিয়া কর্ত্রীঠাকুরাণী (মন্দাকিনী দেবী) হতাশ হইয়া পড়েন। যথাসময়ে কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়।

কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বীরভূমের কালেক্টর মিঃ জেন্‌কিন্‌স নাবালক রামরঞ্জনের (এক্ষণে মহারাজ বাহাদুর) সম্পত্তি সমূহ কোর্টঅবওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে আনেন এবং সাঁওতালপরগণার অন্তর্গত বাগডহরীনিবাসী মহানন্দ চৌধুরীকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া হেতমপুরে প্রেরণ করেন।

বীরভূমের তদানীন্তন জজ মিঃ O. W. Mallat সাহেবের সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল। তিনি কালেক্টর সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া নাবালককে সিহুরী জিলাস্কুলে ভর্ত্তি করেন। এবং উক্ত স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক মহেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (১) ও প্রধান পণ্ডিত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীকে (২)

(১) ইনি পরে দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়াছিলেন। সিহুরীর পূর্ব্বদক্ষিণে কেন্দুয়াগ্রামে তাঁহার বাস ছিল। তৎপুত্র যতীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এখন দুমকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

(২) বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বাব্‌পুর গ্রামে তাঁহার বাস ছিল।

গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দেন। এইরূপে তিনবৎসর যাবৎ রামরঞ্জন সিহুরীতে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন।

অকালে পুত্র ও পুত্রবধূ হারাইয়া বৃদ্ধা কর্ত্রীঠাকুরাণী চতুর্দ্দিক্ শ্মশানবৎ দর্শন করিতে লাগিলেন। সংসারে তাঁহার সকল সাধ ও সকল আশা ফুরাইয়াছে। এক্ষণে পৌত্রের বিবাহ দিয়া মরিতে পারিলে, তাঁহার অন্তিম কামনা পূর্ণ হয়। তজ্জন্য তিনি রামরঞ্জনের বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, ম্যানেজার মহানন্দ চৌধুরীকে স্বীয় মনোভাব জ্ঞাপন করেন।

রামরঞ্জনের বিবাহ

কৃষ্ণচন্দ্র বাবু জীবিতকালে একদা কাঁটোয়ায় গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া একটী বালিকাকে দেখিতে পান। তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সেই বালিকার নাম পদ্মসুন্দরী, তিনি বীরভূম জেলার অন্তর্গত দাঁড়কাগ্রামনিবাসী কালাচাঁদ রায়ের কনিষ্ঠা কন্যা। কৃষ্ণচন্দ্র নিজ পুত্র রামরঞ্জনের সহিত সেই কন্যাটীর বিবাহ দিবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কর্ত্রীঠাকুরাণী এই কন্যার সহিত বিবাহ দিবার সমস্ত আয়োজন করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম ভিন্ন কোন কার্য্যই হইবে না, ইহা জানিয়া চৌধুরী মহাশয় বিবাহের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ইতিমধ্যে বিবাহের দিন স্থির হইল, বিবাহের আয়োজনাদি চলিতে লাগিল, এমন সময় হঠাৎ সংবাদ আসিল যে, রামরঞ্জন সাবালক না হইলে বিবাহ হইবে না। সকলেরই হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইল, কিন্তু কর্ত্রী-ঠাকুরাণী এতই অধীরা হইয়া উঠিলেন যে, আর এ বিষয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পুনরায় জ্ঞাত না করাইয়া ১২৭১ সালের ৭ই বৈশাখ বিবাহের দিন স্থির করিলেন (১) এবং ঐ দিবসেই রামরঞ্জনের বিবাহ হইয়া গেল। পদ্ম-সুন্দরী অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি সমস্ত কার্য্যই নিজে দেখিয়া করিতেন এবং রাজকার্য্যপরিদর্শনেও তিনি স্বামীর বিশেষ সহায়তা করিতেন। (২)

(১) স্বনামধন্য তারানাথ তর্কবাচস্পতি রচিত নিমন্ত্রণ পত্রের শ্লোক—
"কুজমুখ ভবনে, বিলসতি তপনে, শশভৃতি মুনিগুণী তাহে।
হেতমপুর গত, ভবন সমাগত, সমিতিং শোভয়মান।
পত্রি নিমন্ত্রিত, করুণা যন্ত্রিত, তং পুরয় বহুমানং।"

(২) ১৯০০ খৃঃ আগষ্ট মাসের National Magazineএ প্রকাশ—
"She (Padmasundari) plays an important part in the management of the Hetampore Raj. ... ... Those who know Hetampore know who and what Rani Padmasundari was."



রাজা সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর।

এই বিবাহের বার্ত্তা শুনিয়া বীরভূমের কালেক্টার সাহেব অতিশয় রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং স্ত্রীলোক পাইয়া কতকগুলি দুষ্টলোক নাবালকের সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি সমস্ত বিষয় রেভিনিউ বোর্ডে রিপোর্ট করিলেন। ইহাতে ম্যানেজার মহানন্দ চৌধুরীর পদচ্যুতি ঘটিল এবং তৎপরিবর্ত্তে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দেবীপুরধামাসনিবাসী দুর্গাদাস বসু ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেন এবং নাবালককে আর পিতামহীর সংস্রবে না রাখিয়া কলিকাতার Wards institutionএ পাঠাইবার আদেশ আসিল।

রামরঞ্জনের লুক্কায়িতভাবে অবস্থান

লোকে মন্দাকিনীদেবীকে বুঝাইয়াছিল যে, নাবালককে তথায় লইয়া গিয়া খৃষ্টান করিয়া ফেলিবে এবং নোনা জল খাইয়া বালক মারা পড়িয়া যাইবে, ইহাতে বৃদ্ধা একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে ইহাই স্থির করিলেন যে, নাবালককে কোনক্রমেই চক্ষের অন্তরাল করা হইবে না, সেইজন্য তাহাকে লুকাইয়া রাখা হইল।

কালেক্টর সাহেব এই সকল কথা শুনিয়া বিশেষ রুষ্ট হইলেন এবং ষ্টেটের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি সিহুড়িতে নিলামে বিক্রয় আরম্ভ করিলেন। নাবালককে তাহাতেও হাজির করা হইল না, তখন কালেক্টার সাহেব গৃহ হইতে সমস্ত লোক এমন কি কুলদেবতা রাধাবল্লভজীউকেও বাহির করিয়া সমস্ত দরজা তালাবদ্ধ করিতে হুকুম দিলেন। এইরূপ ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইয়া দুর্গাদাস কার্য্যে ইস্তাফাদানপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে রামরঞ্জন ধরা পড়িবার ভয়ে একস্থান হইতে অন্যস্থানে, এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে লুকাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সময়ে আহার নাই, সময়ে নিদ্রা নাই, কখনও পর্ব্বতগুহায়, কখনও বনজঙ্গলমধ্যে, কখনও স্ত্রীলোকের বেশে দেশবিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। (১)

ইতিমধ্যে জেন্‌কিন্‌স বদ্‌লি হইলেন এবং তাঁহার পদে লিউইস সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আইসেন।

অতঃপর A. Hume Smith নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ হেতমপুর-ষ্টেটের ম্যানেজার ও বাবু ধরণীধর রায় সহকারী ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া আসেন।

রামরঞ্জন লুক্কায়িতভাবে নানাস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক অবশেষে বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত নণ্ডীগ্রামে বিজয়গোবিন্দ লায়েকের বাটীতে উপস্থিত হয়েন। তথায় স্বনামধন্য লায়েক মহাশয় ও তাঁহার জনৈক আত্মীয় পরেশ চক্রবর্ত্তী উভয়ে

(১) বিশেষ বিবরণ নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রণীত বাল্যকাহিনীতে দ্রষ্টব্য।

রামরঞ্জনের পাঠ্যাবস্থা

পরামর্শ করিয়া রামরঞ্জনকে এরূপভাবে না বেড়াইয়া বোর্ডে উপস্থিত হইবার পরামর্শ দেন এবং লায়েক মহাশয় স্বয়ং হেতমপুরে আসিয়া রামরঞ্জনের পিতামহীকে এ বিষয়ে সম্মত করাইলেন। তদনুসারে নাবালক কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া দরখাস্ত করেন যে, তাঁহাকে কাশীর Wards institutionএ অধ্যয়ন করিবার অনুমতি দিলে তিনি হাজির হইতে ইচ্ছুক আছেন। তাহার পরদিনই কলিকাতার বোর্ড হইতে আদেশ প্রচারিত হইল যে, রামরঞ্জনকে বীরভূম জেলাকোর্টে হাজির হইতে হইবে।

অতঃপর নাবালক রামরঞ্জন তদানীন্তন কালেক্টার মিঃ Lewis সাহেবের নিকট উপস্থিত হন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পরদিনই তাঁহাকে কলিকাতার Wards institutionএ পাঠাইয়া দেন। পত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় তৎকালে উক্ত Institutionএর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। রামরঞ্জন তথায় ছয়মাসকাল অধ্যয়ন করিয়া, ১২৭২ সালের ভাদ্রমাসে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ পালধী মহাশয়ের (১) তত্ত্বাবধানে কাশীর Wards institutionএ স্থানান্তরিত হয়েন।

পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে প্রায় চারি বৎসর অধ্যয়ন করিয়া ১২৭৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রামরঞ্জন সাবালক গণ্য হন, এবং স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মন্দাকিনী

(১) পালধী মহাশয়ের শিক্ষাপ্রণালী অতীব প্রশংসনীয় ছিল। তিনি ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশানের ছাত্রদিগকে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত আচার ব্যবহার শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষা প্রণালী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রাতে চারি ঘটিকার সময় শয্যাত্যাগ করত শিক্ষার্থিগণকে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিতে হইত। ৬টার সময় স্নান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে হইত। সাড়ে সাতটা হইতে সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতে হইত। তৎপর আহারান্তে সাড়ে দশটার সময় ছাত্রগণ কলেজে যাইত। অপরাহ্ন চারিটার সময় কলেজ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর পাঁচ ঘটিকার সময় ভ্রমণ উদ্যানে জল সেচন, অশ্বারোহণ প্রভৃতি ব্যায়ামে শিক্ষার্থিগণ নিযুক্ত থাকিত। সাড়ে ছয়টার সময়ে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া সাতটা হইতে পাঠাভ্যাস করিতে হইত। পালধী মহাশয় বালকগণের নিরহঙ্কার ও আড়ম্বরশূন্যতা শিক্ষা দিতেন। মৎস্য মাংসাদি ইনষ্টিটিউশন মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। মিতাহার ও মিতব্যয়িতা তিনি ছাত্রদিগকে বিশেষরূপে শিক্ষা দিতেন। ভাগলপুর জেলান্তর্গত নাগোয়া নিবাসী রাজা উদিত নারায়ণ সিংহ, বস্তির রাজা শিতলা বক্স, প্রয়াগনিবাসী মহারাজ বলবন্ত সিংহের পুত্র কুমার রাম সিংহ প্রভৃতি রামরঞ্জনের সহাধ্যায়ী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই পালধী মহাশয়ের শিক্ষাগুণে, নিরহঙ্কারী মিতব্যয়ী ও বিশেষভাবে হিন্দুধর্ম্মানুরক্ত হইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়।



মহারাজ কুমার সদানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর

দেবীর মৃতদেহে প্রাণদান করেন; কিন্তু মন্দাকিনী অধিকদিন পৌত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া সুখী হইতে পারেন নাই, কারণ ১২৭৭ সালের ১৭ই শ্রাবণ পুণ্যতীর্থ কাশীধামে ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন।

১২৭৬ সালের আশ্বিন মাসে Court of Wards রামরঞ্জনের পৈতৃক ঋণ আশিহাজার টাকা শোধ করিয়া দুইলক্ষ টাকা জমা দেখাইয়া রামরঞ্জনকে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি বুঝাইয়া দেন।

১২৮১ সালে বঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সে সময় রামরঞ্জন প্রথম হইতেই তাঁহার জমিদারীমধ্যে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজাগণকে বিশেষরূপে সাহায্য (১) করেন। তাহাতে গবর্ণর জেনারেল Lord Northbrook ১২৮২ সালে (ইং ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের ১৭ই মার্চ্চ তারিখে) তাঁহাকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ১২৮৪ সালে (ইং ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে) Lord Lytton রামরঞ্জনের নানাবিধ সৎকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন।

মহারাজের সন্তান

মহারাজবাহাদুরের পাঁচ পুত্র ও চারি কন্যা। মহারাজকুমার নিত্য-নিরঞ্জন ১২৭৭ সালের ১১ই পৌষ, মহারাজকুমারী ভূপবালা ১২৭৯ সালের ১৪ই আশ্বিন, সত্যনিরঞ্জন ১২৮২ সালের ৫ই পৌষ, মহিমানিরঞ্জন ১২৮৩ সালের ১০ই মাঘ, মহারাজকুমারী নৃপবালা ১২৮৪ সালে, সদানিরঞ্জন ১২৮৬ সালের ২৫শে কার্ত্তিক, কমলানিরঞ্জন ১২৮৯ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ, মহারাজকুমারী রাসবালা ১২৯১সালের ১৯শে কার্ত্তিক ও অমিলাবালা ১২৯৩ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন।

১২৮৮ সালের ২৬শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত গোবরডাঙ্গা-নিবাসী বাবু অন্নদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র বাবু জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখো-

(১) Remarks by Sir Richard Temple—October 1874—

"Babu Ramranjan Chakravarty owns estates which were visited by distress. He from the first set a good example to the neighbourhood, expended £ 1400 on relief works, remitted £ 3109 (or one-tenth of his yearly rent), maintained for 4 months a relief-house, where 250 persons were fed daily, subscribed largely to relief-funds and personally as well as through his efficient manager Mr. Reed superintended the dispensation of the charity."

পাধ্যায়ের সহিত ভূপবালার বিবাহ হয়। ১২৯৩ সালের ১৬ই মাঘ তারিখে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত টিয়াকাটা পাটকেবাড়ী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত মহারাজকুমার নিত্যনিরঞ্জনের এবং ১৮ই মাঘ তারিখে হুগলী জেলার অন্তর্গত জনাই গ্রামের শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১) কন্যার সহিত মহারাজকুমার সত্যনিরঞ্জনের বিবাহ হয়। ১২৯৪ সালের ৩০শে বৈশাখ উত্তরপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র কুমার ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত নৃপবালা দেবীর বিবাহ হয়।

মহারাজ বাহাদুরের তীর্থ ভ্রমণ

১২৯৬ সালে আশ্বিন মাসের শেষভাগে মহারাজবাহাদুর, পত্নী, জ্যেষ্ঠ মহারাজকুমার ও জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূসহ তীর্থ-পর্য্যটনে গমন করেন এবং ঐ সালের ২২শে কার্ত্তিক রাসপূর্ণিমার দিনে ৺বৃন্দাবনধামে অষ্টসখীপরিবেষ্টিত ৺রাধা-রাসবিহারীজিউ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে বৃন্দাবনধাম হইতে ৺কাশীধামে আগমনপূর্ব্বক দশাশ্বমেধঘাটের উপর স্বনামে রামরঞ্জনেশ্বর, পিতৃদেবের নামে কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর ও শ্বশুরের নামে কালাচাঁদেশ্বর এই তিনটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। অনন্তর অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। সিন্থিয়া ষ্টেশন হইতে গর্ভবতী জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূকে হেতমপুরে পাঠাইয়া দিয়া মহারাজবাহাদুর তৎপত্নী মহারাণীপদ্মসুন্দরী, শিশুকন্যা অমিলাবালা ও পুত্র নিত্যনিরঞ্জন সমভিব্যাহারে কলিকাতা গমন করেন। তথায় গিয়া শিশুকন্যা অমিলাবালার বিসূচিকা হয়। তৎপর দিবস রাত্রি হইতে নিত্যনিরঞ্জন ঐ রোগে আক্রান্ত হইলেন। কন্যা ভীষণ রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু নিত্যনিরঞ্জন আর রক্ষা পাইলেন না। ১২৯৬ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ তারিখে বিংশতিবর্ষ মাত্র বয়সে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তাঁহার মৃত্যু হয়। নিত্যনিরঞ্জনের প্রকৃতি অতি ধীর ও গম্ভীর ছিল। তিনি তরুণ বয়স্ক হইলেও সাতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি এই তরুণবয়সেই রাজকার্য্যে তাঁহার পিতার বিশেষ সহায়তা করিতেন। (২)

মহারাজকুমার নিত্যনিরঞ্জনের অকাল মৃত্যু

মহারাজকুমার

র

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মহারাজকুমার নিত্যনিরঞ্জনের পত্নী এই সময় গর্ভবতী ছিলেন। ১২৯৭ সালের ২১শে জ্যৈষ্ঠ তিনি এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন।

(১) ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণি ছিলেন। তাঁহার হরিপদ ও ভূতনাথ নামক দুইপুত্র বর্ত্তমান।

(২) নিত্যনিরঞ্জনের বিশেষ বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।



মহারাজ-কুমার কমলানিরঞ্জন [illegible] বাহাদুর

মহারাজবাহাদুর ও পরিবারবর্গ জ্যেষ্ঠ মহারাজকুমারের দেহত্যাগে জ্ঞানহারা হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই শিশুমুখ দর্শন করিয়া সকলেই কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন, সেইজন্য এই শিশুর জ্ঞানরঞ্জন নাম রাখা হয়।

অনন্তর মহারাজকুমার সত্যনিরঞ্জনের ১২৯৮ সালের ২১শে শ্রাবণ পুত্র ব্রহ্মনিরঞ্জন এবং ১৩০০ সালের ৪ঠা বৈশাখ কন্যা ভানুবালা জন্মগ্রহণ করেন।

১৩০০ সালের ৮ই ফাল্গুন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমারের বংশধর কুমার দুর্গানাথ রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জনের বিবাহ হয়।

মহারাজকুমারী নৃপবালার মৃত্যু

দ্বিতীয়া মহারাজকুমারী নৃপবালার পঞ্চানন নামে একপুত্র ও ব্রজরাণী নামে এক কন্যা। পুত্রটী ১২৯৮ সালের ২৫শে কার্ত্তিক তারিখে ও কন্যাটী ১৩০১ সালের ১৩ই পৌষ জন্মগ্রহণ করেন। এই কন্যাপ্রসবের পর নৃপবালা সূতিকারোগে আক্রান্ত হওয়ায় ১৩০২ সালের আষাঢ় মাসে তাঁহাকে হেতমপুরে লইয়া আসা হয়। তখন তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয়; সেই মাসের ২৮শে আষাঢ় বৃহস্পতি-বার প্রাতে ৭টার সময় সূতিকারোগে গিরিডাঙ্গা স্বাস্থ্যভবনে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।(১)

(১) মহারাজকুমারী নৃপবালার মৃত্যুতে তাঁহার ভ্রাতা মহিমানিরঞ্জন অতীব শোকদগ্ধ হওয়ায়, নিম্নলিখিত কবিতায় তাঁহার মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায়। এই কবিতাটী "ধরণী" মাসিক পত্রিকায় (ভাদ্র, ১৩০২ সাল, ১ম ভাগ, ৮ম সংখ্যা) মুদ্রিত হয়।

ভাই ভগ্নী স্বামী পুত্র শ্বশুর শাশুড়ী,
পিতা মাতা পরিজনে শোকদগ্ধ করি—
কোনখানে গেলে বোন ? কোন পথ দিয়া ?
কোথা হ'তে কে ডেকেছে নয়ন ছানিয়া ?
বুকভরা ভালবাসা আশা আকিঞ্চন,
কেমনে পাষাণ প্রাণে দিলে বিসর্জ্জন ?
হেথাকার কত আঁখি ভাসিতেছে নীরে।
কি করিয়াছিনু মোরা ? কোন অপরাধে
অপূর্ণ যৌবন মাঝে—অপূরণ সাধে—
চলে গেলে ? একবার ভাবিলে না মনে—
চির-বিরহের বোঝা বহিব কেমনে ?
চলে গেলে ? কেন গেলে ? গেলে কোন পুরে—
সেথা কি যায় না যাওয়া, সে কি বড় দূর ?

মহারাণী পদ্মসুন্দরীর বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা

১৩০২ সালের ১৭ই ফাল্গুন দোল-পূর্ণিমার দিন মহারাণী পদ্মসুন্দরী মহারাজ ভবনের অগ্নিকোণে আঁধারকুলি নামক অরণ্যপ্রান্তে এক মন্দির প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে শ্রীশ্রী৺গৌরাঙ্গদেব ও নিত্যানন্দের ধাতবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এক্ষণে তথায় তিনটী মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহার কারণ, মধ্যে একটী মূর্ত্তির অঙ্গুলী ভগ্ন হয়,

যে আগুন জ্বালিয়াছ হৃদয়ে সবার—
এ কি রাবণের চিতা নিভিবে না আর ?
দেবী তুমি ছিলে হেথা মায়া দেহ নিয়া
আপন মহত্ত্ব মাঝে আপনি ফুটিয়া ।
ক্ষুদ্র ও হৃদয়খানি ভরা করুণায়
যেতে ত পার না তুমি ছাড়িয়া আমায় ?
তাই ভাবি, ভাবি আর বহে আঁখিধার
কবে পুনঃ দেখা হবে তোমার আমার ?
করতলে গণ্ড রাখি মুরতি চিন্তার—
ঐ দাঁড়াইয়া পাশে প্রাণেশ তোমার।
কভু নাম ধরে ডেকে সরমে আকুল,
কভু পাগলের মত কহে কত ভুল ।
পাঁচ বছরের ছেলে না হেরে তোমায়
"কোথা মা" বলিয়া ভুমে গড়াগড়ি যায় ।
মরি মরি—শুকায়েছে কচি মুখখানি
প্রভাতে তারাটী যেন অশ্রুবদ্ধবাণী ।
এস গো বারেক এস—দেখ গো আসিয়া,
কি শোকের ছবি তুমি গিয়াছ আঁকিয়া ।
কিম্বা না—মা—কাজ নাই আসি ভবতলে,
শোক—তুষানল হেথা নিরন্তর জ্বলে,
বাসে হলাহল ছুটে হেথা কুসুমের !
নিঃশ্বাসে প্রলয় হয় হেথা মানুষের ।
দারুণ কৃতান্ত সদা ঘটায় জঞ্জাল,
মাধবীরে লয় হরি বধিয়া রসাল ।
বৃন্ত কাটি নষ্ট করি প্রসূন সুন্দর,
ব্যথা দেয় নিরন্তর মধুর ভ্রমর ।
তাই বলি, থাক ভগ্নি ! শান্তি নিকেতনে,
অবশ্য সময়ে তোমা হেরিব নয়নে ।

শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী



কুমার জ্ঞানরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ।

সেইজন্য অন্য আর একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৺গৌরাঙ্গদেবের নামে মহারাণীমাতা ৬৬১৮০৲ আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছেন তাহার নাম ব্রজবালা ট্রাষ্ট ষ্টেট। তাহা হইতে ৺গৌরাঙ্গদেবের পূজা, উৎসব, অতিথিসেবা ও কৃষ্ণচন্দ্রকলেজের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। এ জেলায় উচ্চশিক্ষার অভাব দেখিয়া মহারাণীমাতা ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার শ্বশুরের নামে নামকরণ করিয়া উক্ত কৃষ্ণচন্দ্রকলেজ স্থাপন করেন।(১)

১৩০৩ সালের ২২শে বৈশাখ তারিখে বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত মহারাজকুমার সদানিরঞ্জনের এবং ঐ বৎসর ২৮শে বৈশাখ তারিখে নদীয়াজেলার অন্তর্গত মেটিয়ারী গ্রামের সুবিখ্যাত ও সুপরিচিত বীর রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত রামরেণু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত মহারাজকুমারী রাসবালার বিবাহ হয়। পরবৎসর অর্থাৎ ১৩০৪ সালের ২৭শে আষাঢ় যশোহর জেলার অন্তর্গত নলডাঙ্গার রাজা শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ দেব রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার পন্নগভূষণ দেব রায়ের সহিত কনিষ্ঠ মহারাজ-কুমারী অমিলাবালার এবং ১৩০৫ সালের ১লা ফাল্গুন মহারাজ নন্দকুমারের বংশধর কুমার দুর্গানাথের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত মহারাজকুমার কমলানিরঞ্জনের বিবাহ হয়।

১৩০৭ সালের ১৩ই কার্ত্তিক মহারাজকুমার সদানিরঞ্জনের কন্যা প্রমোদবালার জন্ম হইয়াছে। ১৩১০ সালের ২৯শে বৈশাখ উত্তরপাড়া নিবাসী রায়বাহাদুর

(১) "It is very charming to hear of the foundress Ranee Padmasundari Devi—to whom the idea and the endowment of the College are entirely due. It is difficult to comprehend, how a conception of the value of education, that was worthy of the nation-builders of Germany and Japan, could have penetrated behind the purdah of a remote Rajbari, in the heart of of Bengal, before it had come to be dreamt by a few of the most enlightened of the Bengali men, as a distant ideal to be aspired after but never materialised. * * * She actually invested her whole property in that education which was to bring about the salvation of her country."

Report of the Calcutta University—1908.

শ্রীযুক্ত জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত মহারাজপৌত্রী ভানুবালার বিবাহ হয়।

১৩১১ সালের ১১ই ভাদ্র কমলানিরঞ্জনের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম বিশ্বরঞ্জন।

সন ১৩১৪ সালের ৩রা পৌষ তারিখে ভানুবালার পুত্র প্রসাদকুমারের জন্ম হয়।

মহারাজকুমারী ভূপবালা

জ্যেষ্ঠ মহারাজকুমারী ভূপবালা দেবীর অনেক বয়স পর্য্যন্ত সন্তান হয় নাই। ১৩১২ সালে মহারাজবাহাদুর সপরিবারে শ্বশুরালয় দাঁড়কা গ্রামে নিজভবন রামনিকেতনে গমন করেন। তথায় দ্রাবিড়ের এক জ্যোতিষীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। জ্যোতিষী মহারাজকুমারী ভূপবালার হাত দেখিয়া বলেন যে, ইঁহার নামে শান্তি করাইলে নিশ্চয়ই সন্তান হইবে। সে সময় গ্রন্থকার তথায় উপস্থিত ছিলেন। শুধু উপস্থিত নয়, জ্যোতিষীর বাক্যে সন্দিহান্ হইয়া তাঁহাকে একটু শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করেন। জ্যোতিষী তাহা বুঝিতে পারিয়া সগর্ব্বে বলিলেন, "আমি অর্থের লোভে শান্তি স্বস্ত্যয়নের কথা বলি নাই। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি আমার দ্বারা শান্তি করাইলে ইঁহার সন্তান হইবে।" তিনি আরও বলিলেন যে, যে দিন তাঁহার স্বস্ত্যয়ন সমাপ্ত হইবে, সেইদিন মহারাজকুমারীর স্বামী যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁহাকে ঐ স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে এবং শান্তিসমাপ্তির সাত দিন মধ্যে মহারাজকুমারীর গর্ভ-সঞ্চার হইবে। বস্তুতঃ জ্যোতিষী যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, কার্য্যেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। ভূপবালাদেবীর সন্তান হইবার আশায় জনক-জননী নিরাশ হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি গর্ভবতী হওয়ায় তাঁহাদের নিরাশ অন্তঃকরণে আশার সঞ্চার হইল। নিরাপদে প্রসব হইবার জন্য ভূপবালাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হয়। তথায় ১৩১৩ সালের ৩রা অগ্রহায়ণ তারিখে তাঁহার কন্যা আশালতার জন্ম হয়।

মহারাণী পদ্মসুন্দরীর মৃত্যু

হেতমপুরে সন্তানপ্রসবের সংবাদ আসিলে, মহারাজা ও মহারাণীর আনন্দের সীমা রহিল না, তিন চারিদিন মধ্যে কলিকাতায় যাইয়া দৌহিত্রীমুখ দর্শন করিবেন বলিয়া তাঁহারা দিনস্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু কেমন বিধির বিড়ম্বনা! মহারাণী পদ্মসুন্দরী হঠাৎ ১৩১৩ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ রাত্রি ১১টার সময় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং ঐ রাত্রিতেই ১২॥০ টার সময় তাঁহার তৃতীয় পুত্রবধূর ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা করিয়া ৫৩ বৎসর বয়সে তিনি নরজগৎ





কুমার প্রজ্ঞানরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

ত্যাগ করিলেন। মহিষীর প্রাণের আশা মিটিয়াও মিটিল না, নবকুমারীর জন্মসংবাদ পাইয়াও তাহাকে একটিবার দেখিতে পাইলেন না।

যে রাত্রে তাঁহার মৃত্যু হয়, সেই সময় মহারাজকুমার সত্যনিরঞ্জন ও সদানিরঞ্জন ভূপবালার শুশ্রূষার জন্য কলিকাতায় ছিলেন, সুতরাং তৃতীয়পুত্র মহিমানিরঞ্জনের দ্বারা মাতৃদেবীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

বিপদ্ বিপদের অনুগমন করে। এদিকে এই মহাবিপদ্, ইহার কিছুদিন পরেই আবার কলিকাতা হইতে সংবাদ আসিল যে, ভূপবালা হঠাৎ মেনিন্‌জাইটিস্ রোগে আক্রান্ত হইয়া বিগত ১৯শে অগ্রহায়ণ (১৩১৩ সালে) প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত অমায়িক ছিল। তাঁহার ভ্রাতাভগিনী প্রীতি অত্যধিক মাত্রায় দৃষ্ট হইত। তিনি জনকজননীকে প্রকৃতই ভক্তি করিতেন। পরিচারক-পরিচারিকাগণকে তিনি স্বীয় জনকজননীর শুশ্রূষা করিতে দিতেন না, তিনি স্বয়ং তাঁহাদের সেবা করিয়া প্রীতিলাভ করিতেন। মাতৃদেবীর পরলোকে শুশ্রূষার অভাব হইবে মনে করিয়াই যেন তিনি মাতৃসেবার জন্য জননীর অনুগমন করিলেন। মহারাজকুমারী-ভূপবালার মৃত্যু

১৩১৫ সালের ৩০শে আষাঢ় তারিখে মহারাজ-পৌত্র জ্ঞানরঞ্জন ও ব্রহ্ম-নিরঞ্জনের যথাক্রমে উত্তরপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ও বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রীর সহিত বিবাহ সম্পন্ন হয়।

১৩১৬ সালের ৬ই ফাল্গুন তারিখে খানাকুল কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পৌত্র শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন রায়ের পুত্র শ্রীধরণীমোহন রায়ের সহিত মহারাজপৌত্রী প্রমোদবালার শুভ পরিণয় হয়।

মহারাজবাহাদুর ও মহারাণীমাতা যে সকল সংকার্য্য করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলি প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য সংকার্য্য এই স্থানে লিপিবদ্ধ হইল। বিদ্যাশিক্ষার বহুল প্রচারে ও অতিথিসেবায় মহারাজের বিশেষ অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়।(১) মহারাজ ১৮৬৯ খৃঃ জুলাই মাসে হেতমপুরের মডেলস্কুলটীকে এনট্রান্স স্কুলে পরিণত করেন। তাঁহার জমিদারীর মধ্যে সাঁওতালপরগণার অন্তর্গত আমজোড়া গ্রামে একটী মাইনর স্কুল স্থাপন মহারাজ ও মহারাণীর সৎকার্য্য

(১) ১৯১২ খৃঃ ১৮ জুনের "Bengalee"তে প্রকাশ—

"The Rajah's beneficence is well-known; and his zeal for the spread of education has already made his name a household word in his own district".

করেন। আমজোড়ার অদূরে মৌরক্ষী নদী প্রবাহিতা, সেই জন্য বর্ষাকালে ছাত্রগণের পারাপারের বিশেষ কষ্ট হইত বলিয়া উক্ত স্কুলটী নদীর উত্তর তীরের অনতিদূরে রাণীগ্রাম নামক স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। সংস্কৃত অধ্যাপনার নিমিত্ত মহারাজ হেতমপুরে একটী চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বীরভূম ও সাঁওতালপরগণা জেলাস্থ অনেক স্কুলে মাসিক সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। হেতমপুর স্কুল হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে যে ছাত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়া থাকে, তাহাকে টেলারস্ স্কলার্সিপ্ নামক একটী বৃত্তি দেওয়া হয়। এতদর্থে তিনি ১৫০০৲ টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তে গচ্ছিত রাখিয়াছেন, তাহার সুদ হইতে এই বৃত্তি প্রদত্ত হয়। ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে ৫ই ফেব্রুয়ারী তদানীন্তন ছোট লাট স্যার এ, ম্যাকেঞ্জি দুমকায় শুভাগমন করিলে, মহারাজা তাঁহার নামে একটী ম্যাকেঞ্জি মেডেল প্রদত্ত হইবার জন্য ৫০০৲ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন। তাহার সুদের আয় হইতে, দুমকা স্কুলের যে ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উচ্চতম স্থান অধিকার করে, তাহাকে এই মেডেল প্রদত্ত হইয়া থাকে।(১)

৺রাধাবল্লভজীউর ভোগ হইতে এক আনা দক্ষিণা সহ একুশ জন ব্রাহ্মণ ভোজনের নিয়ম আছে। ৺গৌরাঙ্গদেবের মন্দিরেও অতিথি অভ্যাগত আহার পাইয়া থাকেন। ৺বৃন্দাবনধামে শ্রীশ্রী৺রাধারাসবিহারী জীউর দিবসে অন্ন ও

(১) Dumka
5th Feb. 1898.

To

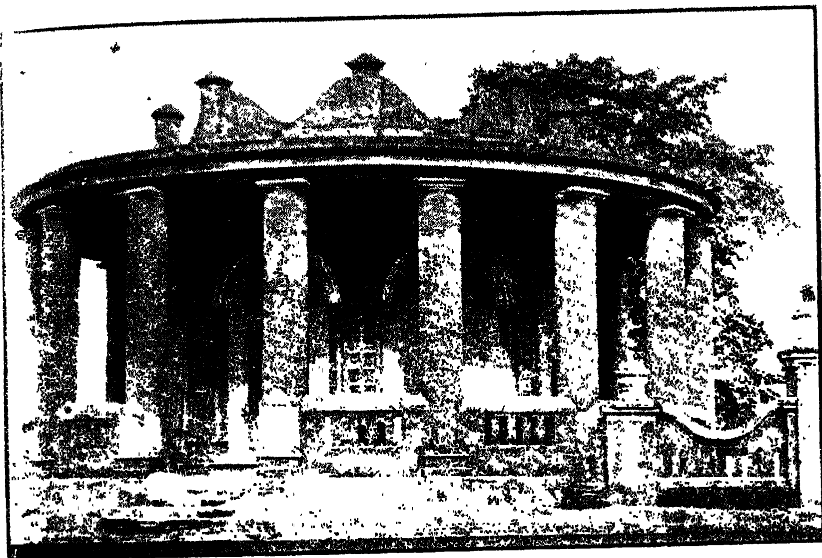
R. Carstairs Esq. C. S.

Dear Sir,

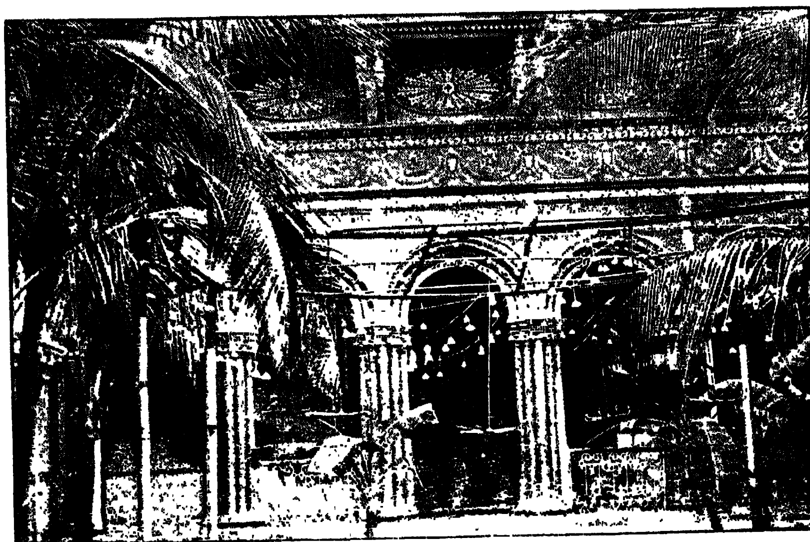
* * * * *

To commemorate this occasion, so very grateful to our feelings, I ask the favour of your procuring the permission of His Honour to the endowing of a sum of Rs 500, out of the interest whereof a permanent annual prize in the shape of a medal may be awarded to that student of the Dumka Govt. School who may stand highest in the Calcutta University Entrance Examination, the prize being called the "Mackenzie Medal."

I remain, Dear Sir, Yours faithfully
Ram Ranjan Chakravarty.



হেতমপুর—দাতব্য চিকিৎসালয়।



হেতমপুর—শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের মন্দির

রাত্রে লুচি, কচুরির ভোগ হইয়া থাকে। সেই ভোগ হইতে দিবসে নয় জন অভ্যাগত ও রাত্রে সাত জন ব্রাহ্মণের আহার পাইবার ব্যবস্থা আছে; তন্মধ্যে রাত্রের ব্রাহ্মণগণ এক আনা করিয়া দক্ষিণা পাইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার পীড়িত প্রজাগণের উপকারার্থে মহারাজ হেতমপুরে এলোপ্যাথিক, (১) হোমিওপ্যাথিক এবং আয়ুর্ব্বেদিক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন।

মহারাজবাহাদুর উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণের অবস্থান জন্য রাজপ্রাসাদের সম্মুখেই গেষ্টহাউস (বর্ত্তমান "মহারাজ ভবন") নামক একটী সুসজ্জিত দ্বিতল ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন; ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য ১২৯০ সালে আরব্ধ হইয়া ১২৯৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সমাপ্ত হয়। মহারাজ গ্রামের বাহিরে রঞ্জনপ্রাসাদ নামক একটি সুন্দর অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া ১৯০৫ সালের ২২শে জুন তারিখ হইতে তন্মধ্যে সপরিবারে বাস করিতেছেন। মহারাজ তাঁহার সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুর পর মহারাণীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ৺বৃন্দাবনধামে ও হেতমপুরে যথাক্রমে ১৩১৪ সালের ১৬ই পৌষ ও ২রা ফাল্গুন তারিখে দুইটী শ্বেত প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।(২) নিত্য তথায় ভোগ হয় এবং শ্রীধামে পৌষমাসে ও হেতমপুরে অগ্রহায়ণ মাসে ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালী ভোজন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত তিনি সিহুরীতে Lady Curzon Hospitalএ ৩০০০৲ টাকা দান করিয়া তন্মধ্যে রাণী পদ্মসুন্দরী ওয়ার্ড নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন; এবং তথায় আরও ১০০০০৲ টাকা দান করিয়া তাহার সুদের আয় হইতে

মহারাণীর শ্বেত-প্রস্তরের প্রতি-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা

(১) স্থাপনের তারিখ ১৮৭৪ খৃঃ ২০শে জুন।

(২) ৺বৃন্দাবনস্থ মন্দিরের স্মৃতিফলকের উপর নিম্নলিখিত কবিতা লিখিত আছে।—

সার হয়েছে আমার শুধু আঁখিজল।
আমার আশাবাসা ভেঙ্গে গ্যাছে মন হয়েছে বিচঞ্চল॥
ভবমরুমাঝে কল্পলতা সমা, ছিল স্নেহময়ী করুণাপ্রতিমা,
ভাগ্যদোষে হায় হারাইয়ে সে মা, হেরি সব শবপুরী জলস্থল॥
আজনম সুখে ছিনু মত্ত হয়ে, মায়ের সোহাগে গ্যাছে দিন বয়ে,
অকরুণ বিধি নিরমম হিয়ে, সাধে বাদ সাধি হরিল সম্বল॥
আছে সব কিন্তু শুধু মা বিনে, সব শূন্যময় নেহারি নয়নে,
মা মা বলে আঁখি ভাসে নিশিদিনে, মনমাঝে যেন জ্বলে দাবানল॥
আর কেন ভবে কেঁদে কেঁদে মরি, মা মা বলে সদা ফেলি নেত্রবারি,
মিনতি শ্রীহরি যেন শীঘ্র করি, করিছে শ্রীহরি বলে হরিবোল॥

ভাগ্যহীন মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

যাহাতে কয়েকটি রোগিণী তথায় থাকিয়া চিকিৎসিত হইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন।(১) ১৯১২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ভারতেশ্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ সম্রাজ্ঞী মেরী সহ কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছিলেন; সেই সময়ে লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য হেতমপুরাধিপতি পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা সম্রাজ্ঞীর হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন।(২) হেতমপুরাধিপতি নানা সদ্‌গুণাবলী, সৎকার্য্য ও বদান্যতার জন্য ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন সদাশয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "মহারাজ" উপাধিতে ভূষিত হন।(৩) এই নব উপাধি প্রাপ্তিতে বঙ্গের গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল এবং বঙ্গের শেষ লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর Sir. F. W. Duke এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে ধন্যবাদসূচক টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছিলেন।(৪)

(১) বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার T. H. E. Garret সাহেব লিখিয়াছেন—

"Thanks to the munificence of the Rajah Bahadur of Hetampur, his handsome donation of Rs 10000/ for investment on behalf of the Hospital has placed the institution on a satisfactory financial condition.

(২) এই সম্বন্ধে তদানীন্তন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর Sir. F. W. Duke যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত হইল—

Belvedere Calcutta.
2nd Janu. 1912

Dear Rajah Bahadoor,

I have been informed by His Excellency the Governor General that Her Imperial Majesty has been graciously pleased to accept your generous donation of Rs 50,000, which will be devoted to charities. I am commanded to convey to you Her Imperial Majesty's appreciation and thanks for this great act of signal generosity.

Yours sincerely
F. W. Duke.
(Lieutenant Governor of Bengal)

(৩) ১৪ই জুন তারিখে Government of India, Foreign Department, 1263 I. B পত্র দ্বারা এই উপাধিপ্রাপ্তি জ্ঞাপিত করিয়াছিলেন।

(৪) তন্মধ্যে গবর্ণর ও লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের টেলিগ্রাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

হেতমপুরাধিপতির "মহারাজ" উপাধি প্রাপ্তি যে সকলের অতীব সন্তোষজনক হইয়াছে, তাহা অনেকানেক সংবাদপত্রের মন্তব্য হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়।(১) হেতমপুরবাসী প্রজাগণ এ সুখ সংবাদকে কিরূপ আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত।(২) তাঁহার "মহারাজ" উপাধি প্রাপ্তিতে তাঁহার কর্ম্মচারিবৃন্দ, পত্তনীদারগণ এবং প্রকৃতিবর্গ সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন।(৩)

হেতমপুরাধিপতির "মহারাজ" উপাধি প্রাপ্তি

গবর্ণর প্রেরিত টেলিগ্রাম।

Darjeeling 13, 19—40

Maharajah Ram Ranjan Chakravarti—Hetampore.

I Congratulate you heartily on the honour done you by Government in bestowing upon you the title of Maharajah.

Governor
Bengal.

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর প্রেরিত টেলিগ্রাম।

Darjeeling, 14 June.

Maharaja Ram Ranjan Chakravarty—Hetampore.

Hearty congratulations on your well deserved honor.

(১) "বেঙ্গলী"তে প্রকাশ—

"The conferring of the title of Maharaja upon the Rajah of Hetampur is also a very popular step."

Bengalee, June 18, 1912.

(২) "The news of the well-merited distinction of Maharaja, conferred by Government on our beloved Rajah Bahadoor of Hetampur was received by the public with great acclamation. A meeting was convened and Sankirtan Parties from different parts of the village went in a procession to the Ranjan Palace to greet the worthy Maharaja Bahadur."

Bengalee, June 12, 1912.

(৩) The officers, tenants & Pattanidars of Hetampur Raj held a celebration, on the 30th ultimo, in honour of Raja Bahadur

মহারাজ পিতৃপুরুষের ন্যায় কুলদেবতা রাধাবল্লভ জীউর একান্ত অনুরক্ত ভক্ত। তিনি নিত্য পূজা ও হোম না করিয়া জল গ্রহণ করেন না। প্রজাগণকে ও অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণকে মহারাজ পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করেন।(১) পিতৃপুরুষগণের ন্যায় তিনিও কবিত্বশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার রচিত একটী গীত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গীত

দেখা দাও হরি, গোলকবিহারী, অভাজনে করি করুণা।
সর্ব্বদা অস্থির, তিল নহে স্থির, তব পদে মন ধায় না॥
না জানি ভজন আমি মূঢ়মতি, দয়া কি হবে না অধমের প্রতি,
ওহে শ্রীপতি!
নিজগুণে দয়া—করি, দাও পদছায়া, (আমি) অন্য ধন কিছু চাই না॥
তুমি সারাৎসার, সর্ব্বমূলাধার, তোমারে ভজিতে কি শক্তি আমার,
আমি দুরাচার,
আসি হৃদ্‌পদ্মাসনে, কমলার সনে, কমলায় কি দেখা দিবে না (২)॥

ছোট তরফ অতঃপর আমরা ছোট তরফের বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইব। পূর্ব্বেই

Ram Ranjan Chakravarty's elevation to the rank of Maharaja. There was a procession of elephants and sawars and the Maharaja Bahadoor was garlanded in the Durbar Hall, where an address was presented to him. A display of fireworks followed by feeding of the poor concluded the proceedings.

Statesman, 6th July, 1912

(১) He has always been known to the Goverment officials as an upright and honest Zamindar. Unwilling to drive the screw for turning an extra rupee he has always enjoyed the esteem and friendship of the civil officers of the district. * * He treats his subjects with great kindness and consideration. The idea never enters into his head that they are so many milch cows who should be mercilessly milked for his benefit.

(Indiana, May—Septr. 1912) বিশেষ বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

(২) কমলা মহারাজের কনিষ্ঠ পুত্র। মহারাজের সমস্ত গানে উক্ত পুত্রের নামে ভনিতা আছে

বলিয়াছি, রাধানাথ ও কুচিল দুই ভ্রাতা পৃথক্ হইলে দুইটি শাখার উৎপত্তি হয়। কুচিলের বংশধরগণই ছোট তরফ বলিয়া অভিহিত। ইতি পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, বীরভূমের অন্তঃপাতী কানাইপুরের আচার্য্যদের বাটীতে কুচিল চক্রবর্ত্তীর বিবাহ হয়। তাঁহার চারিপুত্র ও পাঁচ কন্যা, পুত্রগণের নাম রামদয়াল, রামতনু, বেণীমাধব ও রামকৃষ্ণ এবং কন্যাগণের নাম ধনমণি, কস্তুরীমণি, প্যারীমণি, হরমণি ও ধীরমণি।

বেণীমাধবের চারিপুত্র ও চারি কন্যা, পুত্রগণের নাম রাজবল্লভ, কালাচাঁদ, নবীন ও প্রসন্ন এবং কন্যাগণের নাম গগণমণি, সুকুমারী, মেনকা সুন্দরী ও মনমোহিনী।

রাজবল্লভের ছয়পুত্র ও দুই কন্যা, পুত্রগণের নাম ক্ষুদিরাম, চিন্তামণি, মহেন্দ্র, হরিশরণ, আশুতোষ ও শিবচন্দ্র এবং কন্যাদ্বয়ের নাম দীনতারিণী ও আনন্দময়ী।

ক্ষুদিরামের এক পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রের নাম ভক্তিভূষণ এবং কন্যাত্রয়ের নাম পার্ব্বতী, লাবণ্যময়ী ও শৈলেশ্বরী।

চিন্তামণির একপুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রের নাম বাগাল এবং কন্যাদ্বয়ের নাম গৌরমণি ও ভোলাদাসী।

মহেন্দ্রনারায়ণের দুই পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম গৌরসুন্দর ও বাদল এবং কন্যাত্রয়ের নাম সাবিত্রী, সতী ও জ্যোতির্ম্ময়ী।

হরিশরণের এক পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রের নাম শান্তিরাম এবং কন্যাত্রয়ের নাম রাসমণি, লাবণ্যময়ী ও জপেশ্বরী।

আশুতোষ বাবুর তিন পুত্র ও চারি কন্যা। পুত্রত্রয়ের নাম—কালিদাস, সত্যকিঙ্কর, হরিবোল ও গৌরবোল এবং কন্যাগণের নাম ষষ্ঠীমণি, সুরধুনী, সুবাসিনী ও সরোজিনী।

শিবচন্দ্রের চারিপুত্র ও এক কন্যা। পুত্রগণের নাম পঞ্চানন, ধর্ম্মদাস, পরমানন্দ ও গোঁসাইদাস এবং কন্যাটী শিশু।

বেণীমাধব বাবুর অপর পুত্র—কালাচাঁদের এক পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রের নাম নীলমণি এবং কন্যাদ্বয়ের নাম মাতঙ্গিনী ও সুখদাসুন্দরী।

নীলমণি বাবুর তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা। পুত্রত্রয়ের নাম পূর্ণচন্দ্র, গৌরীশঙ্কর ও কৃষ্ণগোপাল এবং কন্যাগণের নাম কুড়নমণি, ননীবালা, মঙ্গলবালা, বিমলা ও কৃষ্ণভামিনী।

কুচিল চক্রবর্ত্তীর অপর পুত্র রামকৃষ্ণের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রদ্বয়ের

নাম গোপীবল্লভ ও ছকড়ি এবং কন্যাদ্বয়ের নাম থাকসুন্দরী ও মর্ম্মসখী। গোপী-বল্লভ সুন্দর বেহালা বাজাইতে পারিতেন। গোপীবল্লভের এক পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রের নাম দুর্গাদাস এবং কন্যাত্রয়ের নাম রামপ্রিয়া, অক্ষয়কুমারী ও দক্ষবালা।

দুর্গাদাস বাবু একজন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট। দুর্গাদাস বাবুর চারিপুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রের নাম হরিপদ, কমলাপদ, অভয়াপদ ও উমাপদ এবং কন্যাদ্বয়ের নাম অচিন্ত্যময়ী ও রাধামণি।

রামকৃষ্ণ বাবুর অপর পুত্র ছকড়ি অতি রসজ্ঞ পুরুষ ছিলেন, তাঁহার তিন পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রগণের নাম গুরুদাস, হরিদাস ও বৈদ্যনাথ এবং কন্যাদ্বয়ের নাম রাজলক্ষ্মী ও পূর্ণলক্ষ্মী।

গুরুদাস অতি ধর্ম্মভীরু ও শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি। তাঁহার একপুত্র ও ছয়-কন্যা। পুত্রের নাম পাতু ও কন্যাগণের নাম গতিদায়িনী, পাঁচুদাসী, হরিদাসী, আর্ণাকালী, অর্পণা ও কুন্তী।

হরিদাস যুবা বয়সেই মারা গিয়াছেন, তাঁহার কোনও সন্তান সন্ততি নাই।

বৈদ্যনাথ বাদ্যযন্ত্রে বিশেষ পারদর্শী, ঢোল, তবলা, পাখোয়াজ তিনি অতি সুন্দর বাজাইতে পারেন। বৈদ্যনাথের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম ধ্বজাধারী ও বংশীধারী এবং কন্যাদ্বয়ের নাম, ননীবালা ও তারাদাসী।

ছোট তরফের ক্ষুদিরাম বাবু একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি অল্প বয়সে বাঙ্গালাভাষায় বিশেষ সুশিক্ষিত হইয়া উঠেন এবং ইহা ছাড়া ইংরাজী, সংস্কৃত, ও পারস্য ভাষায়ও ইঁহার অধিকার ছিল। ক্ষুদিরাম বাবু একজন স্বভাব-কবি। তাঁহার রচিত "পুষ্পাঞ্জলি" নামক একখানি কবিতাপুস্তক আছে। দুঃখের বিষয় তিনি এই পুস্তকের ১ম ভাগ মুদ্রিত করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তিনি উক্ত পুস্তক মহারাজ রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরকে উপহার দিয়াছিলেন। সেই উপহারকবিতা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

'ভক্তি-উপহার'

শ্রীরাধাবল্লভ পদে মানস মধুপ যাঁর
নিমগন, জ্ঞান যাঁর হরিপাদপদ্মসার॥
যাঁর চিত্ত সদা শুদ্ধ ভক্তিপ্রসূন সুবাসে।
পুঞ্জ পুণ্যফলে যাঁর গোকুল-আনন্দ বাসে॥

জন-পালয়িতা সেই দীনদুঃখহারী ভূপ।
দুর্ব্বাদলশ্যাম রাম যেন গৌর রামরূপ॥
প্রতিচ্ছত্র-আদি দ্বি অক্ষরে রাম নরপতি।
উপান্তে তৃতীয় কান্ত- বামে শোভে রামসতী॥
সম্বরি মরতলীলা লভেছ আরাম রাম।
রামশূন্য করি মাতঃ গিয়াছ অমরধাম।
তথাপি বিরাজে রাজ- দম্পতিরূপ সুষমা।
কিঙ্কর মানসে সেই রামসনে রামরমা॥

আশুতোষ ও কনিষ্ঠ শিবচন্দ্র অগ্রজ ক্ষুদিরামের ন্যায় গুণসম্পন্ন না হইলেও সঙ্গীত রচনায় তাঁহাদেরও বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায়। বংশবিস্তার হেতু ছোট তরফের এক্ষণ অবস্থা হীন হইয়াছে, তবে তাঁহারা প্রায় সকলেই রাজবাটী হইতে কোন না কোন প্রকারে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

নিম্নে আশুতোষ ও শিবচন্দ্ররচিত দুইটী সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল :—

"আশুতোষ বাবুর গীত"

গীত।

আসিয়াছি ভবে যেতে হবে কবে
জানি না হে হরি কবে বা সেদিন।
হলো না ভজন, হলো না সাধন,
ক্রমে দিন দিন, তনু হল ক্ষীণ॥
বাল্যকাল গত বাল্য-চাপল্যেতে,
যৌবনকাল গত রঙ্গতামাসাতে,
প্রৌঢ়কাল গত বিষয় কর্ম্মেতে,
বৃদ্ধকালে জরা কৈল শক্তিহীন॥
আজ'কাল করি হ'ল না সাধন,
হেলায় হারালেম অমূল্য রতন
সেই গুরুদত্ত ধনের হলো না যতন,
মোহমায়াবশে হয়ে জ্ঞানহীন॥

এখন চিন্তা মম হয়েছে অপার,
এ দুস্তর সাগর কিসে হব পার,
আমি দুরাচার না জানি সাঁতার,
ভবপারাবারের সম্বলবিহীন ॥
তোমারে ভজিতে নাহি মম শক্তি,
কখন জানি না কেমন প্রেমভক্তি,
সর্ব্বলোকমুখে শুনি এই উক্তি,
দীনের প্রতি তোমার দয়া চিরদিন ॥
তব শ্রীচরণে এই আকিঞ্চন,
ধন জনে মম নাহি প্রয়োজন,
দিও শ্রীচরণ হে রাধারমণ,
শেষের সেদিন বড়ই দুর্দ্দিন ॥

"শিবচন্দ্রের গীত"

গীত—

পদে রেখো জননী।
ভজনবিহীন জনে করুণা করি ঈশানী ॥
ধনজন পরিজন, জীবন যৌবন মন,
এ সবে দিয়ে বিসর্জ্জন,
সার করেছি পা দুখানি ॥
শ্রীপদ্দ অধিক পদ, কি পদ সারসম্পদ,
পা দুখানি মোক্ষপদ
সুখশান্তি বিধায়িনী—
বিষ্ণুব্রহ্মাদি নারদ, পূজে সে কমলপদ,
দিয়ে জবা কোকনদ
আনন্দে দিবারজনী ॥
পদের মহিমা কত, শিব শবে পরিণত,
পা তলে হয়ে পতিত
হৃদে ধরেছে শিবানী।

বিপদে সম্পদে পদে, রাখি মতি প্রতিপদে,
অন্তিমে পেয়ে সে পদে
পার হব ভবতটিনী ॥
নিরন্তর ভাবি শ্রীচরণ, বিষয়বিষে দিই বিসর্জ্জন,
পদে আত্মসমর্পণ—
করি, জুড়াই তাপিত প্রাণী।
আমি অতিমূঢ়মতি, না জানি ভজনস্তুতি,
পদে যেন থাকে মতি
ভক্তিমুক্তি-প্রদায়িনী ॥

বর্ত্তমান সময়ে হেতমপুরে চক্রবর্ত্তী বংশের মধ্যে যে সকল কবি আছেন প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও যে দুই এক জন সুকবি হেতমপুরে বর্ত্তমান ছিলেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যক। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত রমানাথ মুখোপাধ্যায় তন্মধ্যে প্রধান।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য একজন সুকবি ছিলেন। কবির গান রচনায় তাঁহার বিশেষ নিপুণতা দৃষ্ট হইত। তিনি সরল-হৃদয় মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন, জগতের কুটিলতা ছল চাতুরী তাঁহার পবিত্র হৃদয়কে কখন স্পর্শ করিতে পারে নাই। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে প্রতাপচন্দ্র আনন্দমোহন ভট্টাচার্য্যের পুত্র। প্রতাপ ১৩০০ সালে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা নবমীতে প্রায় সপ্তুতি বর্ষ বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন। তৎপ্রণীত একটী গীত নিম্নে প্রদত্ত হইল :— প্রতাপচন্দ্র

কবি প্রতাপচন্দ্রের গীত।

নিমন্ত্রণে, ব্রজ গোপীর মনে, ব্যথা দিয়া যাবনা। সব সঙ্গিনী সঙ্গে করে, বিবর্ণ হয়ে, পূর্ণ চন্দ্রাধরে, রয়েছেন রাই রথচক্র ধরে; না লয়ে রাধার আজ্ঞে, যদি যাই কংস যজ্ঞে, স্বকার্য্য সাধন কর্ত্তে পারবো না॥ ব্রজের ভাব, মধুর ভাব, মাধুর্য্য ভাব, ভাবের নাই তুলনা। আজি দ্রুতগতি তুমি রথে, যেতে চাও মথুরার পথে, অশ্ব বেগেতে, ধনুর্ম্ময় যজ্ঞেতে। গোপাঙ্গনা গোকুল-পানে, পশ্চাতে প্রেমরজ্জুটানে, আঘাত করে গোপীর প্রাণে, পারি কই যেতে। মনে করি যাই মথুরায়, আবার এ মন বৃন্দাবনে ধায়; আমার প্রাণ বলে যেওনা হে যেওনা॥

শুনে অক্রুর মুনির কথা শ্রীকৃষ্ণ বলেন অক্রুরকে, অচল রথ, দেখ বন্ধ রাজপথ, করেছে বন্ধ গোপীকে ; আজ রথযাত্রা নিরখিয়ে, নয়ন-জল জলধি হয়ে, ভাসালে গোকুল, গোকুলের সব গোপীকুল ; মনে হয়ে বিচ্ছেদ-চিন্তে, চিন্তেমনি করেন চিন্তে, দেখে শুনে ভেবে চিন্তে, হলাম শোকাকুল ; যদি সান্ত্বনা করে গোপীগণে পার ভুল'তে তবেই ত যাত্রা হয় নইলে যাত্রা হয় না।

রাধার পাদপদ্ম মধু পেয়ে, গোকুলে গো, আছে মন মধুকর মুগ্ধ হয়ে ; সুধাময় শ্রীবৃন্দাবনে, রাধার প্রেমসুধা বিতরণে, একান্ত মননে, আছি সযতনে ; হয়ে অবাধ্য রাধার, সামান্তে আমার, হয় কি যাত্রা কংসালয়ে ; শক্তি-রূপিণী রাই শক্তি, সকল প্রকৃতির মূলাধার, যার তরে, গোলক ত্যজ্য করে, হলেম ব্রজে, কৃষ্ণ অবতার ; নাই তোমার মনে কোন ক্রুর, মুনির শ্রেষ্ঠ তুমি অক্রুর, বিষ্ণু পরায়ণ জান সকল বিবরণ ; এক আত্মা রাধা শ্যামে, বিভিন্ন নয় কোন ক্রমে, কেমন করে ছিড়ি প্রেমে ভঙ্গ দিই এখন ; আবার বাৎসল্যে, যশোদা মা আমারে, যেতে দেন বাধা, কিন্তু না গেলেও মা দেবকী বাঁচে না॥

রমানাথ শ্রীযুক্ত রমানাথ মুখোপাধ্যায় ভাবুক ও স্বভাবকবি ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি হেতমপুর মহারাজার স্কুলে শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি অধ্যবসায় গুণে ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিচক্ষণতা লাভ করিয়া উক্ত স্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের পদে উন্নীত হন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন প্রশংসার সহিত উক্ত পদে কার্য্য করেন। কাব্য রচনায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা ছিল ; গভীর ভাবপূর্ণ কবিতা রচনায় তাঁহার যেরূপ ক্ষমতা দৃষ্ট হইত হাস্যোদ্দীপক কবিতা প্রণয়নেও তিনি সেইরূপ নিপুণ ছিলেন। তৎপ্রণীত দুইটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—

(১)

অসার সংসারে শুধু শ্যামা পদ সার রে।
কিছু নাই আমার ভবে সব শ্যামা মার রে॥
শ্যামা মুক্তি গতি, নিয়ম নিয়তি, শ্যামা ধাত্রী বিধাতার রে।
শ্যামা আধার আধেয়, শ্যামা জ্ঞান জ্ঞেয়,
শ্যামাময় ত্রিসংসার রে॥

শ্যামা ধ্যান ধন, শ্যামা প্রাণ মন,
শ্যামা বুদ্ধি অহঙ্কার রে।
শ্যামা সাধনের যন্ত্র, শ্যামা সিদ্ধ মন্ত্র,
শ্যামা সারতন্ত্র রমার রে॥

(২)

হাস্‌ব কি কান্দব ওগো বল দেখি আমায়।
যত বুট পরা কোট পরা বাবু ভোট মেগে মেগে বেড়ায়॥
কেও জড়িয়ে পৈতে হাতে, বুলায় হাত কসাইয়ের মাথে,
কেও হিন্দু হোয়ে ভোটের দায়ে ফয়তা দিতে চায়॥
কেও বা ডাকে মুচি ভায়া আছে হে ঘরে,
দেখ আছে ভিখারি এক দাড়িয়ে দ্বারে,
ঝকমারি একি শুধারি মাতৃদায় না পিতৃদায়॥

কাব্য-রচনা ব্যতীত তিনি গদ্য রচনাতেও বিশেষ পটু ছিলেন। তিনি অতি হৃদয়বান্, ন্যায়পর ও সত্যপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। আজীবন জ্যেষ্ঠের সহিত এক অন্নে বাস করিয়া ছিলেন। এক দিনের জন্যও কোনরূপ মনান্তর কেহই লক্ষ্য করেন নাই; পাপপূর্ণ সংসারে সাধু ব্যক্তিগণের পরমায়ু অচিরেই সমাপ্ত হয়। উক্ত কবিরও দশায় তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি হটাৎ বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া ১৩১৫ সালের ১১ই আষাঢ় অকালে কালকবলে পতিত হন। কবি রমানাথ ১২৭২ সালের ১৮ই বৈশাখ তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়।(১) তিনি মহারাজের ষ্টেটে জনৈক কর্ম্মচারি ছিলেন। রমানাথের একমাত্র তরুণ-বয়স্ক পুত্র কালিদাস মুখোপাধ্যায় এক্ষণে স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছেন। আশা করি তিনি পিতার পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন।

উল্লিখিত ব্যক্তি সমূহ ব্যতীত বরকতিপুরনিবাসী কায়স্থ-কুলোদ্ভব কিশোরী লাল সরকারের নাম এস্থলে উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করি। তিনি বহু অনুসন্ধানের পর হেতমপুর ও রাজনগরের লুপ্ত ইতিহাস অনেক পরিমাণে উদ্ধার করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'হেতমপুর কাহিনী' মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি কতিপয় নাটক লিখিয়াছেন, তাহাও বিশেষ প্রশংসা যোগ্য।

(১) জন্ম—১২২৮, মৃত্যু ১২৭৩— ২১শে ভাদ্র

বৃন্দাবনধাম গমন করেন। বৃন্দাবনে একটা বৃহৎ দেবালয় নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় নানাবিধ সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত করিয়া অষ্টসখী সহ "রাসবিহারী" মূর্ত্তি স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। ব্রজবাসী দিগকে ৴১৷০ পাঁচপোয়া ওজনের একটী করিয়া লাড্ডু ও তৎসহ একটী করিয়া আধুলি দেওয়া হয়। বৈষ্ণবদিগকে একখানি করিয়া সুন্দর বহির্ব্বাস এবং অন্ধ ও আতুরদিগকে আট হাত পরিমিত বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত আট দশ হাজার কাঙ্গালীকে দুই আনা করিয়া দান করেন এবং অবশেষে সুচারু রূপে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া তথায় প্রত্যহ ত্রিশ জন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজনের সুবন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছেন; এবং রাসবিহারী দেবের ভোগ ও শীতলেরও সুচারু বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

তৎপরে কাশীধামে আসিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের ঠিক উপরেই একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সৌভাগ্য-ক্রমে আমরা এই প্রতিষ্ঠা-কার্য্য-সময়ে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় উপস্থিত ছিলাম। এখানে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে নগদ ৬৲ ছয় টাকা করিয়া বিদায় দেওয়া হয় এবং দুই সহস্রেরও অধিক ব্রাহ্মণকে নানাবিধ অতি উপাদেয় আহারীয় দ্বারা ভোজন করাইয়া পরিতোষ করেন এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে আন্দাজ ১৲ একটাকা মূল্যের একটী করিয়া লোটা (পশ্চিমদেশীয় বড় ঘটী) দান করেন। আমরা সেই সময় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে বলিতে শুনিয়াছি যে "রাজকুমার যে কার্য্য করিলেন ইদানীং বাঙ্গালীর মধ্যে কোন বড় লোক এরূপ উচ্চ দরের সদ্ব্যয় কাশীতে করিয়া যান নাই।" তৎপর সন্ধ্যার সময় হইতে কাঙ্গালী বিদায় আরম্ভ করিয়া রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত প্রায় ৫।৬ হাজার কাঙ্গালীকে ৵০ আনা করিয়া দান করেন। আমরা দেখিয়াছি, স্বয়ং রাজকুমার সেই অজস্র জনতার মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রত্যেক কাঙ্গালীর গাত্রে হাত বুলাইয়া প্রীতি-সম্ভাষণে তাহাদের সন্তুষ্ট করিয়া-ছিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় সমস্ত দিবস উপবাস থাকিয়া স্বয়ং পরিবেশন করিয়া সকলকে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাঁহার সেই সর্ব্বদা হাস্যমুখ, প্রফুল্ল অন্তর, ক্রমান্বয় বিষম পরিশ্রমেও কিছুমাত্র কাতরভাব প্রকাশ করে নাই। বরং আরও যেন সে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিল। কাঙ্গালী-বিদায় যখন শেষ হইল তখন তিনি একটু দুঃখিত হইয়া বলিলেন "কৈ আর কি কাঙ্গালী নাই? আমার ইচ্ছা ছিল, সমস্ত রাত্র এইরূপ কাঙ্গালী বিদায় করিয়া কাটাইব? দেখ, চারিদিক্ দেখ আর কেহ বাকী আছে কি না?"

এই বলিয়া ব্যস্ত হইয়া নিজেই চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। সে ভাব—সে মনোমুগ্ধকর ভাব যিনি দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার ভীমসদৃশ আকৃতি, সুন্দর সুঠাম কলেবর এবং শান্তিপূর্ণ মুখমণ্ডল যখন সেই অজস্র জনতা ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল, তখন সমস্ত লোক বিদায়ী ফেলিয়া অচলভাবে ও নির্নিমেষে তাঁহাকেই নিরীক্ষণ করিয়াছিল। আমরা ভরসা করি, আগামী বারের বেদব্যাসে কুমারের সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া পাঠকগণকে পরিতুষ্ট করিতে পারিব। আমাদের বিশ্বাস, পাঠকগণ প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার এই অল্প বয়সে এরূপ অসামান্য রূপে ও গুণে নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবেন।

কুমার এইরূপে নানাবিধ সদনুষ্ঠান করিয়া বড়লাট সাহেবের লেভিতে যোগদান মানসে হতভাগিনী ভার্য্যাকে গৃহে প্রেরণ করিয়া পিতামাতা সহ কলিকাতায় আইসেন। এখানে কয়েকদিন থাকিলে পর, অকস্মাৎ গত ২৬শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার (লেভির দিন) রাত্রিশেষে বিষম বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। প্রথম হইতেই কলিকাতার সুযোগ্য ডাক্তারগণ নানাবিধ উপায়ে ও যত্নে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তাঁহাদের সমস্ত যত্ন পণ্ড হইল। রাজা হউন আর দরিদ্রই হউন, মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইলে কাহার সাধ্য তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করে? তৎপর দিবস বুধবার ২৭শে অগ্রহায়ণ রাত্রিশেষে অর্থাৎ ঠিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রাজকুমার নিত্যনিরঞ্জন রোরুদ্যমান পিতামাতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া নিত্যধামে চলিয়া গেলেন। মা অন্নপূর্ণা বুঝি তাঁহার পবিত্র আত্মা পাছে সংসারের মলিনতায় কলুষিত হয় এই আশঙ্কায় আপনার প্রিয় সন্তানকে স্বীয় পবিত্রক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। মৃত্যুকালে কুমারের সে প্রশান্ত গম্ভীর অথচ স্মিতভাব দেখিয়া প্রকৃত ইহাই প্রতীত হইয়াছিল। এরূপ কঠিন পীড়া ভোগ করিলেও তাঁহার শরীরের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় নাই। মনে হইল কুমার যেন সমাধিস্থ হইয়া নিজ আরাধ্য দেবতার ধ্যানে নিমগ্ন। আহা! সে ভাব সে সময়েও পরম রমণীয় বোধ হইয়াছিল।

যখন কুমারের ত্যক্ত সেই কান্তিপূর্ণ দেহ সংকারার্থ ভাগীরথী-তীরে লইয়া যাওয়া হয়, তখন পথপার্শ্বস্থ যাবতীয় লোক হাহাকার করিয়া কেবল এই কথা বলিয়াছিল যে "ওরে কাহার সর্ব্বনাশ করিলে রে! ওরে কোন আকাশের চাঁদ ভাঙ্গিয়া পড়িল রে! তোর হতভাগিনী মার কি দশা করিলে রে! ইত্যাদি।"

কুমারের সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় ছিল। তাঁহার জীবনের এই স্বল্প

কাল মধ্যে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা চিরস্মরণযোগ্য। আমাদের ইচ্ছা আছে, আমরা সময়ে তাঁহার জীবনচরিত প্রকাশ করিব। তাহাতে পাঠক দেখিবেন বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালী গৃহে বিশেষতঃ বাঙ্গালী রাজা জমিদারের গৃহে এরূপ অসামান্য গুণসম্পন্ন বালক অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

আমরা বিশেষরূপে কুমারের হৃদয় অবগত ছিলাম; তাঁহার হৃদয়ে এমন অনেক সাধু অনুষ্ঠানের সংকল্প পোষিত ছিল, যাহা অল্পকাল মধ্যেই কার্য্যে পরিণত হইত। দীনদরিদ্রের প্রতি দয়া, বিপন্নকে আশ্রয়-দান এবং সাধুজনের প্রতি সদয় ব্যবহার তাঁহার নিত্যধর্ম্ম ছিল। তাঁহার কথায় ও উৎসাহে আমাদের ভরসা হইয়াছিল যে তিনি বাঁচিয়া থাকিলে আমাদের সমাজের প্রার্থনীয় অনেক সদনুষ্ঠান সংসাধিত হইবে। কিন্তু হায়! কাল তাহাতে বিরোধী হইল। ইচ্ছা-ময়ীর ইচ্ছা-রহস্য মানবের সাধ্য কি যে ভেদ করে। এখন আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা কুমার নিত্যনিরঞ্জনের প্রদর্শিত সৎপথ অনুসরণ করিয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন।

স্বর্গীয়া রাণী পদ্মসুন্দরী দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(৺রমানাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত এবং মহারাণীমাতার শ্রাদ্ধ-বাসরে পঠিত)

হেতমপুরের কীর্ত্তিমতী ভৃত্য-বৎসলা রাজ্ঞী আর ইহলোকে নাই—পার্থিব ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া তিনি আজ অনন্তধামের অনন্ত সুখের অধিকারিণী। অদ্য তদীয় আদ্যশ্রাদ্ধ বাসর; মুণ্ডিত-মস্তক, চীরবাস-পরিহিত রাজসুতগণ মাতৃদেবীর স্বর্গকামনায় বেদ-পারদর্শী বিপ্রমণ্ডলপরিবৃত হইয়া আকুল-হৃদয়ে কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺রাধাবল্লভের প্রাঙ্গনে সমাসীন। আহা! কি অপূর্ব্ব সুধীসমাগম, যেন নৈমিষারণ্যের পূর্ণ আবির্ভাব।

সমাগত সুধীগণ সমক্ষে অশেষগুণশালিনী পরলোকগতা রাজ্ঞীর দুই চারিটী সদ্‌গুণের কীর্ত্তনে ভৃত্য-হৃদয়ে বাসনা বলবতী, তাই সংক্ষেপে সেই নারীবিগ্রহ-ধারিণী রাজলক্ষ্মীর জীবন-কথা বলিতেছি মাত্র।

বীরভূম জেলায় ময়ূরাক্ষী-নদীতটে দাঁড়কা একটী বৃহৎ গণ্ডগ্রাম, আমাদের স্বর্গীয়া রাণী তত্রত্য প্রাচীন ভূম্যধিকারী-বংশসম্ভূত ৺কালাচাঁদ রায়ের কন্যা। রাণীমাতার মাতৃদেবীর নাম পিতাম্বরী। কালাচাঁদ গৃহবাসী হইয়াও সর্ব্বকার্য্যে উদাসীন ছিলেন; সুতরাং তৎপত্নী পিতাম্বরীকে সকল কার্য্যই সম্পাদন করিতে হইত। পিতাম্বরী অসামান্যা বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে

গার্হস্থ্যকার্য্য ও বৈষয়িক কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলার সহিত নির্বাহিত হইত। রাণীমাতার তিন ভগিনী ও চারি ভ্রাতা। ভগিনীগণের নাম সদসুন্দরী, কাদম্বরী, পদ্মসুন্দরী এবং ভ্রাতাগণের নাম দুর্গাদাস, বৃন্দাবনচন্দ্র, যোগীন্দ্রচন্দ্র ও মণীন্দ্রচন্দ্র। মাতার বুদ্ধিমত্তা কনিষ্ঠা কন্যা পদ্মসুন্দরী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার পরিণত বয়সে যে সকল গুণের পরিপুষ্টি দৃষ্ট হয়, বাল্যেই তাহার সূত্রপাত হইতে থাকে। আমাদের কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণা রাজ্ঞীর হৃদয় কৃষ্ণপ্রেমের পূর্ণপ্রস্রবণ। বালিকা বয়সেই সেই ক্ষুদ্র বালিকা-হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের মৃদুলহিল্লোল বহিয়াছিল। সভাস্থ জনগণের প্রীতির জন্য রাজ্ঞীর দুই একটী দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করিতেছি।

রাজ্ঞী যখন পঞ্চম বর্ষীয়া কুমারী, পিতৃভবনে পালিতা, সেই সময়ে একদা কৃষ্ণসঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হইয়া অন্তরালে অশ্রুসম্পাত করিতেছেন। জনৈক ভৃত্য ইহা দেখিয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আত্মভাব গোপনে অশিক্ষিতা সরলতাময়ী বালিকা করুণস্বরে বলিলেন "রাধাকৃষ্ণের সংকীর্ত্তন আমার এত মিষ্টি বোধ হচ্চে যে, আমি কান্না আটকাতে পাচ্চি না"। প্রেমাশ্রু-সম্পাত জানিয়া ভৃত্যের মুখে আর কথা সরিল না, বিস্ময়রুদ্ধ কণ্ঠে দেববালা-জ্ঞানে বালিকাকে ক্রোড়েকরিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল এবং পথে নানারূপ ভুলাইবার চেষ্টাকরিল ; কিন্তু বালিকার ক্রন্দন কোন ক্রমেই থামিল না। অবশেষে ভৃত্য বালিকাকে জননী সন্নিধানে লইয়া গেল। জননী কন্যার এই অদ্ভুত প্রেমভক্তির কথা শ্রবণে বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া শত চুম্বন করিলেন।

আর একদিন অপরাহ্ণ সময়ে, একজন বুভুক্ষু ভিক্ষুক আহার্য্য-প্রার্থী হইয়া দ্বারে সমুপস্থিত। সে সময় জননী বা কোন প্রাচীনা গৃহে ছিলেন না, ভিক্ষুক ভিক্ষার জন্য অনেকক্ষণ চীৎকার করিয়া ভগ্নমনোরথে প্রস্থানোদ্যত। বালিকা গৃহ-প্রাঙ্গণে তখন খেলা করিতেছে, ভিক্ষুকের কাতর ক্রন্দন বালিকার আর সহ্য হইল না, নিজের সঞ্চিত যৎকিঞ্চিৎ পয়সা ও একখানি পরিধেয় বস্ত্র ভিক্ষুকের হাতে দিয়া প্রস্থান করিলেন। বালিকাহৃদয়ে এরূপ পরদুঃখ-কাতরতা কচিৎ দৃষ্ট হয়।

পদ্মসুন্দরীর জননী প্রত্যহ প্রাতে স্নানাহ্নিকের পর মহাভারতপাঠ শ্রবণ করিতেন। পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা পদ্মসুন্দরী যেখানেই থাকুন, সেই সময়ে আসিয়া মাতার পার্শ্বে বসিয়া মহাভারত শ্রবণ করিতেন।

গৃহস্থের যাবতীয় কার্য্য জননী পীতাম্বরা অল্পবয়স্কা বালিকাদ্বারা সম্পন্ন করাইতেন। বালিকার আর একটী বুদ্ধিমত্তার দৃষ্টান্ত এস্থলে উল্লেখযোগ্য।

তাঁহার মধ্যে মধ্যে অসুখ হইলে তিনি খাবার জন্য ক্রন্দন করিতেন এবং তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর নিকট প্রতিদিন একটী করিয়া টাকা লইয়া ভোজন হইতে বিরত থাকিতেন। তিনি ঐ সঞ্চিত অর্থ পরিবারস্থ দাসদাসীগণকে ঋণ দিতেন এবং এইরূপে তিনি এক সহস্র মুদ্রা সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

বালিকার মাতৃভক্তি অচলা ছিল। তাঁহার চক্ষে জননীই প্রত্যক্ষ দেবী। বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই সমস্ত সদ্‌গুণের পূর্ণ পরিণতি হয়। আবার যেমনি গুণ তেমনি রূপ। রূপগুণের এরূপ অপূর্ব্ব সমাবেশ! ঈদৃশ অন্তর্বহিঃ পবিত্রতা জগতে অতি বিরল।

কোন সময়ে জননী বালিকাসহ গঙ্গাস্নানে কাটোয়া গিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে রাজাবাহাদুরের পিতৃদেবও সেই সময়ে গঙ্গাস্নানে তথায় যান। তিনি দৈবযোগে গঙ্গাগর্ভে বালিকাটীকে দেখিয়া তাঁহার নিরূপম রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, বালিকা উচ্চবংশসম্ভূতা ব্রাহ্মণকুমারী জানিয়া তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা থাকিল না। বালিকাকে আত্মজের অনুরূপ পাত্রী স্থির করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারী অভিভাবককে নিজ সমক্ষে আনাইয়া নিজেই শুভসংযোগের প্রস্তাব করেন। তাঁহারাও এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আন্তরিক অভিমত প্রকাশ করেন। এই সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র নিজ কাটোয়া বাটীতে পাত্রীকে লইয়া আইসেন এবং তাঁহার হস্তে মোহরাদি দিয়া পাল্কী করিয়া স্বস্থানে পাঠাইয়া দেন। এই যানে আরোহণ কালে তাঁহার অঙ্গুলীর উপর পাল্কীর একটিপার চাপিয়া যায়। তিনি এত লজ্জাশীলা ছিলেন যে, কোনরূপ কাতরতা প্রকাশ না করিয়া সেই দারুণ যন্ত্রণা অন্তরে চাপিয়া সমস্ত পথ তদবস্থায় গমন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সময়ে শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

দুঃখের বিষয়, এই বিবাহের পূর্ব্বেই রাজাবাহাদুরের পিতৃদেব লোকান্তরিত হন, যাবতীয় সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তগত হয়। রাজাবাহাদুরের পিতামহী কতিপয় বিশ্বস্ত ভৃত্যের সাহায্যে এই বিবাহ সম্পন্ন করেন।

রাজ্ঞী অতি অল্পভাষিণী, গম্ভীরা ও ধীরপ্রকৃতি ছিলেন, তিনি সকল কার্য্য স্বচক্ষে দেখিয়া সম্পাদন করাইতেন। তাঁহার রাজকার্য্য-পরিচালনে যেরূপ তীক্ষ্ণ প্রতিভা ছিল, গৃহস্থালী কার্য্যেও সেইরূপ অসামান্যা বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইত। আজি সেই মহাশক্তিসম্পন্না রাণী পদ্মসুন্দরীর অভাবে সমস্ত হেতমপুর—সমস্ত হেতমপুর কেন সমস্ত বীরভূম জীবনীশূন্য হইয়াছে। আমরা কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি দিব্যধামে গমন করিয়া অনন্ত সুখের অধিকারিণী হউন।

শোকোচ্ছ্বাস।

(উক্ত জীবনী-পাঠান্তে ৺রমানাথ বাবুর রচিত এই শোকলহরী কবিতাটী পঠিত হয়।)

হায়! আচম্বিতে একি সর্ব্বনাশ
না দেখি না শুনি কভুরে এমন।
নাহি ঘন-রব খর বায়ু-শ্বাস
এ যে বিনা মেঘে অশনি পতন ॥১

সুপ্ত পুরবাসী নিশীথ সময়
সুখ-সুপ্ত সবে রাজ-পরিবার।
পলকে প্রাসাদ সুখের-আলয়
শোকে উতরোল উঠে হাহাকার ॥২

ধন্য! ধন্য! মাতঃ ভূপালমহিষী
একি মৃত্যু? দৈবলীলা অবসান
নহ মা মানবী মুর্ত্তিমতী দেবী
ইচ্ছা-মৃত্যু এই জ্বলন্ত প্রমাণ ॥৩

নিজ মুক্তি-সেতু বেঁধেছ আপনে
রচেছ কীর্ত্তির সুবর্ণ-সোপান।
লভি দিব্যগতি বিমান-গমনে
দিব্য-লোকে, দেবি, করিলে প্রয়াণ ॥৪

সুখাভ্যস্ত রাজ-সুত-বধুগণ
অশ্রুভরা মুখ, দেখা নাহি যায়।
কোথা মা বলিয়া করিছে রোদন
নবনীত তনু ধূলায় লুটায় ॥৫

আত্মীয়-স্বজন অমাত্য-বান্ধব
শোক-সিন্ধু মাঝে নাহি পায় কুল।
শব প্রায় সবে স্তম্ভিত নীরব
প্রজা ভৃত্যকুল শোকেতে আকুল ॥৬

কে কারে সান্ত্বয়ে সকলে কাতর
মাতৃহারা আজি অগণ্য সন্তান।
বাল-বৃদ্ধ-যুবা তুলি আর্তস্বর
স্মরিছে জননী স্নেহের নিধান ॥ ৭

(আজি) নরদেব ভূপ সাগর-গম্ভীর
হারায়ে মহিষী—জীবন-সঙ্গিনী।
ফেলেন নিভৃতে তপ্ত অশ্রুনীর
স্মরি গুণগ্রাম অতীত কাহিনী ॥৮

নহ মা শুধু ত কুমার-জননী
যত পোষ্য ছিল তনয় তোমার।
(আজি) অভাবে তোমার অনাথ-পালিনী
অসংখ্য নয়নে বহে বারিধার ॥ ৯

শোকের প্রলয় তুলেছে, জননি!
এই আকস্মিক তব তিরোধান।
প্রবোধ, সন্তানে হে শান্তি-রূপিণি
'সান্ত্বনা' রূপেতে হয়ে অধিষ্ঠান ॥ ১০

রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী সমা—
স্নেহ কোমলতা মাখা সুশাসনে।
মহিমা-শালিনী, তুমি "রামরমা"
রেখেছ যতেক অনুজীবিগণে ॥ ১১

যাও মাতঃ যাও, চিরালোক-লোকে
দেবাঙ্গনা সনে করহ বিহার!
চিরসমুজ্জ্বল এ রাজ-ভবন
থা'ক, রাজলক্ষ্মী! প্রসাদে তোমার ॥ ১২

যাও মাতঃ যাও ! চিদানন্দধামে
তব যোগ্য নহে মরত-নিবাস ।
লভ 'নিত্যানন্দ'—শান্তি প্রাণারাম
পশিবে না যথা ত্রিতাপ-নিশ্বাস ॥১৩

বিরাজিত যথা ক্ষীরোদ-শয়নে
পদ্মালয়া সনে পদ্ম-নাভ হরি ।
তথায় মগনা চরণ-সেবনে
যুগল-সেবিকা শ্রীপদ্মসুন্দরী ॥ ১৪

হে রাজতনয় সম্বর বিলাপ
স্থাপি হৃৎপটে জননী-প্রতিমা ।
কর পদপূজা ত্যজি মনস্তাপ
উথলিবে নিত্য—রাজশ্রী মহিমা ॥১৫

মাতৃহারা অভাগ্য ভৃত্য
শ্রীরমানাথ মুখোপাধ্যায়
হেতমপুর ।

Official Recognition.

Sir John Woodburn on the 27th February 1901 expressed publicly that it had given him great pleasure to meet one, whom he had heard so highly spoken of for the excellent and careful administration of his properties. Every improvement of the district of Birbhum is due in a great measure to his kind co-operation and his pecuniary assistance.

He is a man of simple habits and in no way fond of trumpeting his own good acts and charities done from time to time. He has all along lived a very pious and peaceful life.

In 1874 when the country was visited by the scourge of severe famine of wide-spread proportions, the Maharaja Bahadur showed an example of benevolence by freely giving relief to the poorer portion of his tenantry in various shapes.

Sir Richard Temple, the then Lieutenant Governor of Bengal, remarked in his Minute of the 31st Oct 1874 to the following effect :—

"Babu Ram Ranjan Chakravorty owns estates which were visited by distress. He from the first, set a good example to the neighbourhood, expended £1400 on relief works, remitted £3109 or one-tenth of his yearly rent, maintained for 4 months a relief house where 250 persons were fed daily, subscribed the largest sum to the relief-fund and personally superintended the dispensing of his charities."

For this charity and liberality Lord Northbrook conferred upon him the title of Raja as a personal distinction, though from a long time anterior to this the people had used to call him and his ancestors the Rajas of Hetampur. What Lord Northbrook therefore really did was to give the sanction of the state to the title which was his by the unsolicited voice of the whole country.

Aid to education.—On the occasion of the Imperial Assemblage at Delhi on the 1st January 1877, Lord Lytton added to this title that of Bahadur in consideration of the Raja's loyality to British rule and eminent merits as a Zamindar. So great is his patronage to liberal education that

he has established a higher class English School at Hetampur. as also a college teaching up to the Intermediate course of the Calcutta University. Besides these educational institutions, the maintenance of which costs him a very large sum every year, he has a Sanskrit "Tol" for the promotion of Sanskrit education and renders aid to several other minor schools in the Zamindaries.

Medical Relief.—Besides these educational institutions, he maintains Charitable dispensaries in the cause of humanity. For the benefit of those, who have faith in the ancient Hindu System of Medicine or who prefer it on religious grounds, Ram Ranjan has kept a Kaviraj on a handsome salary. The dispensaries subsidised by Maharaja Bahadur dispense both Homœopathic and Allopathic medicines. He has great respects for the ancient learning of India.

Relations with Officials.—The Maharaja Bahadur always maintains friendly relations with the European community of the district. He has, at a considerable outlay, built a palatial mansion at Hetampur for the accomodation of European visitors and guests. In this house numerous ladies and gentlemen meet once a year at the invitation of the Maharaja on the occasion of the Saraswati-Pujah festival.

Piety and Charity. Since assuming the management of the estate, the Maharaja Bahadur has steadily advanced on the path of philanthropy without falling away from the orthodox traditions of his house. His charity has all along been catholic and all-embracing. Exceedingly modest and unwilling to do anything that may appear like self-advertising as so many of his class usually do, the newspapers seldom know anything about his good acts. If he had been a little more pushing than he is, he would have kept himself prominent before the eyes of the public. Content to do his duty peacefully and quietly, he is the true type of the old class Hindu Zamindar whose number is steadily decreasing.

Throughly honest, kind and generous he is exceedingly courteous to all. He is the cynosure of all eyes in Birbhum—one whose liberality and loyality have been most marked.

The Maharaja Bahadur comes of a noble stock of Srotriya Brahmans. He has installed the image of 'Rashbihari' in Brindabandham where poor pilgrims are fed daily and an anna-bit is given to each. At Hetampur, with his noble spouse Maharani Padma Sundri Devi, he has dedicated a temple to 'Sri Gauranga.' In the temple of his ancestors' family-deity, 'Radhaballava', strangers and others who seek food are fed sumptuously and receive an anna-bit each.

When in December 1911 their Imperial Majesties visited Calcutta, Maharaja Ram Ranjan placed half a crore at the disposal of Her Imperial Majesty, our beloved Empress Queen Mary.

He has just been honoured with the high distinction of "Maharaja" which he fully deserves. May God grant him long life, health and prosperity to enjoy this distinction, and do even more good to his country.

ভদ্রপুর-কাহিনী

এক সময়ে বীরভূম যেরূপ তীর্থস্থানের আতিশয্যে বঙ্গের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধেও ঐ প্রদেশ তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। আমরা অদ্য এই প্রবন্ধে একটি ঐতিহাসিক বিষয়ের অবতারণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তাহার নায়ক দেশপ্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমার। তাঁহার জীবনী ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বারা নানা প্রকারে সমালোচিত হইয়াছে। এক পক্ষে কাহারও দ্বারা তাঁহার চরিত্র ঘোর কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত, অপর পক্ষে আবার কোন মহাত্মা মহারাজের যশোগানে মুক্তকণ্ঠ। মৎসদৃশ অযোগ্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক মহারাজ-নন্দকুমার-চরিত্রের পুনঃসমালোচনা কেবলমাত্র ধৃষ্টতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই কারণে আমরা তাঁহার চরিত্র-সমালোচনা করিতে ক্ষান্ত হইয়া, কেবল মহারাজের ক্রমোন্নতি, বুদ্ধিমত্তা ও অবশেষে পতনের বিষয় বিবৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

নলহাটী হইতে আজিমগঞ্জ পর্য্যন্ত যে ক্ষুদ্র রেলওয়ে শাখা বিস্তৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে লোহাপুর ষ্টেশন নানা কারণে প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে, এক সময়ে ইহার চতুর্দ্দিকে নিবিড় অরণ্য ছিল এবং তান্ত্রিক সাধক সন্ন্যাসিগণ কাননাভ্যন্তরে বাস করিয়া দেবদেবীর পূজা করিতেন। প্রতি অমাবস্যা রজনীতে এ স্থানে নরবলী হইত, এইরূপ জনশ্রুতি আছে।

[ভদ্রপুর গ্রামের অবস্থিতি ও বিবরণ]

লোহাপুর ষ্টেশনের দুই মাইল ব্যবধানে ভদ্রপুর গ্রাম অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ছিল, এক্ষণে বীরভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই গণ্ডগ্রামটী ব্রাহ্মণী (১) নাম্নী নদীকূলে প্রতিষ্ঠিত। এই স্রোতস্বিনী উক্ত গ্রামের বায়ু-কোণ হইতে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত বেষ্টন করতঃ ইহার কণ্ঠমালাকারে শোভা পাইতেছে। জরাজীর্ণ সৌধশ্রেণী ও আবর্জ্জনাপূর্ণ বৃহৎ প্রাচীন দীর্ঘিকা এই নগরের পূর্ব্ব গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান

(১) পূর্ব্বে এই নদী অতি গভীর ছিল। ইহার উপর নৌকা চলিত। এক্ষণে ইহা শীর্ণ-কলেবরা এবং বালুকাস্তূপমাত্রে পরিণতা। বর্ষাকালে কেবল স্রোতস্বিনী হইয়া থাকে।

করিবার জন্য ম্লানমুখে বর্ত্তমান রহিয়াছে। গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে নদীকূলে কালভয়নাশিনী কুল্লরাদেবী, উত্তরাংশে কালরুদ্র এবং বাজারমধ্যে ভদ্রকালী ও শিবলিঙ্গ বিরাজমান থাকিয়া গ্রামের মঙ্গলসাধন করিতেছেন। তত্রত্য প্রাচীন লোকমুখে শুনা যায়, যে স্থানে ভদ্রকালী অবস্থিত, সে স্থান গ্রামের দক্ষিণ প্রান্ত ছিল। ক্রমে গ্রাম দক্ষিণে বিস্তৃত হওয়ায় উক্ত গ্রাম্যদেবী উত্তরস্থা হইয়াছেন। গ্রামের পূর্ব্বাংশে একটী বৈষ্ণবাশ্রম আছে।

পূর্ব্ব-উত্তরাংশে মুসলমানদিগের একটী পীরের 'দরগা' আছে। উহা "মীর সৈয়দের কবর" নামে অভিহিত। সৈয়দ সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। সেই জন্য অনেকে ইহার কবরে নিজ নিজ প্রার্থিত বিষয়ের সিদ্ধি-কামনা করিয়া থাকেন। বাজারের নিকট দক্ষিণ দিকে শ্রীশ্রী৺ রাধাগোবিন্দ দেবের আশ্রম এবং তাহার পূর্ব্বাংশে সুবিজ্ঞ নবীনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত গৌর-হরির মন্দির।

এতদ্ব্যতীত গ্রামের মধ্যে মধ্যে ভগ্ন শিবালয়, চণ্ডীমণ্ডপ ও বিষ্ণুমন্দির বিদ্যমান আছে। গ্রামের বাহিরে ইংরাজ বণিক্‌গণ-প্রতিষ্ঠিত একটি রেশমের কুঠী ও তৎসংলগ্ন একটি 'বাংলো' আছে। কুঠীতে এখনও রেশম প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু বাংলোটীর অবস্থা অতি শোচনীয়। তাহার ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত জমিদারগণের কাছারী, একটী মধ্যইংরাজীবিদ্যালয় ও ডাকঘর আছে।

এখানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস। ভদ্রপুরে ব্যবসায়িগণের অভাব নাই, কিন্তু ইহার পথ ঘাট সংস্কার-অভাবে অতি শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

[মহারাজ নন্দকুমারের প্রাসাদ]

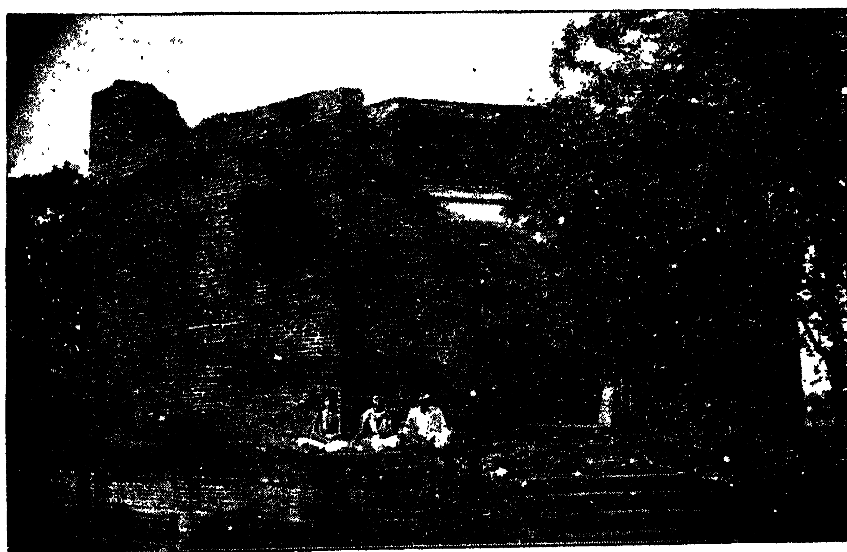
গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে মহারাজ নন্দকুমার-নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদ জীর্ণ-দশায় বর্ত্তমান। তাহার অধিকাংশ ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্টাংশ ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অনেক মহাত্মগণকে মধ্যে মধ্যে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

তত্রত্য প্রাচীন লোকমুখে শুনা যায় যে, তিনটী সিংহদ্বার অতিক্রম করিলে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করা যাইত এবং "রাণী সায়ের" ও "গুরুসায়ের" নামক দুইটী অতি বৃহৎ দীর্ঘিকা রাজবাটীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক্ষণে কেবল মাত্র দেওয়ানখানার কিয়দংশ, ঠাকুরবাড়ীর একটী প্রকোষ্ঠ ও অন্দরের কতক অংশ বিদ্যমান আছে।

হায়! এক দিন এই রাজপ্রাসাদ রাজোপাধিধারী কত কত ধনাঢ্য ব্যক্তির ধ্যেয় ছিল, এই গ্রাম একদিন কত বিশিষ্ট ব্যক্তির শুভাগমনে



ভদ্রপুর— মহারাজ নন্দকুমারের প্রাসাদ



ভদ্রপুর— গুহ্যকালিকা দেবীর মন্দির

পবিত্রীকৃত হইয়াছিল, আজ কালের কঠোর প্রভাবে সে গৌরব একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে।

যে বৃহৎ বিস্তীর্ণ রাজপ্রাসাদের কিয়দংশ এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার দ্বিতলের উভয় পার্শ্বের বারান্দায় একটী চাপাকাষ্ঠে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা খোদিত আছে "শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণজী জয়তী সন ১১৮১ সাল, তারিখ ২৯শে ভাদ্র মারফৎ দেবীরাম শর্ম্মা" (১)। ১১৮১ সালের ২৯শে ভাদ্র ইং ১৭৭৪ খৃঃ অব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর; সুতরাং মহারাজ নন্দকুমারের মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে এই দ্বিতলগৃহ নির্ম্মিত হয়।

[আকালীপুরে মহারাজ নন্দকুমারের প্রতিষ্ঠিত গুহ্যকালিকার মন্দির]

ভদ্রপুরের অনতিদূরে আকালীপুর গ্রাম, ঐ গ্রামের দক্ষিণে মহারাজ নন্দকুমারের প্রতিষ্ঠিত সর্পাসীনা সর্পভূষণভূষিতা বরাভয়করা দ্বিভুজা জগন্মাতা শ্রীশ্রী৺ গুহ্যকালিকা (২) ও গৌরীশঙ্কর প্রতিমাদ্বয় বিরাজিত আছেন। এখানে নিত্য ও নৈমিত্তিক পূজা ব্যতীত প্রত্যহ দশ জন অতিথির সৎকার হইয়া থাকে। ৺শারদীয়া পূজার পর চতুর্দ্দশীতে এবং মাঘরটন্তী চতুর্দ্দশীতে মহাসমারোহে দেবীর পূজা এবং ব্রাহ্মণভোজন হয়। মঙ্গলবিধায়িনীর মূর্ত্তি রমণীয়া ও প্রশান্তা। কুঞ্জঘাটা রাজধানীতে মহারাজ নন্দকুমার-স্বাক্ষরিত একখান পত্র আছে। তাহার মর্ম্মার্থে জানা যায় যে, তিনি ঘোরতর বিপদ্‌জালে জড়িত হওয়ায় দেবী-প্রতিষ্ঠার সময় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার নিয়োগে তৎপুত্র রাজা গুরুদাস গৌড়পৎ বাহাদুর উক্ত কার্য্য সম্পাদন করেন। দেবীমন্দির সুউচ্চ ও প্রশস্ত, কিন্তু অসমাপ্ত এবং ভিত্তিগাত্র প্রায় বিদীর্ণ অবস্থায় দৃষ্ট হয়। প্রবাদ আছে যে, যখন এই মন্দির নির্ম্মিত হইতেছিল, সেই সময় হঠাৎ তাহার চতুষ্পার্শ্ব বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং রাত্রে স্বপ্নাদেশে জগন্মাতা জ্ঞাপন করেন যে, তিনি শ্মশানবাসিনী, তাঁহার গৃহের প্রয়োজন নাই। সেই অবধি মন্দিরটী তদবস্থায় রক্ষিত হইয়াছে।

সেই মন্দির চতুর্দ্দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত ছিল, এবং পূর্ব্ব ও উত্তরে দুইটী তোরণদ্বার ও পূর্ব্বদ্বারের সন্নিকটে নহবৎখানা ছিল; কিন্তু এক্ষণে তাহার

(১) ইনি মহারাজের ভাগিনেয় অর্থাৎ রাজা গুরুদাস গৌড়পৎ বাহাদুরের পিতৃস্বসার পুত্র।

(২) আকালীপুরের মন্দিরের প্রতিমা স্থাপনের জন্য মহারাজ গুরুদাসকে যে পত্র লিখেন, অদ্যাবধি তাহা কুঞ্জঘাটা রাজবাটীতে বর্ত্তমান আছে। তাহা পাঠে জানা যায় যে, রটন্তী তিথিতে উক্ত প্রতিমাদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হন। সেই জন্য প্রতিবৎসর রটন্তী তিথিতে প্রতিমাদ্বয়ের মহাসমারোহে পূজা হইয়া থাকে। গুহ্য কালী সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত মাহাত্ম্যের প্রবাদ প্রচলিত আছে।

ভগ্নাবশেষমাত্র বিদ্যমান আছে। (১) দেবীমন্দিরের দক্ষিণাংশে একটী সিদ্ধাসন, এই আসনকে তত্রত্য লোকে "পঞ্চমুণ্ডি বা ক্ষেপাকালী" বলিয়া থাকেন। (২) উক্ত আসনের দক্ষিণে এবং প্রাচীরের বহির্ভাগে 'কালীসাগর' নামক একটী পুষ্করিণী ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মণী নদীর স্রোত উক্ত পুষ্করিণীর মধ্যে প্রবেশ করায় উহা মৃত্তিকাপূর্ণ ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

['ন বাটী' বা রাধাকৃষ্ণ রায়ের বাটী]

রাজবাটীর উত্তরাংশে নবাটী। মহারাজ নন্দকুমারের ন মধ্যম কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺রাধাকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের বাটীর নামই নবাটী। এ বাটীর শোভাও ন্যূন ছিল না। সদর মহলে একটী অত্যুচ্চ বহুব্যয়-নির্ম্মিত সুরম্য শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-জনার্দ্দন জীউর মন্দির ছিল এবং তাহা নবরত্ন (৩) নামে আখ্যাত হইত। এই মঠের স্তরে স্তরে ৯টী চূড়া ছিল বলিয়া উহাকে নবরত্ন বলা হইত। উহার সম্মুখস্থ দেওয়াল, খোদিত প্রস্তরে ও ইষ্টকে শোভিত ছিল। তাহাতে পৌরাণিক চিত্র ও লতা পুষ্প অঙ্কিত ছিল। আজ কয়েক বৎসর হইল উক্ত মন্দিরের চিহ্নমাত্রও বিলুপ্ত হইয়াছে। ৺রাধাকৃষ্ণ রায়ের বংশধর শ্রীযুক্তবাবু কিশোরী মোহন রায় (৩) এক্ষণে উক্ত নবাটীতে বাস করিতেছেন। ৺রাধাকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের পৌত্র লালা প্রাণকৃষ্ণ রায় দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৭২ খৃঃ মানবলীলা সংবরণ (৪) করিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ১০০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি রাজা গুরুদাসকে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

(১) কথিত আছে, নহবৎখানা ও তোরণদ্বার মন্দিরের সঙ্গেই বিদীর্ণ হইয়া যায়।

(২) কেহ কেহ বলেন, মন্দির-নির্ম্মাণের পূর্ব্বে গুহ্যকালিকা দেবী এই আসনে প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। কাহারও মতে, মহারাজ নন্দকুমার এই আসনে উপবেশন করিয়া সাধনা করিতেন। প্রবাদ আছে যে, বিশেষ সাধক ভিন্ন অন্য কেহ এই আসনে বসিয়া সাধনা করিলে উন্মাদগ্রস্ত হয়েন। সেই জন্য ঐ আসনকে 'ক্ষেপা কালী' বলা হয়।

(৩) নিখিল বাবু ভ্রমবশতঃ এই নবরত্নমন্দিরটী মহারাজ নন্দকুমার-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে স্থানে নবরত্নের মন্দির ছিল, সে স্থান অদ্যাপি ন-বাটীর অধিকার-ভুক্ত। ঐ মন্দিরচূড়ায় সাতবার বজ্রাঘাত হওয়াতে অনেক স্থান ভগ্ন হইয়া যায়, পরে ১৩০৪ সালের প্রবল ভূমিকম্পে তাহা একেবারেই চূর্ণীকৃত হইয়াছে।

(৪) বংশতালিকা দ্রষ্টব্য।

(৫) তাঁহার বয়সের সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলিয়া থাকেন, একশত বৎসর ; কাহার কাহারও মতে একশত চৌদ্দ ; এবং নবীনকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়-লিখিত 'ভদ্রপুর-ইতিবৃত্তে' প্রাণ-কৃষ্ণের এক শত তিন বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে।

রাজবাটী ও ন-বাটীর পশ্চিমাংশে ছোট রায়বাটী। ইহাতে মহারাজের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ৺রঘুনাথ রায় ও তাঁহার বংশধরগণ বাস করিতেন, সম্প্রতি তাঁহার বংশ সমূলে বিলুপ্ত হওয়াতে উক্ত রায়ের বাটীও ভূমিসাৎ হইয়াছে, এমন কি ইহার তলস্থ মৃত্তিকাও স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছে। অনেকে ৺রঘুনাথ রায়ের বংশধর ৺নারায়ণ রায়কে তাঁহার কয়েকটী পুত্রকন্যাসহ এই বাটীতে বাস করিতে দেখিয়াছেন। অল্পদিনমধ্যে এই বংশ বিলুপ্ত হইয়া গেল। [ছোট রায়-বাটী ও রঘুনাথ রায়ের বংশ]

ন-বাটীর অগ্নিকোণাংশে মহারাজ নন্দকুমারের ভাগিনেয় ৺দেবীরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী। ইনি রাজা গুরুদাস গৌরপৎ বাহাদুরের পিতৃস্বসার পুত্র। রাজা গৌড়পৎ বাহাদুর মুর্শিদাবাদ নবাবের প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত হইলে দেবীরাম তাঁহার ভদ্রপুরস্থ রাজষ্টেট-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। দেবীরাম বন্দোপাধ্যায় এক্ষণে বর্ত্তমান। মহারাজের ভগিনী কৃষ্ণপ্রিয়া রাজবাটীর একাংশে বাস করিতেন। রাজবাটীতে যে দেবের (১) সেবা হইত, ঐ বিগ্রহের প্রতি তাঁহার পুত্রবাৎসল্য থাকায় সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে 'মহাপ্রভুর মা' বলিত। [মহারাজ নন্দকুমারের ভাগিনেয় দেবীরাম বন্দ্যোপাধ্যায়]

ন-বাটীর উত্তরে মহারাজের পিতৃ-পুরোহিত চক্রবর্ত্তীদিগের বাসস্থান ছিল, অল্প দিন হইল উহা লুপ্ত হইয়াছে। রাজবাটীর অগ্নিকোণে মজুমদার-দিগের বাটী ছিল এবং তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত 'মজুমদার-পুষ্করিণী' নামক একটী জলাশয় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে এই বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যে ভদ্রকালীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিতা। (২) প্রবাদ আছে যে, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্গীগণ কর্ত্তৃক ছিন্ন (৩) হইয়াছে। সম্ভবতঃ ভদ্রকালীর অধিষ্ঠান-হেতু এই গ্রামের নাম ভদ্রপুর হইয়াছে। ভদ্রপুরের যে অংশে দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, সেই স্থানটীকে হাট মহারাজগঞ্জ বলে। ইহা রেলওয়ে হইবার পূর্ব্বে বিশেষ ব্যবসায়ের স্থান ছিল এবং এই হাট হইতে ভদ্রপুর রাজের বিশেষ আয় হইত। [ভদ্রকালী]

ভদ্রপুর অধিবাসিগণের কৃষিপ্রধান জীবিকা। এখানে তুঁত, পাট ও ধান্যের চাষই অধিক। এদেশের মৃত্তিকা পললময়। যব, মটর, গম প্রভৃতি

(১) এক্ষণ তাহা কুঞ্জঘাটা রাজবাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

(২) এক্ষণে নশীপুরের মহারাজ রণজিৎসিংহের ব্যয়ে ইঁহার পূজাদি হইয়া থাকে।

(৩) দেবী এখনও সেইরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান।

[ভদ্রপুর অধিবাসিগণের উপজীবিকা]

শস্যও কিয়ৎপরিমাণে হইয়া থাকে। ভদ্রপুরের পাদমূল ধৌত করিয়া অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে যে ব্রাহ্মণী নদী প্রবাহিতা, তাহাতে শস্যক্ষেত্রের অনেক উপকার সাধিত হয় বটে, কিন্তু বর্ষাকালে কোন কোন বৎসর প্রবল বন্যার প্রকোপে তীরবর্ত্তী জমির শস্যসকল সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়। কৃষকগণের চাষ ব্যতীত পশুপালন ব্যবসাই প্রধান। তন্তুবায়গণ রেশমী সূতা ও বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ব্রাহ্মণ চৌধুরীবংশ, কায়স্থ সিংহ, গন্ধবণিক্ পাল ও মুসলমান মীরগণই এই গ্রামের আদিম বাসিন্দা বলিয়া শুনা যায়। তন্তুবায়, সূত্রধর ও স্বর্ণকার জাতি এখানে পূর্ব্বে বাস করিত; কিন্তু এখন তাহারা এ গ্রাম হইতে লুপ্ত হইয়াছে, এবং কাসারী, শাঁখারী, দেলারী, লাহিড়ী প্রভৃতি ব্যবসায়ী জাতীয় অনেকগুলি লোক বাস-ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিতেছে। তজ্জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার লোক-সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছে, বর্ত্তমান গৃহ-সংখ্যা পাঁচশত মাত্র।

কিয়দ্দিন পূর্ব্বে এই গ্রামে সংস্কৃত ও পারসী-ভাষাবিৎ এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রাভিজ্ঞ অনেক ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সেই শিক্ষিত ব্যক্তিসমূহের অভাব হইয়াছে।

পূর্ব্বে এই গ্রামের জলবায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে নানা প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় এ স্থানের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছে।

তিন বৎসর অতীত হইল এ প্রদেশে পঞ্চায়তের ব্যবস্থা হইয়াছে। এক একটী ইউনিয়নে চারিজন পঞ্চায়ৎ ও একজন প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। এই গ্রাম ১০নং ইউনিয়ন "ভদ্রপুর" নামে অভিহিত।

[ভদ্রপুর ও মহারাজ নন্দকুমার]

এই ভদ্রপুর গ্রামে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমার ১৭০০ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ নন্দকুমারের জন্মকাল সম্বন্ধে নানা গ্রন্থে নানা প্রকার মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। "ব্রাহ্মণ রাজবংশে" ১৭২৪ খৃঃ অব্দ মহারাজের জন্মসময় বলিয়া লিখিত আছে। "মুর্শিদাবাদকাহিনীতে" অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাজের জন্মকাল দেখা যায়। ওয়ালস্ সাহেবও লিখিয়াছেন যে, নন্দকুমারের সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় তাঁহার সহিত হেষ্টিংসের বিবাদের সূত্রপাত হয়। (১) তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে নন্দকুমারের ১৭০০ খৃঃ

(১) "He (Nunda Kumar) was in his seventieth year, when he entered into a struggle with Warren Hastings..."(Walsh's Histroy of Murshidabad District, 1902. p 223.)

অব্দের অতি নিকটবর্ত্তী সময়ে জন্ম হয়। বিভারিজ সাহেব নানা যুক্তিতর্কের পর ১৭০০ খৃঃ অব্দ মহারাজের জন্মকাল নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এবং মহারাজের সুযোগ্য বংশধর কুমার দেবেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর বিভারিজ-লিখিত মতের পোষকতা করিয়া থাকেন। সুতরাং ১৭০০ খৃঃ অব্দই মহারাজ নন্দকুমারের জন্মকাল বলিয়া অধিকতর গ্রহণীয়।

[মহারাজ নন্দ-কুমারের বংশ-পরিচয়]

মহারাজ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী জঙ্গীপুর সব্‌ডিভিজান্ অন্তর্গত বাড়ালাগ্রামের নিকট জরুর নামক স্থানে বাস করিতেন। তাঁহারা ধবলপীতমুণ্ডী গাঁইভুক্ত কষ্ট শ্রোত্রিয়। নন্দকুমারের প্রপিতামহ রামগোপাল রায় ভদ্রপুরের মথুরানাথ মজুমদারের (১) কন্যার পাণিগ্রহণ করেন (২)। সেই সময় হইতে রামগোপাল ভদ্রপুরেই বাস-ভবন প্রস্তুত করিয়া অধিকাংশ সময় তথায় বাস করিতেন। রামগোপালের দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ হরিকৃষ্ণ, কনিষ্ঠ চণ্ডীচরণ। হরিকৃষ্ণের জীবনী অন্ধকারাচ্ছন্ন। কনিষ্ঠ পুত্র চণ্ডীচরণের দুই বিবাহ। প্রথমা পত্নীর গর্ভে পদ্মনাভ ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে রঘুনাথ রায় জন্ম গ্রহণ করেন। রঘুনাথ রায়ের পুত্র শম্ভুনাথ রায়, কাশীরাজের কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। (৩) পূর্ব্বোক্ত পদ্মনাভই মহারাজ নন্দকুমারের পিতা।

ভদ্রপুরেই মহারাজের জন্ম হইয়াছিল। নন্দকুমার ব্যতীত পদ্মনাভের রাধাকৃষ্ণ, কেবলকৃষ্ণ ও নবকৃষ্ণ নামক পুত্র এবং বিষ্ণুপ্রিয়া ও কৃষ্ণপ্রিয়া নাম্নী কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে নন্দ মারই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ (৪)।

(১) মজুমদারবংশ এখন লুপ্ত; শুনা যায়, মথুরানাথ ঢাকার নবাবের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন।

(২) বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী শুনা যায় যে, ১৭০০ শাকের কোন সময়ে ভদ্রপুরনিবাসী মথুরানাথ মজুমদারের বনিতা রঘুনাথগঞ্জের নিকট ভাগীরথীকূলে গমন করেন, তথায় জরুর গ্রামের ৺রামগোপাল রায়ের মাতার সহিত তাঁহার সম্মিলন ও পরিচয় হয় এবং রায়জননী স্বীয় পুত্রের সহিত মজুমদারগৃহিণীর কন্যার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন এবং পরিশেষে সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

(৩) এই বংশ "ছোট রায়" বলিয়া খ্যাত। এই কুলের কৃপানাথ রায় অতীব দয়ালু ও অন্নদাতা বলিয়া এদেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সম্প্রতি এ বংশ লুপ্ত।

(৪) সম্ভবতঃ নবকৃষ্ণ অল্প বয়সেই ধরাধাম ত্যাগ করেন, অবশিষ্ট তিন জন সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় শিক্ষালাভ করিয়া সকলেই নবাব-সরকারে চাকুরী করিতেন, কেবল কৃষ্ণের "রাও" উপাধি ছিল। ভদ্রপুরের প্রাচীন লোকগণ দীর্ঘজীবী প্রাণকৃষ্ণের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, নন্দকুমার

এই সময় বাঙ্গালা রাজ্য কার্য্যদক্ষ মুর্শিদকুলী খাঁর দ্বারা শাসিত হইতেছিল। মুর্শিদকুলী খাঁর রাজস্ব-বন্দোবস্ত ইতিহাসের একটী সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। মহারাজ নন্দকুমারের পিতা তৎকালে রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পুত্র নন্দকুমারকেও ঐ কার্য্যে শিক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। পদ্মনাভ বিশেষ কার্য্যদক্ষ ছিলেন বলিয়া ক্রমে আমীনের পদে উন্নীত হইয়া, পরে "ফতেসিংহ", "ঘোড়াঘাট" ও "সাতসইকা" পরগণার রাজস্ব-সংগ্রহের ভার প্রাপ্ত হয়েন; তিনি এই কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য পুত্র নন্দকুমারকে আপন সহকারী নিযুক্ত করিলেন। রাজস্ব-বিষয়ে নন্দকুমারের দক্ষতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং ক্রমে তাঁহার পারদর্শিতা নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর দৃষ্টি-আকর্ষণ করায় তিনি নন্দকুমারকে হিজলী ও মহিষাদলের আমীনের পদে নিযুক্ত করেন।

[নন্দকুমারের প্রাথমিক কর্ম্ম-জীবন]

নন্দকুমার সরকারের আয়বৃদ্ধি করিতে গিয়া নিজে বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন। তৎকালে রায়রায়ান চায়েন রায় খালসার দেওয়ান ছিলেন। জমিদার ও প্রজাগণ তাঁহার নিকট নন্দকুমারের নামে অভিযোগ উপস্থিত করে এবং সেই সময় নন্দকুমারের নিকট সরকারের প্রায় ৮০,০০০৲ টাকা পাওনা হয়। এই সকল কারণে চায়েন রায় আর তাঁহাকে উক্ত পদে রাখিতে ইচ্ছুক না হইয়া তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে আহ্বান করিলেন এবং প্রাপ্য টাকার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। সহসা রাজস্ব-বিভাগের কার্য্য হইতে অপসৃত হওয়াতে প্রজাগণের নিকট প্রাপ্য টাকা আর আদায় হইল না। সেই কারণ নন্দকুমার অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন। তখন পুত্রের দুরবস্থা দেখিয়া পিতা পদ্মনাভ স্বয়ং অর্থ দিয়া নন্দকুমারের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলেন।

[কর্ম্মজীবনে নন্দকুমারের উপর্য্যুপরি ভাগ্য-বিপর্য্যয়]

নন্দকুমার উক্ত কার্য্য হইতে অপসৃত হইলে পর তিনি নবাব সা আমেদ জঙ্গের নায়েব হোসেনকুলী খাঁর নিকট কার্য্যপ্রার্থনা করেন; কিন্তু চায়েন রায় নন্দকুমারের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকায় হোসেন কুলী খাঁ তাঁহাকে কার্য্য প্রদান করিতে অসম্মত হয়েন। তথা হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া তিনি আলিবর্দ্দী খাঁর

দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ, আজানুলম্বিতবাহু ও গৌরবর্ণ ছিলেন; তিনি গুম্ফশ্মশ্রু রাখিতেন না, তাঁহার শিরোদেশে স্থূল শিখা ছিল। লালা প্রাণকৃষ্ণ আবার এই সংবাদ রাজা গুরুদাস ও তৎকালের প্রাচীন লোকগণ যাঁহারা মহারাজ নন্দকুমারকে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের খ শুনিয়াছিলেন।

প্রধান সেনাপতি মস্তফা খাঁর নিকট যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে মস্তফা খাঁর সহিত আলিবর্দ্দীর বিবাদের সূচনা হয়। সরকারের নিকট মস্তফা খাঁর সৈন্যগণের বেতন প্রাপ্য হওয়ায় নবাব কতকগুলি জমিদারের নিকট হইতে তাহা আদায় করিয়া লইবার জন্য মস্তফা খাঁকে আদেশ প্রদান করেন। অনন্যোপায় হইয়া জমিদারগণ নন্দকুমারের শরণাপন্ন হইলেন এবং তিনি মস্তফা খাঁর নিকট তাঁহাদের জামীন হইয়া জমিদারগণকে আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা করিলেন, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নন্দকুমার উক্ত জমিদারদিগের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া দিতে না পারায় মস্তফা খাঁ নন্দকুমারকে বন্দী করিবার আদেশ দেন। নন্দকুমার এই সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় পলায়ন করিলেন। ইতি মধ্যে আলিবর্দ্দী খাঁয়ের সহিত মস্তফা খাঁর বিবাদ ঘোরতর হইয়া উঠিল এবং নবাবের আদেশে মস্তফা খাঁ বিনষ্ট হয়েন এবং চায়েন রায়ও সেই সময়ে পরলোকগত হইলেন। এইরূপে বিধির চক্র ঘূর্ণিত হইলে, নন্দকুমার আবার মুর্শিদাবাদে আগমন করিয়া মুৎসুদ্দিগণের অনুরোধে সরকার হইতে সাত-সইকা পরগণার রাজস্বসংগ্রহের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

সেই সময় তিনি হুগলীনিবাসী সেখ হাবাৎ উল্লার নিকট দুই সহস্র টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। সাতসইকায় কিছু দিন কার্য্য করিলে পর আবার তাঁহাকে মুর্শিদাবাদ আসিয়া হিসাবাদি বুঝাইয়া দিতে হয়। তৎপর তিনি হুগলীতে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য গমন করেন। সেই সময় হাবাৎ উল্লা তাঁহার প্রাপ্য অর্থের জন্য পাঁচদিন বন্দী করিয়া রাখেন, তাহার পর সেখ রস্তম নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁহার জামীন হইলে তিনি মুক্তিলাভ করেন। সেখ রস্তম কমলউদ্দীনের পিতা। এই কমল উদ্দীনই পরে জাল মোকদ্দমার সময় নন্দকুমারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। এই সময়ে নন্দকুমারের এত অর্থকষ্ট হইয়াছিল যে, তিনি হুগলী হইতে চন্দননগর গমন পূর্ব্বক ২০০০৲ টাকা মূল্যের শাল ১২০০৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া তাহা হইতে ১০০০৲ টাকা হাবাৎ উল্লাকে দেনাশোধের জন্য প্রদান করেন এবং অবশিষ্ট ২০০৲ টাকা লইয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ ইয়ার বেগ খাঁ পদচ্যুত এবং হেদায়ৎ আলি খাঁ তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। নন্দকুমার মুর্শিদাবাদে আসিয়া প্রায়ই যুবরাজ সিরাজ উদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তৎকালে তাঁহার প্রতি ভাগ্যদেবী এতদূর অপ্রসন্ন হইয়াছিলেন যে, তিনি যেখানে যাইতেন, সেই খানেই তাঁহার বিপদ্

উপস্থিত হইত। একদিন সিরাজ উদ্দৌল্লা তাঁহার প্রাসাদে বসিয়া আছেন, এমন সময় নন্দকুমার তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার কাণে কাণে কি কথা বলিলেন, সিরাজ কম্পিত-কলেবর হইয়া নন্দকুমারকে বংশখণ্ড দ্বারা প্রহার করিতে আদেশ দেন; কিন্তু নন্দকুমার বলিষ্ঠ থাকা হেতু পলায়নপূর্ব্বক সে বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

[হুগলীর দেওয়ান ও নন্দকুমার]

সে ক্রোধ সিরাজ উদ্দৌলা চিরদিনের জন্য হৃদয়মধ্যে পোষণ করেন নাই। এই ঘটনার কিছুদিন পরে সিরাজের আদেশে নন্দকুমার কার্য্যলাভের জন্য হুগলীর ফৌজদার হেদায়ৎ আলি খাঁর নিকট প্রেরিত হন। হেদায়ৎ খাঁ শুনিয়াছিলেন যে, নন্দকুমার হুগলীর দেওয়ানী পদের জন্য আবেদন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে উক্ত পদ দিবার ইচ্ছা না থাকায় হেদায়ৎ নন্দকুমারের প্রতি নানারূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। নন্দকুমার ব্যতিব্যস্ত হইয়া স্বীয় ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীশ্রীহরি

শরণম্

প্রাণাধিক শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ রায় ভায়া চিরঞ্জীবেষু

* * * * অদ্য চারি রোজ এথা পঁহুছিয়াছি, ইহার মধ্যে একটী অন্ন যদি দেখিয়া থাকি তবে সে অভক্ষ্য, মুখপ্রক্ষালনাদি কিছুই করিতে পারি নাই। * * * ফজিহত যত যত পাইলাম তাহা কত লিখিব * * * সম্প্রতি যদি আমার প্রাণরক্ষা করা ইচ্ছা থাকে তবে পত্র পাঠ করিবা মাত্র শ্রীসূর্য্যনারায়ণ মজুমদারের নিকট তুমি এবং স্বয়ং শ্রীযুক্ত পিতৃব্য ঠাকুর * * * যাইয়া শ্রীযুক্ত সেখ হিদাতুল্লাজীউকে তাহার লিখন করিয়া পাঠাবা এই ধারাতে যে নন্দকুমারের ভাই ও উকিল সকলে এইখানে এক রফা করিয়া শ্রীযুক্ত ৵সাহেবের পরোয়ানা করিয়া পশ্চাৎ পাঠাইবে, সম্প্রতি নন্দকুমারকে তসদি না দিবে যদি এরূপ লিখন নাগাদি ৩রা ভাদ্র এথা পৌঁছে, তবে যে আমার প্রাণ বাঁচিতে পারে, নতুবা ব্যাজ হইলে এ জন্মের মত বিদায় লইলাম, ইহা নিশ্চয় জানিবা *

ইতি তারিখ ৩১শে শ্রাবণ।

উক্ত পত্রে সাকিম বা শকাব্দার উল্লেখ নাই। নন্দকুমার হেদায়ৎ আলির অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

তথায় যাইয়া তাঁহার দুরবস্থার শেষ হইল; এই সময় মহম্মদ ইয়ারবেগ খাঁ পুনরায় ফৌজদারপদে নিযুক্ত হয়েন। নন্দকুমার ইয়ার বেগের বন্ধু সাদক উল্লার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন। সাদক উল্লার অনুরোধে নন্দকুমার হুগলীর দেওয়ানীপদে নিযুক্ত হয়েন এবং ইহার পর হইতে নন্দকুমারের ভাগ্য-দেবী প্রসন্ন হইলেন। নন্দকুমার সর্ব্বদা দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া ইয়ার-বেগের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইলেন। কিন্তু ইয়ারবেগ তিন বৎসর মাত্র উক্ত ফৌজদারপদে নিযুক্ত ছিলেন। তৎপরে কোন কারণে পদচ্যুত হইয়া নন্দকুমার সমভিব্যাহারে হিসাব বুঝাইয়া দিবার জন্য মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হয়েন। ইতি মধ্যে ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে ৯ই এপ্রিল নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ মহবৎ জঙ্গের মৃত্যু হইলে নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালা, বিহার উড়িষ্যার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি মির্জ্জা মহম্মদকে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করেন, কিন্তু তাঁহার দ্বারা তথাকার কার্য্য সুশৃঙ্খলায় চলিবে না বিবেচনা করিয়া নূতন নবাব সেখ ওমার উল্লাকে হুগলীর ফৌজদার করিয়া প্রেরণ করিলেন। নন্দকুমার সেই সময়ে হুগলীর দেওয়ানীপদের জন্য আবেদন করিলে তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হইল এবং তিনি পুনর্ব্বার ওমার উল্লার দেওয়ানীপদে নিযুক্ত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে ওমার উল্লার পদচ্যুতি ঘটে, তখন সিরাজ নন্দকুমারকে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করেন (১) এই সময়ে নবাবের সহিত ইংরাজগণের বিবাদের সূত্রপাত হয়। ইংরাজগণ ফরাসীগণের চন্দননগর আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলে নবাব রাজা দুর্লভরায়ের অধীনে এক-দল সৈন্য হুগলীতে পাঠাইয়া দেন ও প্রয়োজন হইলে ফরাসীদিগের সাহায্যের জন্য নন্দকুমারকে লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু নন্দকুমার সিরাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখিয়া ইংরাজগণের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। নন্দকুমারের সহায়তায় ইংরাজগণ চন্দননগর অধিকার করিলেন। সিরাজউদ্দৌলা নন্দ-কুমারের চাতুরী বুঝিতে পারিয়া তাঁহার স্থলে আর এক জন নূতন ফৌজদার হুগলীতে পাঠাইলেন। ইহার পর বঙ্গরাজ্যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল, তাহার ফলে পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজগণ বিজয়ী হইয়া ১৭৫৭ খৃঃ ২৯শে জুন মীরজাফরকে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে বসাইলেন।

[ইংরাজগণের অধিকারকার্য্যে নন্দকুমারের সাহায্য]

(১) ফৌজদারী পদটী আধুনিক ছোটলাটের পদের সহিত অনেক অংশে সমতুল্য। এই পদের বেতন বার্ষিক ২৫০০০০৲ টাকা ছিল।

[ক্লাইব ও নন্দকুমার]

মুতাক্ষরীনে লেখা আছে যে, মীরজাফর মসনদে বসিলে নন্দকুমার ক্লাইবের মুন্সী ও দেওয়ান হয়েন। ইহার কিছুদিন পরে ক্লাইব সসৈন্যে পাটনায় গমন করিলে নন্দকুমার তাঁহার সঙ্গে যাত্রা করেন। ক্লাইব নন্দকুমারের চতুরতা, বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যদক্ষতায় এরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, কোন গুরুতর কার্য্য তাঁহার পরামর্শব্যতীত সম্পন্ন করিতেন না।

তৎকালে নন্দকুমারের ক্ষমতা এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, সাধারণে তাঁহাকে কালা কর্ণেল বলিত। পাটনা হইতে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমনের পর ক্লাইভের অনুরোধে নবাব নন্দকুমারকে পুনর্ব্বার হুগলী ও হিজলী প্রভৃতির দেওয়ানী প্রদান করেন।

[ওয়ারেণ হেষ্টিংস ও নন্দকুমার]

মীরজাফর ইংরাজগণকে অনেক অর্থ দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজকোষ শূন্য থাকা হেতু তাহা দিতে না পারায় নবাব সেই টাকার বিনিময়ে ইংরাজদিগকে বর্দ্ধমান প্রভৃতির রাজস্ব ছাড়িয়া দেন। কোম্পানি নন্দকুমারকে ১৭৫৮ খৃঃ অব্দের ১৯শে আগষ্ট ঐ সমস্ত স্থানের তহশীলদার নিযুক্ত করিলেন। ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে নবাব দরবারে ওয়ারেন হেষ্টিংস রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হয়েন। রাজস্ব আদায় লইয়া নন্দকুমারের সহিত হেষ্টিংসের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়।

এদিকে অর্থের জন্য রায়দুর্লভের সহিত নবাবের গুরুতর বিবাদ হইয়া উঠে। তিনি উৎপীড়নভয়ে নন্দকুমারের সাহায্যে কলিকাতায় পলায়ন করিয়া ইংরাজগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নবাব রায় দুর্লভকে ক্লাইবের কোপদৃষ্টিতে নিপতিত করিবার জন্য নন্দকুমারকে পত্র লিখেন, কিন্তু নন্দকুমার দুর্লভ রায়ের অত্যন্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, বলিয়া নবাবের অসদভিপ্রায় পূরণের সহায়তা করেন নাই। তজ্জন্য নবাব জাফর আলি খাঁ তাঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন।

নন্দকুমার যৎকালে ইয়ার বেগের সময় হুগলীতে দেওয়ান ছিলেন, সেই সময় তাঁহার নিকট নন্দকুমারের অনেক টাকা প্রাপ্য হয়। নন্দকুমার এই সময় ইয়ার বেগের নিকট ১৪০০০৲ টাকা লইয়া সমস্ত দাবী হইতে তাঁহাকে নিষ্কৃতি প্রদান করেন; কিন্তু নবাবের ক্রোধের পাত্র হওয়ায় নন্দকুমার হুগলী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন।

ক্লাইভের প্রিয়পাত্র হওয়ায় হেষ্টিংসের ক্রোধ নন্দকুমারের উপর দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে ক্লাইভ বিলাতযাত্রা করিলেন ও ভ্যান্সিটার্ট

কলিকাতায় গবর্ণর হইয়া আসিলেন। ভান্সিটার্টের সময় বৃদ্ধ মীরজাফর পদচ্যুত এবং মীরকাশিম বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

নন্দকুমারের উপর মীরজাফরের পূর্ব্বে যে ক্রোধ হইয়াছিল এক্ষণে তাহা প্রশমিত হইল। নন্দকুমারও মীরজাফরকে পুনরায় মসনদে বসাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি এই সম্বন্ধে সাহাজাদা আলি গহুরকে (পরে সম্রাট্ সাহ আলম) যে পত্র দেন, সেই পত্র ঘটনাক্রমে ইংরাজগণের হস্তগত হইলে গবর্ণর ভ্যান্সিটার্ট তাঁহার কার্য্যকলাপ দর্শনার্থ একদল প্রহরী নিযুক্ত করেন।

এই সময়ে ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ আপনাদিগের ব্যবসায়ের জন্য কোম্পানির অনেক ক্ষতি ও দেশমধ্যে নানারূপ অত্যাচার করিতেছেন, এই মর্ম্মে নন্দকুমার জাফর খাঁর মোহরসম্বলিত একখানি পত্র ক্লাইবকে ও আর একখানি কোম্পানিকে লিখিয়া পাঠান। উক্ত দুইখানি পত্র ইংরাজদিগের হস্তগত হওয়ায় তাঁহারা নন্দকুমারের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন; তৎকাল হইতে ইংরাজ কর্ম্মচারীদের মধ্যে দুইটী দল হয়, একদলে ভ্যান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস, অপরদলে আমিয়ট্ ও এলিস প্রধান ছিলেন। এলিস্ ও আমিয়টের সহিত নন্দকুমারের পরিচয় ছিল। সেই সময়ে কর্ণেল কুট গোলযোগ-নিবারণের মানসে পাটনা যাইবার জন্য কলিকাতায় আসিলেন, কিন্তু তাঁহার তথায় যাওয়া স্থগিত হইল, এলিস্ ও আমিয়টের পরামর্শানুসারে নন্দকুমার চাকুরীর চেষ্টায় তাঁহার নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। নন্দকুমারকে হুগলীর ফৌজদারী দিবার জন্য কর্ণেল কুট মীরকাশিমকে অনুরোধ করেন, কিন্তু নবাব সে অনুরোধ গ্রাহ্য করেন নাই।

অতঃপর ইংরাজদিগের সহিত মীরকাশিমের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল, তিনি সিংহাসনচ্যুত হন এবং মীরজাফর নবাবের পদে পুনঃ স্থাপিত হন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দের ৬ জুলাই মীরজাফর খাঁর একান্ত অনুরোধে ইংরাজগণ নন্দকুমারকে সুবা বাঙ্গলার নায়েব দেওয়ানীপদে নিযুক্ত করেন (১) নবাব নজমউদ্দৌলা তখন

(১) এই সময় মহারাজ নন্দকুমার কুঞ্জঘাটা মধ্যে লালা নন্দরাম রায়ের বাটীর সংলগ্ন লাখেরাজ জমী খরিদ করতঃ গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তথায় কার্য্যোপলক্ষে বাস করেন, পরে উক্ত প্রতিবেশী নন্দরাম রায়ের পৌত্র জগৎচন্দ্র রায়ের সহিত নিজকন্যা সন্মানী দেবীর বিবাহ দেন। বর্ত্তমান কুঞ্জঘাটার রাজবাটীর উত্তরাংশে মহারাজ নন্দকুমারনির্ম্মিত সেই বাটীতে সম্প্রতি মহারাজের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট হইতে একটী প্রস্তরফলক স্থাপিত হইয়াছে।

সুবা বাঙ্গালার দেওয়ান ছিলেন। এই সময়ে নবাব মীরজাফরের বিশেষ অনুরোধে সাহ আলম বাদসাহ ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে নন্দকুমারকে "মহারাজ" উপাধিতে ভূষিত করেন।

এক্ষণে নন্দকুমার বঙ্গদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন, রাজা জমিদার সকলেই তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। নন্দকুমারের প্রতি মীরজাফরের এত বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তাঁহার অনুরোধে অন্তিমকালে তিনি কিরীটীশ্বরের চরণামৃত পান করিয়া ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন।

তাঁহার প্রাণত্যাগের পর নন্দকুমার ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন। মীরজাফরের মৃত্যুর পর, তাঁহার ঔরসে মনিবেগমের গর্ভজাত নজম উদ্দৌলা বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে বসিলেন। তাঁহাদিগের বংশের হিতৈষী হওয়ায় তিনি নন্দকুমারকে আপনার দেওয়ান করিবার জন্য কলিকাতার কাউন্সিলকে একান্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু কাউন্সিলের সভ্যেরা তাঁহাদের পরম শত্রু নন্দকুমারকে দেওয়ানী দিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। "মুর্শিদাবাদ-কাহিনী-" প্রণেতা নিখিলবাবু লিখিয়াছেন যে, নন্দকুমার কার্য্যচ্যুত হইয়া এক্ষণে নীরবে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু 'মুর্শিদাবাদ মসনদে'র ৩০৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, নন্দকুমার নজম উদ্দৌলার সময় হইতে তৎপুত্র সয়েফ উল্লার সময় পর্য্যন্ত খালসার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং সেই সময়ে 'রায় রওয়ান' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। শেষোক্ত মতটী আমার বিশ্বাসযোগ্য-কারণ "The Mushnud of Murshidabad" গ্রন্থটী নবাব বাড়ী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা হউক, এই সময়ে ভ্যান্সিটার্ট বিলাতযাত্রা করেন, বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে ভ্যান্সিটার্ট নন্দকুমারের দোষের কথা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ভ্যান্সিটার্ট বিলাত গেলে এবং ক্লাইব পুনর্ব্বার বাঙ্গালার গবর্ণর হইয়া আসিলে সেই পুস্তক কাউন্সিলে পঠিত হয়। তদবধি ক্লাইব নন্দকুমারের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। কোম্পানী বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। ক্লাইভ রেজা খাঁকে নবাব নজম উদ্দৌলার দেওয়ানপদে নিযুক্ত করিলেন। পূর্ব্বে খাঁ সাহেব নায়েব সুবা হইয়াছিলেন, এক্ষণে আবার নায়েব দেওয়ান হইয়া বাঙ্গলার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন।

তৎকালে নন্দকুমার ও মহম্মদ রেজা খাঁর মধ্যে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, কারণ নন্দকুমার যেমন সমগ্র হিন্দুসমাজের নেতা ছিলেন, মহম্মদ রেজা খাঁও সেইরূপ মুসলমান-সমাজের নেতৃত্ব করিতেন।

ক্লাইভ ভারতবর্ষে আসিয়া ভ্যান্সিটার্টের শাসনকালের অনেক প্রকার নিন্দাবাদ শ্রবণ করেন এবং তাহার তথ্যানুসন্ধানের জন্য অবশেষে তাঁহাকে নন্দকুমারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় এবং সেই সময় হইতে নন্দকুমারকে আবার তিনি স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন; পরে ভ্যান্সিটার্টের শাসনকালের আমূল বৃত্তান্ত নন্দকুমারের দ্বারা লিখাইয়া লইয়া সেই বৃত্তান্ত সহ ক্লাইভ পুনরায় বিলাত যাত্রা করেন।

ক্লাইভ বিলাত যাত্রা করিলে ভের্লেষ্ট কলিকাতার গবর্ণর হইয়া আসেন। সেই সময় শোভাবাজার-রাজবংশীয় রাজা নবকৃষ্ণ নন্দকুমারের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠেন ও নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ভের্লেষ্টের নিকট নানারূপ নিন্দাবাদ করিয়া নন্দকুমারের প্রতি গবর্ণরের বিরক্তি জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে ভের্লেষ্ট বিলাত যাত্রা করিলে তাঁহার পদে কার্টিয়ার সাহেব নিযুক্ত হন।

এই কার্টিয়ারের সময় বঙ্গাব্দ ১১৭৬ সালে বা ১৭৭০ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালায় বিষম দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল; ইহাকে লোকে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" বলিয়া থাকে। এই দুঃসময়ে বাঙ্গলার নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজাখাঁর অত্যাচারে দেশের যাবতীয় লোক অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিল, সেই জন্য তাঁহার নামে অভিযোগ হয়।

[নন্দকুমার ও রেজাখাঁর বিচার]

১৭৭২ খৃঃ অব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস গবর্ণরপদে নিযুক্ত হইলেন। ডিরেক্টার তাঁহাকে রেজাখাঁর বিচার করিতে অনুমতি করিলেন, তিনি রেজাখাঁকে বন্দী করিয়া কলিকাতা পাঠাইবার জন্য মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট মিডল্‌টন্‌কে আদেশ দেন। রেজাখাঁ কলিকাতায় আনীত হইলেন। হেষ্টিংস নন্দকুমারের প্রতি পূর্ব্ব হইতে বিরক্ত থাকিলেও উপস্থিত কার্য্যোদ্ধারের জন্য মহম্মদরেজা খাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণসংগ্রহের নিমিত্ত নন্দকুমারকে নিযুক্ত করিলেন। নন্দকুমারও রেজাখাঁর বিচারের জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় দুই বৎসর বিচারের পর রেজা খাঁ নিষ্কৃতি পাইলেন। নন্দকুমারের কার্য্যে হেষ্টিংস এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে নন্দকুমারের বিংশতি বর্ষ বয়স্ক পুত্র গুরুদাসকে(১) মোবারক উল্লার দেওয়ান(২) পদে নিযুক্ত করেন।

(১) দীর্ঘজীবি প্রাণকৃষ্ণ রায় রাজা গুরুদাস গৌড়পতি বাহাদুরকে জ্ঞানবান্ হইয়া দেখিয়াছিলেন; তিনি বলিতেন, রাজাবাহাদুর অত্যন্ত স্থূলকায় ছিলেন। গৃহের দ্বিতলে আরোহণ ও তথা হইতে অবতরণ করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইত বলিয়া তিনি প্রায়ই নিম্নতলে থাকিতেন। প্রাণকৃষ্ণের মুখে শুনা যাইত যে রাজাবাহাদুর যখন দেওয়ানপদে অধিষ্ঠিত হয়েন তখন তাঁহার বিংশতি-বর্ষমাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল এবং অষ্টাবিংশতিবর্ষ-বয়ঃক্রমকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

(২) 'Mushnud of Murshidabad' গ্রন্থের ৪৩ পৃঃ।

১৭৭২খৃঃ অব্দে যখন লর্ড নর্থ ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, সেই সময়ে রাজ্য সংক্রান্ত কতকগুলি নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়, তাহাতে বাঙ্গালার গবর্ণরকে ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনারেল করা হয় ও তাঁহার সাহায্যার্থ চারিজন সদস্য মনোনীত করিয়া একটি কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতি (Executive Council) গঠিত হয় এবং দেশে সুবিচারের জন্য সুপ্রীমকোর্টের প্রতিষ্ঠা হইয়া তাহাতে একজন প্রধান বিচারপতি ও অপর তিনজন বিচারক নিযুক্ত হন। গবর্ণর জেনারেল ও চারিজন সভ্যের মধ্যে বারওয়েল পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে ছিলেন অপর তিন সভ্য ক্লেভারিং, মনসন্ ও ফ্রান্সিস এবং সুপ্রীমকোর্টের প্রধান জজ সার ইলাইজা ইম্পে ও অপর জজত্রয় চেম্বার্স হাইড ও লেমেষ্টেয়ার ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে এপ্রিল মাসে বিলাত হইতে যাত্রা করিয়া ১৯শে অক্টোবর কলিকাতায় চাঁদপালঘাটে আসিয়া উপস্থিত হন। এই নবাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে সদস্যগণের সহিত গবর্ণরের বিরোধ উপস্থিত হইল। এই সদস্যগণ দেশের শাসনকার্য্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বহুদর্শী কার্য্যদক্ষ নন্দকুমারের সহায়তা গ্রহণ করিলেন।

[নন্দকুমার ও ইংরাজগবর্ণরের কাউন্সিল]

নন্দকুমার হেষ্টিংস সাহেবের বিরুদ্ধে অনেক দোষ সংগ্রহ করিয়া ১৭৭৫ খৃঃ অব্দের ৮ই মার্চ্চ লিখিত এক আবেদন পত্র কাউন্সিলে প্রদান করেন। ১১ই মার্চ্চ ফ্রান্সিস কাউন্সিলে উক্ত পত্র পেস করিলেন। ইহাতে হেষ্টিংস নন্দকুমারের ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন এবং নন্দকুমারের পরম শত্রু বর্দ্ধমানের রেসিডেণ্ট গ্রেহেম সাহেব শত্রুতা সাধনের নিমিত্ত হেষ্টিংসের সহায়তা করিতে লাগিলেন। গ্রেহাম সাহেবের মুন্সী সদরউদ্দীন, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, কান্তবাবু, নবকৃষ্ণ প্রভৃতিও সাধ্যমত হেষ্টিংসের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন কি নন্দকুমারের জ্যেষ্ঠ জামাতা রায় জগৎচন্দ্র (বর্ত্তমান কুঞ্জঘাটারাজবংশের আদি-পুরুষ) শ্বশুরের বিরুদ্ধে যোগদান করেন।

জগৎচন্দ্র মহারাজের সুপারিশে মুর্শিদাবাদের নবাবসরকারে পরিচিত কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। মীরজাফর নবাবপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে নবাবের পক্ষে একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী কলিকাতায় থাকা প্রয়োজন বিবেচনায় মহারাজ নিজ জামাতা জগৎচন্দ্রকে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন (১), কিন্তু ১৭৭০ খৃঃ অব্দে নাবালক মোবারকউদ্দৌলা রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে

১) কুঞ্জঘাটা রাজধানী হইতে প্রকাশিত 'ভদ্রপুর ইতিবৃত্ত' ২৭ পৃঃ।

জগৎচাঁদ অলিমাতা মণিবেগমের অধীন দারোগাপদে প্রতিষ্ঠিত হন(১) পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে রাজা গুরুদাস দেওয়ানপদে অধিষ্ঠিত হন, উক্ত দেওয়ানীপদলাভ করিবার জন্য জগৎচাঁদের বিশেষ চেষ্টা ছিল, কিন্তু মহারাজ তাঁহার সে আশা পূর্ণ করিতে না পারায় জামাতা শ্বশুরের উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং সুযোগ বুঝিয়া জগৎচাঁদ প্রকাশ্যভাবে হেষ্টিংসের সহায়তা করিতে লাগিলেন। নন্দকুমার ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া তৎপুত্র গুরুদাসকে যে পত্র দেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীশ্রীহরি

শরণম্

সন ১১৭৮ সাল

২৯শে পৌষের খত

প্রাণপ্রতিমেষু—

পরমশুভাশীর্ব্বাদ শিবঞ্চবিশেষঃ—

তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনা করণক অত্রকুশল পরন্তুঃ ২৫শে তারিখের পত্র ২৭শে রোজ রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম * * * * শ্রীযুক্ত রায় জগৎ চন্দ্র বিশরোজের পর বাটী হইতে আসিয়াছেন। যেমত যেমত কুচেষ্টা পাইতেছেন, তাহা জানাই গেল তিনি যথা যথা যাউন ফলতঃ কার্য্যের দ্বারাতেই বুঝিবেন, পষ্ট হইয়া আপনারই মন্দ করিতেছেন, সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেক। * * *

১৩ই মার্চ্চ পুনরায় কাউন্সিলের অধিবেশন হয়, তাহাতে নন্দকুমার নিজে উপস্থিত হইয়া হেষ্টিংসের উপর আরোপিত দোষ সকল প্রমাণ করিতে স্বীকৃত হয়েন। নন্দকুমারের সভাস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য মন্‌সন্ সাহেব প্রস্তাব করিলে গবর্ণর হেষ্টিংস ও বারওয়েল অনেক তর্ক বিতর্ক করেন। কিন্তু যখন অন্যান্য সভ্যগণ তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া নন্দকুমারকে

(১) 'Mushnud of Murshidabad' গ্রন্থের ২২৯ পৃঃ।

আহ্বান করিতে আদেশ দিলেন তখন হেষ্টিংস সাহেব সভাভঙ্গের আদেশ দিয়া বারওয়েল সহ সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু অপর সভ্যত্রয় গবর্ণরের প্রস্তাব গ্রাহ্য না করিয়া সভার কার্য্য করিতে লাগিলেন। নন্দকুমার যথা-সময়ে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভিযোগের প্রমাণস্বরূপ কতকগুলি দলিল উপস্থিত করিলেন।

[নন্দকুমার সম্বন্ধে হেষ্টিংসের অভিযোগ]

ইতোমধ্যে হেষ্টিংস সাহেব সুপ্রীমকোর্টের জজদিগের নিকট ১৭৭৫ খৃঃ ১৯শে এপ্রিল এরূপ লিখিয়া পাঠান যে, হিজলীর ইজারাদার কমলউদ্দীন খাঁ তাঁহার নিকট আসিয়া প্রকাশ করে যে, নন্দকুমার ও ফাউক(১) তাহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক হেষ্টিংস, বারওয়েল প্রভৃতির নামে উৎকোচ গ্রহণের এক মিথ্যা আর্জ্জি(২) লইয়াছে ও গঙ্গাগোবিন্দ প্রভৃতির নামে আর্জ্জি ফেরত চাহিলে নন্দকুমার তাহা প্রত্যর্পণ করিতেছে না। হেষ্টিংসের এই পত্র পাইয়া সুপ্রীমকোর্টের জজ মহোদয়েরা ২৯শে এপ্রিল হইতে ইহাকে গবর্ণর ও বারওয়েল প্রভৃতির নামে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ধরিয়া প্রাথমিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে কমলউদ্দীনের অভিযোগের দরখাস্ত লওয়া হয়। কমলউদ্দীন দরখাস্তে প্রকাশ করে যে সে গঙ্গাগোবিন্দকে ভয় দেখাইবার জন্য উৎকোচ গ্রহণের মিথ্যা আর্জ্জি নন্দকুমার প্রভৃতির নিকট প্রদান করে। বাস্তবিক তাহা তাহার পেস করিবার ইচ্ছা ছিল না। এই আর্জ্জি ফেরত চাহিলে নন্দকুমার বলেন যে, কমলউদ্দিন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে আর্জ্জি লিখিয়া দিলে গঙ্গাগোবিন্দের আর্জ্জি ফেরত দিবেন। সে কারণে কমল বাধ্য হইয়া হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে আর্জ্জি লিখিয়া দেয়। পরে নন্দকুমার জামাতা রাধাচরণের সহিত ফাউকের নিকট গমন করিলে তিনি বলপূর্ব্বক কমলকে গবর্ণরের বিরুদ্ধে আর্জ্জিতে মোহর করাইলেন। নন্দকুমারের জবানবন্দীতে প্রকাশ

(১) একজন বিশিষ্ট ইংরাজ। ইহাঁ দ্বারা কমলউদ্দীন কাউন্সিলে গঙ্গাগোবিন্দ প্রভৃতির বিরুদ্ধে লিখিত একটী আর্জ্জি প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

(২) এই আর্জ্জি দ্বারা কমলউদ্দিন গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও আর্চডেকিন নামক জনৈক কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে উৎকোচ দেওয়ার অভিযোগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল এবং ফাউক নামক কোনও বিশিষ্ট ইংরাজ দ্বারা কাউন্সিলে আর্জ্জি প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হয় এবং তজ্জন্য ফাউককে অনুরোধ করিবার জন্য নন্দকুমারের প্রয়োজন হইয়া উঠে। নন্দকুমার তাঁহার জামাতা রাধাচরণের সহিত কমলউদ্দীনকে ফাউকের নিকট পাঠাইয়া দেন।

যে, কমলউদ্দীন গঙ্গাগোবিন্দ প্রভৃতির আর্জ্জি ফেরত চাহে নাই বরং তাহা কাউন্সিলে দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিল এবং কমলউদ্দিন নিজেই গবর্ণরের বিরুদ্ধে আর্জ্জি লিখিয়া নন্দকুমারের নিকট উপস্থিত হয়। এই বিষয়ের অনুসন্ধানে বিশেষ কোন ফল হয় নাই।

[বোলাকীদাস ও মহারাজ নন্দকুমার]

বোলাকীদাস শেঠ নামক জনৈক আগরওয়ালা বেণিয়া প্রায়ই মুর্শিদাবাদে থাকিয়া মহাজনী করিত। মীর কাশিমের সময় হইতে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়। বোলাকীদাসের নিকট মহারাজ নন্দকুমার একছড়া মুক্তার কণ্ঠী, একখানি কনকা, একটী শিরপেচ ও চারিটী হীরকাঙ্গুরীয় ৪৮০২১৲ টাকা মূল্যে বিক্রয়ার্থ প্রদান করেন। মীরকাশিমের সহিত ইংরাজদিগের বিবাদ উপস্থিত হইলে দেশের চারিদিকে ভয়ানক লুণ্ঠন ব্যাপার আরম্ভ হয়, তাহাতে বোলাকীদাসের বাটী লুণ্ঠিত হয়। সেই সময়ে নন্দকুমারের সমস্ত জহরৎ অপহৃত হয়। বোলাকীদাস নন্দকুমারের জহরতের মূল্য স্বরূপ ৪৮০২১৲ টাকা ও প্রতি টাকায় ।০ আনা হিসাবে সুদ দিতে স্বীকৃত হয়েন এবং কোম্পানির নিকট দুই লক্ষেরও উপর টাকা পাওনা আছে, তাহা পাইলেই পরিশোধ করিয়া দিব ইহা অঙ্গীকারপত্রে লিখিয়া দেন; এই অঙ্গীকারপত্রে বোলাকীদাস মোহর করিয়া দিলেন এবং মাতাব রায় ও মহম্মদ কম্লন খাঁ আপন আপন মোহর ও বোলাকীদাসের উকীল শীলবৎ নিজের স্বাক্ষর সাক্ষীরূপে সংযুক্ত করিয়া দেন। বোলাকীদাসের মৃত্যু হইলে কোম্পানীর নিকট পাওনা টাকা হইতে নন্দকুমার পূর্ব্ব-অঙ্গীকারবলে, বোলাকীদাসের সম্পত্তির আমমোক্তার (executor) পদ্মমোহন দাসের সম্মতিতে সেই টাকা পরিশোধ করিয়া লন। বোলাকীদাসের আমমোক্তার মোহনপ্রসাদ এই সকল বিষয় সমস্তই জানিতেন, কালক্রমে অঙ্গীকার পত্রের সমস্ত সাক্ষী ও মোহনপ্রসাদের মৃত্যু হইলে গঙ্গাবিষ্ণু নামে বোলাকীর এক আত্মীয় ও বোলাকীদাসের বিধবা পত্নী তাঁহার সম্পত্তির অধিকারী হন। মোহনপ্রসাদ তাঁহাদেরও আমমোক্তার ছিলেন। তিনি, নন্দকুমার বোলাকীদাসের নামের অঙ্গীকারপত্র জাল করিয়াছেন ও মিথ্যা করিয়া তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণের নিকট হইতে অর্থ লইয়াছেন বলিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। নন্দকুমারের নামে সুপ্রীমকোর্টে এই অভিযোগ উপস্থিত করিলে জজেরা ১৭৭৫ খৃঃ অব্দের ৬ই মে রাত্রি দশটার সময় নন্দকুমারকে জেলে পাঠাইলেন। ৮ই জুন কলিকাতার সুপ্রীমকোর্টে নন্দকুমারের জালিয়াতি অভিযোগের বিচার আরম্ভ

হয়। নন্দকুমারের পক্ষে জারেট এটর্ণি ও ফেবার কাউন্সিলি মোকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন। এ মোকদ্দমায় ইংলণ্ডাধিপতি ফরিয়াদি ও ফরিয়াদির পক্ষ হইতে এরূপ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হয় যে, বোলাকীদাসের অঙ্গীকার পত্রে যে তিনজন সাক্ষী ছিল তন্মধ্যে শীলাবতের মৃত্যু হইয়াছে, মাতাব রায় নামে কোন লোকই ছিল না ও মহম্মদ কমলউদ্দীন খাঁ ব্যতীত আর কেহই নহে। আসামী পক্ষ হইতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হয় যে, অঙ্গীকারপত্রের তিন জন সাক্ষীরই মৃত্যু ঘটিয়াছে। বাহুল্যভয়ে সাক্ষীগণের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করা গেল না। ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত মুর্শিদাবাদ-কাহিনীতে ও বিভারিজ প্রণীত মহারাজ নন্দকুমারের জীবনচরিতে বর্ণিত আছে। যাহা হউক, নানা প্রকার প্রমাণাদি গ্রহণের পর নন্দকুমারকে দোষী স্থির করিয়া বিচারপতিগণ জুরিদিগকে অভিযোগ ও তৎসংক্রান্ত প্রমাণাদি বিষয় (চার্জ্জ) বুঝাইয়া দিলেন। জুরিগণ প্রায় এক ঘণ্টা বিচার করিয়া নন্দকুমারকে দোষী বলিয়া প্রকাশ করেন। তজ্জন্য তৎকালের নিয়মানুসারে ১৬ই জুন মহারাজের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। কারাগারের একটী স্বতন্ত্র দ্বিতল গৃহে তাঁহার অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তথায় মহারাজ বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত কথোপকথনে ও শাস্ত্রালাপে মৃত্যু-সময় পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেন। প্রাণদণ্ডাজ্ঞার পর হইতে ২২ দিন মাত্র তিনি এ পাপ পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। সেই সময় তিনি নিজের দোষহীনতার কথা উল্লেখ করিয়া ফ্রান্সিস্ ও ক্লেভারিংকে একখানি পত্র লিখেন। তাঁহারা এবং নবাব মোবারক উদ্দৌলা নন্দকুমারকে বাঁচাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

ক্রমে মহারাজের মৃত্যুর দিন অগ্রসর হইয়া আসিল। কলিকাতার তদানীন্তন শেরিফ ম্যাক্রেবী সাহেব শেষ দুই দিনের ঘটনা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"৪ঠা আগষ্ট শুক্রবার সন্ধ্যাকালে আমি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই, তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া এরূপ ভাবে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন যে আমি চমৎকৃত হইয়া ভাবিলাম, কল্য যে তাঁহাকে এ জগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা তিনি অবগত নহেন। অবশেষে আমি দ্বিভাষী দ্বারা জ্ঞাত করাইলাম যে, আমি অদ্য তাঁহাকে শেষ অভিবাদন করিতে আসিয়াছি কল্য সেই শোচনীয় ব্যাপারে মহারাজের যেরূপ সুবিধা হয়, তজ্জন্য কর্ত্তব্যানুরোধে আমাকে সমস্ত করিতে হইবে। আপনার যে সমস্ত অন্তিম বাসনা আছে, তাহা

পূর্ণ করিতে আমি চেষ্টা পাইব। আপনার শিবিকা ও বাহকগণ নিয়মিত সময়ে আপনার গৃহ-সম্মুখে অপেক্ষা করিবে ও আপনার যে সমস্ত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন আছেন তাঁহাদিগকেও আদর যত্ন করিতে চেষ্টা করিব।

মহারাজ উত্তর দিলেন যে, আপনার সাক্ষাতের জন্য আমি আপ্যায়িত হইয়াছি এবং তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। পরে তিনি কপালে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, বিধাতার ইচ্ছা অবশ্যই সম্পূর্ণ হইবে। তিনি ক্লেভারিং, মনসন্ ও ফ্রান্সিস্‌কে সম্মান প্রদর্শন করিয়া রাজা গুরুদাসের তত্ত্বাবধানের জন্য ও তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতা বলিয়া মনে করিতে অনুরোধ করেন। সেই সময়ে তাঁহার শান্তভাব অতিশয় বিস্ময়-জনক, তিনি একটীও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই, স্বরের কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা কথার চাপল্য-ভাব ছিল না। আমি জ্ঞাত হইলাম যে কিছু পূর্ব্বে তাঁহার জামাতা রায় রাধাচরণের নিকট হইতে চির বিদায় লইয়াছিলেন। তাঁহার অদ্বিতীয় দৃঢ়তার বিষয় চিন্তা করিয়া আমাদিগকে অতি অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। নীচে আসিলে জেলরক্ষক আমাকে বলিলেন, তাঁহার আত্মীয় স্বজন বিদায় গ্রহণ করিলে তিনি নিজ হিসাব পরিদর্শন ও মন্তব্যাদি লিখিতেছিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে জেলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম অনাথ দরিদ্রগণের কাতর রোদন ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাহারা মহারাজের শেষ দর্শন লাভ করিতে আসিয়াছে। মহারাজ জেলরক্ষকের অবস্থানের একটী গৃহে আসিয়া উপবেশন করিলে আমিও তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলাম। মহারাজ প্রসন্ন চিত্তে তিন জন ব্রাহ্মণকে তাঁহার মৃত দেহ বহন করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন, তাহারা দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িল। আমি আমার ঘড়ি দেখিয়া মহারাজকে বলিলাম যে এখনও সময় হয় নাই। তিনি আবার আমাকে গুরুদাস, ক্লেভারিং, মন্‌সন্ ও ফ্রান্সিসের কথা বলিলেন, পরে এক মনে ঈশ্বরধ্যানে নিমগ্ন হইলেন, অবশেষে তিনি উঠিয়া আমাকে ইঙ্গিত করিয়া জেলখানার ভৃত্যদিগকে তাঁহার পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি রাজা গুরুদাসের নিকট লইয়া যাইতে বলিয়া, পাল্কী আরোহণে বধ্যভূমি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমরা গিয়া দেখিলাম, সেই প্রশস্ত ময়দান লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মহারাজ তাঁহার সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণ তিনটীর জন্য আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন, পরে তাঁহারা উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের সহিত কোন গুপ্ত কথা আছে মনে করিয়া আমি লোকজন সরাইয়া দিতে চাহিলাম। মহারাজ আমাকে নিষেধ করিয়া তাঁহাদিগকে গুরুদাস ও তাঁহার পরিবার-

বর্গের কথা মনে করিয়া দিলেন। মহারাজ আমাকে সেই তিন জন ব্রাহ্মণের দ্বারা মৃতদেহ বহন করাইবার জন্য অনুরোধ করেন ও আর কাহাকেও তাহা স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়া যান। তিনি জনতার জন্য কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই, তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাতের কথা বলিলে তিনি বলেন যে, আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছেন, এ স্থলে সকলের সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন নাই। পরে তিনি এক জনের নাম করিয়াছিলেন অবশেষে তাঁহাকেও উপস্থিত হইতে নিষেধ করেন। আমাকে পুনর্ব্বার প্রশান্তচিত্তে ক্লেভারিং, মন্‌সন্‌ ও ফ্রান্সিসের কথা স্মরণ করিতে বলেন, তাহার পর তিনি পাল্কীতে ঠেস্‌ দিয়া জপ্‌ করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম গোলমালে তাঁহার কথা বুঝিতে পারিব না, অতএব সময় হইলে তিনি যেন কোনরূপ ইঙ্গিত করেন; তিনি বলিলেন যে তিনি হস্ত দ্বারা সঙ্কেত করিবেন। পরে তাঁহার হস্ত বদ্ধ থাকার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি পা নাড়িয়া সঙ্কেত করিতে স্বীকৃত হয়েন। সময় উপস্থিত হইলে আমি বধ্যমঞ্চের নিকট তাঁহার পাল্কী লইয়া যাইতে বলিলাম, তিনি নিষেধ করিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইলেন। মঞ্চের সোপানের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহার হস্তদ্বয় একখানি রুমাল দিয়া আবদ্ধ করা হয়। পরে তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিবার আবশ্যক হইলে তিনি আমাদিগকে তাহা করিতে নিষেধ করেন। আমি একজন ব্রাহ্মণ সিপাহীকে আদেশ করিলে মহারাজ তাঁহার একটী ভৃত্যকে আদেশ করিলে ভৃত্যটী তখন তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতেছিল। মহারাজ ঋজুভাবে দণ্ডায়মান হইয়া মঞ্চোপরি উঠিলেন। আমি তাঁহার প্রশান্ত বদনে কোনরূপ বিকৃত ভাব দেখিলাম না। পরে আমি নিজে স্থির থাকিতে না পারিয়া স্বীয় শিবিকা-মধ্যে পলায়ন করিলাম, শিবিকায় বসিতে বসিতে মঞ্চাপসারণের শব্দ শুনিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পরে শান্ত হইয়া দেখিলাম মহারাজের হস্তদ্বয় যেরূপভাবে প্রথমে বদ্ধ ছিল, সেইরূপ ভাবেই অবস্থিত আছে এবং তাঁহার বদনমণ্ডলে কোনরূপ বিকৃতির চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। ফলতঃ এই শোচনীয় ব্যাপারে মহারাজ নন্দকুমার যেরূপ প্রশান্তভাব ও দৃঢ়তা দেখাইয়াছিলেন, সেরূপ স্থিরচিত্ততার উদাহরণ আমি কখনও শুনি নাই বা পাঠ করি নাই। অবশেষে সেই ব্রাহ্মণত্রয় তাঁহার মৃতদেহ দাহ-করণার্থ বহন করিয়া লইয়া যায়।"

মহারাজের বধ্যভূমির নির্দিষ্ট স্থানের কোন উল্লেখ নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে খিদিরপুরের নিকটে কুলী-বাজার ও হেষ্টিংস-সেতুর মধ্যবর্ত্তী নদীর নিকটস্থ শূন্য ময়দানে নন্দকুমারের বধমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্যে সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে এক মর্ম্মস্পৃক্ কাতরধ্বনি আকাশ পথে উত্থিত হইল। অনেকে সেই দৃশ্য দেখিতে অশক্ত হইয়া পলায়ন করিলেন, কেহ কেহ বা পাপদৃশ্য-দর্শন-জনিত পাপ-বিমোচনার্থ পবিত্রসলিলা ভাগীরথীর জলে অবগাহন করিলেন। এমন কি, মহারাজের প্রাণবায়ু নিঃশেষ হইবামাত্র অনেকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বালি প্রভৃতি স্থানে বাসস্থান স্থানান্তরিত করিলেন। মহারাজের মৃত্যুতে দেশের ভিতর যেরূপ শোকোচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছিল, নিম্নলিখিত গানটীতে তাহার অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে।

গীত

'মহারাজ নন্দকুমার রে।
তোর রাজ্যপাট জমিদারী কারে দিলি রে ?
নন্দকুমার রায় ছিল বাঙ্গালার অধিকারী।
হেষ্টিংস সাহেব এল জান করিবারে বারি॥
নন্দকুমারের মা কাঁদে ঐ গাঙ্গের পানে চেয়ে।
আর না আসিবে বাছা জোড়া ডিঙ্গী বেয়ে,
খোঁপেতে কৌতর কাঁদে, কাঁদে ফোয়ারাতে হাঁস,
ঘোড় বাঙ্গালায় কাঁদে সোনার গুলতি বাঁশ,
ছোট রাণী উঠে বলে বড় রাণী গো দিদি
সিতেঁর ছিল কড়া সিন্দুর বঞ্চিত করিল বিধি॥

পরে মহারাজের হত্যাকাণ্ড লইয়া ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং হেষ্টিংস ও ইম্পের তজ্জন্য বিচারও ঘটিয়াছিল, মহামতি বার্ক সাহেব তাঁহার জ্বালাময়ী ভাষায় হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে হাউস অব্ কমন্সে যে অভিযোগ আনয়ন করেন তাহা সকলেই অবগত আছেন।

মহারাজ নন্দকুমার একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু বৈষ্ণব ছিলেন। সকল দেবতা ও সকল সম্প্রদায়কেই তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব-গণের ন্যায় তাঁহার হৃদয় সংকীর্ণ ছিল না সেই জন্য তিনি গুহ্যকালী, গৌরীশঙ্কর প্রভৃতি প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়া উদার ধর্ম্মমতের নিদর্শন দেখাইয়া যান। মালীহাটীর সুপ্রসিদ্ধ রাধামোহন ঠাকুরের নিকট তিনি দীক্ষিত হয়েন। রাধামোহন নন্দকুমারকে বরাবরই স্নেহচক্ষে দৃষ্টি করিতেন, সেই জন্য তিনি তাঁহাদের পূর্ব্ব

পুরুষ শ্রীনিবাস আচার্য্য পূজিত সপার্ষদ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের একখানি সুন্দর চিত্র নন্দকুমারকে প্রদান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই চিত্র কুঞ্জঘাটা রাজ-বাটীতে বিদ্যমান রহিয়াছে। বঙ্গের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ তাঁহার নিকট হইতে অনেক সাহায্য ও বৃত্তিলাভ করিতেন। বৈষ্ণব ও দরিদ্রের পক্ষে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। নন্দকুমার একবার লক্ষ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া মহাসমারোহে এক মহা ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে যথেষ্ট সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা ও ভোজনাদি করান হয়। কথিত আছে কৃষ্ণনগরাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও নাটোরাধিপতি-প্রমুখ তৎকালের মহামাননীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া সেই ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং নাটোরের দেওয়ান দয়ারাম ভাণ্ডারীর কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। এই ব্রাহ্মণভোজন ও দয়ারাম সম্বন্ধে অত্র প্রদেশে এক গ্রাম্য কবিতা প্রচলিত আছে।

১। বাগান্ন লাথী দয়ারাম।
সে হবে ভাণ্ডার কাম॥
২। ভাদ্রের নন্দকুমার
লক্ষ বামুন কল্লে শুমার
কেউ খে'লে মাছের মুড়ো।
কেউ খেলে বন্দুকের হুড়ো॥

মহাসমারোহ ব্যাপারে সামান্য ত্রুটী অনিবার্য্য হইলেও মহারাজ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের প্রতি যথেষ্ট সমাদর দেখাইয়া লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন; অদ্যাপি সেই ধূলির কতক অংশ কুঞ্জঘাটা রাজবাটীতে সযত্নে রক্ষিত আছে। লক্ষব্রাহ্মণ-ভোজনকালে যে সকল কাষ্ঠাসন বা পীড়া নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহারও দুই চারিখান কুঞ্জঘাটা রাজবাটীতে দেখিতে পাওয়া যায়, লক্ষ ব্রাহ্মণ যে তোরণদ্বার দিয়া মহারাজের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বৃন্দাবনচন্দ্র নামে এক বিগ্রহ তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদ্ভিন্ন আকালীপুর নামক স্থানে তিনি সন ১১৭৮ সালে ১১ই মাঘ রটন্তীচতুর্দ্দশীতিথিতে "গুহ্যকালী" ও "গৌরীশঙ্কর" প্রতিমাদ্বয় প্রতিষ্ঠা করিয়া বীরভূমে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

নন্দকুমার ভদ্রপুরে তাঁহার পত্নী ক্ষেমঙ্করীর পুণ্যার্থে "রাণীসায়ের" নামক

একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। তাহারই নিকটে রাজা গুরুদাসের খনিত গুরুসায়েব (১) নামক একটী সুবৃহৎ জলাশয় বিদ্যমান আছে।

মহারাজের ভদ্রপুরের বাটী ব্যতীত মুর্শিদাবাদে আরও দুইটী বৃহৎ রাজবাটী ছিল। ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে নবাব বাহাদুরের বাটীর সন্নিকটে সা নগর (২) ঘাটের উপর যে গৃহ ছিল, তাহা তিনি নবাবসরকারে কার্য্যকালে বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। দ্বিতীয়টী সয়দাবাদের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত, তাহার নাম কুঞ্জঘাটা-রাজবাটী (৩) তাহাতেও মহারাজ নবাব-সরকারে কার্য্য করিবার সময় বাস করিতেন। ইহা ব্যতীত কুঞ্জঘাটার অনতিদূরে উত্তরদিকে ফরাসডাঙ্গা নামক যে স্থান আছে, সে স্থানে বেগমের বাগান (৪) মধ্যে মহারাজের সুরম্য বৈঠকখানা অবস্থিত ছিল। এই স্থানে মহারাজ মধ্যে মধ্যে যাইয়া বিশ্রাম করিতেন। মুর্শিদাবাদে কার্য্যকালে তাঁহার নিজ রাজকার্য্য দীন সামন্ত নামক সচিবের দ্বারা সম্পাদিত হইত।

মহারাজ যে ধন অর্জ্জন করিতেন, তাহার অধিকাংশ সৎকার্য্যেই ব্যয় করিতেন, তথাপি মৃত্যুকালে তিনি বায়ান্ন লক্ষ টাকা নগদ এবং বায়ান্ন লক্ষ টাকার জহরৎ রাখিয়া যান।

মহারাজ নন্দকুমারের গুরুদাস নামে এক পুত্র এবং সম্মানী, আনন্দময়ী ও কিনুমনি নামে তিন কন্যা। তাঁহার কন্যা সম্মানীর সহিত মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কুঞ্জঘাটা রাজবংশের আদিপুরুষ রায় জগৎচন্দ্রের বিবাহ হয়। আনন্দময়ীর নদীয়া জেলার অন্তর্গত শিঙ্গিতে বিবাহ হইয়াছিল, এইরূপ শুনা যায়।

নন্দকুমারের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত রায় রাধাচরণের বিবাহ হইয়াছিল। হুগলীর সন্নিকটে ভাটপাড়ায় রাধাচরণের বাটী এখনও বিদ্যমান আছে এবং তাঁহার দৌহিত্রবংশীয় বর্ত্তমান বংশধরের নাম কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

মহারাজের মৃত্যুর পর তৎপুত্র গুরুদাস তাঁহার বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। পিতার অকালমৃত্যুতে শোকবিহ্বল হইয়াও তিনি শাস্ত্রানুসারে

(১) গুরুসায়েরের পশ্চিম তীরে একটী জীর্ণ দেবালয় অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাহাতে নয়টী শিবস্থাপনা ছিল, অনেকে তাহা দেখিয়াছেন, কিন্তু সম্প্রতি তাহা অদৃশ্য হইয়াছে।

(২) See Mushnud of Murshidabad Page 232.

(৩) এক্ষণে তাহাতে মহারাজ নন্দকুমারের দৌহিত্রবংশীয় কুমার দেবেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর বাস করিতেছেন।

(৪) এই বেগমের বাগান মহারাজ নিজামৎ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি বিপুল ব্যয়ে সম্পন্ন করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। তিনি পিতার ন্যায় অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন না হইলেও ধীর, গম্ভীর, দয়াদাক্ষিণ্যাদিসম্পন্ন এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। পুত্র গুরুদাস সাহআলম্ বাদসাহের নিকট হইতে 'রাজা গৌরপৎ' উপাধি, তিন সহস্র অশ্বারোহী, দুই সহস্র পদাতিক ও ঝালরদার পাল্কী রাখিবার সনন্দ (১) প্রাপ্ত হয়েন।

রাজা গুরুদাস পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। প্রাচীন-লোকমুখে শুনা যায়, তাঁহার রাজ্যে এরূপ প্রবল শাসন ছিল যে, তাঁহার জমিদারী মধ্যে পরদারাদি পাপানুষ্ঠান লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। গৌরপৎ বাহাদুর নবাব-সরকারে কার্য্যকালে মুর্শিদাবাদ কুঞ্জঘাটায় বাস করিতেন। সে সময় তাঁহার নিজ রাজকার্য্যের ভার তাঁহার পিস্তুত অগ্রজ দেবীরামের (২) হস্তে ন্যস্ত ছিল। ভদ্রপুরের লোকমুখে শুনা যায় যে, রাজা গুরুদাস গৌরপৎ বাহাদুর তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর ছয় বৎসর কাল মাত্র জীবিত ছিলেন। উক্ত প্রবাদ বাক্য বিশ্বাস করিলে রাজা গুরুদাস ১৭৮১ খৃঃ মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁহার অনুমতিক্রমে তাঁহার পত্নী রাণী জগদম্বা এক পোষ্যপুত্র (৩) গ্রহণ করেন; কিন্তু ঐ পুত্রটী শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রাজা গুরুদাসের মৃত্যুর পর, তদীয় পত্নী রাণী জগদম্বা নন্দকুমারের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন। তিনিও স্বামীর ন্যায় দানশীলা ছিলেন। কিন্তু রাজা গুরুদাসের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই মহারাজ নন্দকুমারের দৌহিত্র, সয়দাবাদ-নিবাসী জগচ্চন্দ্রের পুত্র রাজা মহানন্দ (৪) নন্দকুমারের সমস্ত সম্পত্তি

(১) এই সনন্দখানি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে উপহার দেওয়া হইয়াছে।

(২) এই দেবীরামের নাম ভদ্রপুরের রাজবাটীর চাপা কাষ্ঠে অঙ্কিত আছে।

(৩) শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতামহ ভ্রাতাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের কথা প্রাচীন লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

(৪) ভদ্রপুরের প্রাচীন লোকমুখে শুনা যায় ও দীর্ঘজীবী প্রাণকৃষ্ণ রায় মহাশয় বলিতেন যে, রাণী জগদম্বার দ্বিতীয় পোষ্যপুত্র লইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রাজা মহানন্দ মাতুলের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া কিয়দ্দিনের মধ্যে সসৈন্যে ভদ্রপুরে প্রবেশ করতঃ রাজবাটী বেষ্টন করিলেন এবং বলপূর্ব্বক সমস্ত সম্পত্তি দখল করিয়া অস্থাবর সম্পত্তি যাহা মজুত ও প্রোথিত ছিল তৎসমস্ত বাহির করিয়া লইয়া যান, এখনও পর্য্যন্ত নীচের সমস্ত ঘরগুলি খনিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। রাণী জগদম্বা সমস্ত ধন বিনষ্ট হয় দেখিয়া বাড়ীর পশ্চাতে জল্লী নামক পুষ্করিণীতে কতক অর্থ ও জহরৎ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি আর উঠাইয়া লন নাই। সেই সকল ধন এখনও উক্ত পুষ্করিণীগর্ভে প্রোথিত আছে, এই কথা সকলেই বলিয়া থাকেন।

হস্তগত করেন। মহানন্দের সে সময় নবাবসরকারে বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল সেই জন্য পতিহীনা অসহায়া রাণী জগদম্বাকে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিতা হইয়াও নীরব থাকিতে হয়।

মহানন্দ ১৭৯৪ খৃঃ অব্দের বাবরজঙ্গের রাজত্বকালে নবাবসরকারে দেওয়ানী করিতেন, তাঁহার নবাব সরকারে এত প্রতিপত্তি ছিল যে, তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র বিজয়কৃষ্ণের বিবাহকালে নবাব বাবরজঙ্গকে তিনি নিজগৃহে আনিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কুঞ্জঘাটা রাজবাটীর সম্মুখস্থ ভূখণ্ডের নাম গোপালবাগ। উক্ত স্থানে মখমল, কিংখাপ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্রাদির দ্বারা একটী মণ্ডপ নির্ম্মিত করা হয়। নবাব বাহাদুরকে সেই মণ্ডপে আহ্বান করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেই রাজা মহানন্দের আদেশে ঐ মণ্ডপ অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করা হয়। শত্রুপক্ষীয় কোন ব্যক্তি নবাবকে বলেন যে তিনি যবন, সুতরাং তাঁহার সংস্পর্শে রাজার মণ্ডপ অপবিত্র হইয়াছে, বলিয়া রাজা তাহা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া নবাব রাজাকে ডাকাইয়া উক্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন যে, বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার অধীশ্বর যে আসনে উপবেশন করিয়াছেন, অন্য লোক তাহাতে বসিলে অপমান করা হয়, এই বিবেচনায় উক্ত মণ্ডপ অগ্নিদ্বারা বিনষ্ট করাইয়াছি। ইহাতে নবাব রাজা মহানন্দের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই সময়ে অর্থাৎ ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে নবাব বাবরজঙ্গ বাহাদুর স্বয়ং মহানন্দের কুঞ্জঘাটা ভবনে শুভাগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন। যে গৃহে উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল সে গৃহ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহাকে খিলাবংখানা বা খিল্লৎখানা বলে। রাজা মহানন্দের কোম্পানির নিকটেও বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট ভাগীরথার পশ্চিম তীরস্থিত গোয়ালজান নামক সম্পত্তি জায়গীররূপে প্রাপ্ত হয়েন। রাজা মহানন্দের সময় হইতে তাঁহাদের ভদ্রপুরের বাস উঠিয়া কুঞ্জঘাটায় যায়। কিন্তু রাণী জগদম্বা ভদ্রপুর হইতে স্থানান্তরে যান নাই। রাজা মহানন্দ পরমবৈষ্ণব ও দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার স্থাপিত ৺রাধামোহন বিগ্রহ কুঞ্জঘাটায় বিদ্যমান এবং তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ লালা নন্দরাম রায়ের স্থাপিত গৌরীশঙ্কর শিব, সিংহবাহিনী, সূর্য্যমণি ও চন্দ্রকান্তমণি কুঞ্জঘাটা রাজবাটীতে বিরাজ করিতেছেন। রাজা মহানন্দ কিছুকাল রাজ্যভোগ করিয়া কোন কারণে পাটনায় গমন করিলে তিনি কোন শত্রুকর্ত্তৃক নিযুক্ত

গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হন। তাঁহার দেহ শাল-আবৃত হইয়া নৌকাযোগে কুঞ্জঘাটা ভবনে আনীত হইয়াছিল।

রাজা মহানন্দের কখন মৃত্যু হইয়াছিল তাহার স্থিরতা নাই, তবে তিনি যে ১৮১০ খৃঃ অব্দের কয়েকমাস পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, ইহা নিশ্চিতরূপে অনুমান করা যায়; কারণ নবাব বাবরজঙ্গ ১৮১০ খৃঃ অব্দের কয়েকমাস পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং উক্ত নবাবের রাজত্ব সময়ে রাজা মহানন্দের দেওয়ানী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তবে ১৮১০ খৃঃ অব্দের মধ্যে আলিজা নবাব পদে অধিষ্ঠিত হইলে রাজা উদ্বন্তসিংহ বাহাদুর দেওয়ানী পদ লাভ করেন। সুতরাং রাজা মহানন্দ ১৮১০ খৃঃ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া দেওয়ানী কার্য্য করিয়াছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে নচেৎ ইহার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে অন্য দেওয়ান তাঁহার স্থান অধিকার করিত সন্দেহ নাই।

রাণী ক্ষেমঙ্করীর গর্ভে রাজা মহানন্দের তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ, জয়কৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ। রামকৃষ্ণ অল্পদিনমাত্র রাজ্যভোগ করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। তখন তাঁহার পত্নী ভাগীরথী অপ্রাপ্তবয়স্কা ছিলেন। তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর অনেক দিন জীবিত থাকিয়া ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর জয়কৃষ্ণ কিছু দিন রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া বিগত হয়েন। তাঁহার পত্নীর নাম লক্ষ্মীশ্বরী ছিল। প্রাচীন লোকমুখে শুনা যায়, জয়কৃষ্ণ সমদর্শী এবং দেবসেবায় নিরত ছিলেন। তাঁহার ভোজনের নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না, তিনি কখন অন্দরে কখন সদরে আহার করিতেন। আবার কখনও বা ব্রাহ্মণ ও অতিথিপংক্তির মধ্যে বসিয়া ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পাইতেন। জয়কৃষ্ণের স্বর্গলাভের পর রাজা বিজয়কৃষ্ণ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইঁহার নবাবসরকারে বিশেষ সম্মান ছিল। নবাবসরকারের সমস্ত কার্য্যেরই কর্ত্তৃত্বভার বিজয় কৃষ্ণের উপর ন্যস্ত ছিল। তিনিও পূর্ব্ব পুরুষগণের ন্যায় রাজ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। বিজয় কৃষ্ণের অতি সুন্দর আকৃতি ছিল। নবাব প্যালেস্ দরবারে যে চিত্র আছে, তন্মধ্যে কুঞ্চিত কেশবিশিষ্ট একটী বাঙ্গালী যুবার সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাকে কুঞ্জঘাটার রাজবংশীয়গণ বিজয়কৃষ্ণের মূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বিজয়কৃষ্ণ পিতার ন্যায় ব্যয়ে মুক্ত-হস্ত ছিলেন। দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা প্রভৃতি উৎসবে তিনি বহুব্যয় করিতেন। দোলযাত্রার সময় তিনি স্বয়ং গজারোহণে বহির্গত হইয়া আবীর খেলা করিতেন, সে সময়ে পথে প্রায় এক হস্তপরিমিত গভীর আবীর

পড়িব। (১) মুর্শিদাবাদে অতি সমারোহে কার্ত্তিক পূজা হইয়া থাকে, বিসর্জ্জনের দিন দলে দলে সেই সকল প্রতিমা রাস্তায় বাহির করা হয়। তাহা দেখিবার জন্য বিস্তর জনতা হইয়া থাকে ; ইহাকে তথাকার লোকে কার্ত্তিক-লড়াই বলে। এই কার্ত্তিক-লড়াইয়ের সময় রাজা বিজয়কৃষ্ণ স্বয়ং হস্তিপৃষ্ঠে বাহির হইতেন এবং তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ অন্য হস্তীতে আরোহণ করিয়া টাকা, পয়সা ছড়াইতে ছড়াইতে যাইতেন। এক সময়ে এইরূপে অনবরত অর্থ দান করাতে তাঁহার কর্ম্মচারীর নিকট হইতে সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হইয়া যায়। সেই সময় ভিক্ষুকের দল রাজা বিজয়কৃষ্ণের নিকট আসিয়া যাচ্ঞা করে ; তিনি স্বীয় কণ্ঠের বহুমূল্য মুক্তাহার ছিঁড়িয়া ভিক্ষুকগণকে দান করিয়াছিলেন। রাজা বিজয়কৃষ্ণের একটী কাফ্রি অনুচর ছিল, তাহার অসাধারণ বীরত্বের কথা এখনও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। রাজা হস্তীর সহিত সেই কাফ্রি বীরের মল্লযুদ্ধ দেখিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন। পরোপকার রাজার জীবনের একটী প্রধানতম ব্রত ছিল। প্রাণচাঁদ নামে অজ্ঞাতকুলশীল এক ব্যক্তি রাজা বিজয়কৃষ্ণকে তাহার জামীন হইবার জন্য অনুরোধ করে। রাজা বিজয়কৃষ্ণ তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত না জানিয়া তাহার জামীন হইলে সে মুর্শিদাবাদ কালেক্টারীর খাজাঞ্চীর পদ প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে অনেক টাকা আত্মসাৎ করায় রাজা বিজয়কৃষ্ণকে সেই সমস্ত টাকা দিতে হয়। এই সকল কারণে তাঁহার সময় রাজ্যে ঋণ প্রবেশ করে এবং তাহা অধিক হওয়ায় তাঁহাকে উৎকৃষ্ট তালুক বাসদেবপুর ও তমলুক পরগণা বিক্রয় করিতে হয়। তিনি ১২৩৮ সালের শ্রীপঞ্চমীর পর জ্বররোগে পীড়িত হয়েন। তাৎকালিক বিখ্যাত চিকিৎসক রামনারায়ণ ও বিশ্বেশ্বরের চিকিৎসাধীনে থাকিয়াও তাঁহার কোনও ফল লাভ হয় নাই, ক্রমশঃ পীড়ার বৃদ্ধি হইতে থাকে। তিনি তখন তাঁহার অন্তিম কাল উপস্থিত জানিয়া, ১৩ই ফাল্গুন তারিখে তৎপত্নী রাণী রাসমণিকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি দেন এবং তাহার চারি দিন পরে অর্থাৎ ১৭ই ফাল্গুন তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পাঁচ বিবাহ ছিল, তন্মধ্যে রাণী রাসমণি সর্ব্বকনিষ্ঠা। অন্যান্য পত্নীগণ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণের মৃত্যুর পর রাণী রাসমণি পতির পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হয়েন, কিন্তু কালেক্টর সাহেব তাঁহাকে অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তৎসমুদায় সম্পত্তি

(১) তাঁহার এইরূপ হোলি-খেলা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এমন দুই একটী লোক এখনও জীবিত আছেন।

কোর্ট অব ওয়ার্ড এর অধীনে আনয়ন করেন। সে সময় রাণী রাসমণির পিতা অদ্বৈতচরণ অধিকারী অছি ও সরবরাহকার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অদ্বৈতচরণ অধিকারীর নিবাস ভাগীরথীর অপর পারে নিয়ালিশপাড়া ছিল। কিছু দিন পরে উক্ত সম্পত্তি পুনরায় রাসমণির হস্তগত হয়। এই সময় রাণী রাসমণি ও পূর্ব্বোক্ত রামকৃষ্ণের পত্নী রাণী ভাগীরথীর মধ্যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। এই উভয়ের মধ্যে মামলা মোকদ্দমা হইয়া রাজ্য ঋণ জালে জড়িত হইয়া পড়ে। যাহা হউক, অনেক মামলা মোকদ্দমা ও অর্থব্যয়ের পর এই বিবাদের নিবৃত্তি হয়। বিজয়কৃষ্ণের মৃত্যুর পর তদীয় পত্নী রাণী রাসমণি প্রতাপচন্দ্র নামক একটী বালককে দত্তক-পুত্র গ্রহণের জন্য আনয়ন করাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মৃত্যু হওয়ায় ১২৩৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কুমার কৃষ্ণচন্দ্রকে ভদ্রপুর বাটীতে আনয়ন পূর্ব্বক বিধিমত যাগ যজ্ঞ করিয়া পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করেন। তখন কুমার কৃষ্ণচন্দ্রের বয়স ৬ বৎসর মাত্র ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র সয়দাবাদনিবাসী শ্রীযুক্ত উৎসব বন্দোপাধ্যায়ের পুত্র। ১২৪৬ সালে মৃজাপুর-নিবাসী কালিদাস সরকারের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবীর সহিত ত্রয়োদশবর্ষবয়স্ক কুমার কৃষ্ণচন্দ্রের বিবাহ হয়। এই বিবাহের ৮ দিবস পূর্ব্বে কুমারের উপনয়ন হইয়াছিল। কুমার কৃষ্ণচন্দ্র অধিক দিন সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পান নাই। ১২৪৯ সালের মাঘ মাস হইতে ১০ মাস কাল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। ১২৫০ সালের ৫ই কার্ত্তিক জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া ১৩ই কার্ত্তিক রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার একাদশ বর্ষীয়া পত্নী রাণী প্রসন্নময়ীকে তিন দত্তক পুত্রগ্রহণের অনুমতি দান করতঃ সজ্ঞানে গঙ্গা-যাত্রা করিয়া ১৭ই কার্ত্তিক ১২ দিনের পীড়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পত্নী রাণী প্রসন্নময়ী ১২৬২ সালে সোমপাড়া-নিবাসী পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায়ের গোপীমোহন নামক একটী তিন বৎসরের শিশু পুত্রকে দত্তক পুত্র গ্রহণ মানসে কুঞ্জঘাটায় আনয়ন করিয়াছিলেন। গোপীমোহন রুগ্ন থাকায় তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ করেন নাই। কুমার গোপীমোহন ৮।১০ মাস কাল কুঞ্জঘাটা রাজবাটীতে থাকিয়া ১২৫৩ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। গোপীমোহনের মৃত্যুর পর রাণী প্রসন্নময়ী তালিকপুরনিবাসী রামজয় চট্টোপাধ্যায়ের (১) তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র দুর্গানাথকে ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে ভদ্রপুর বাটীতে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন।

(১) দুর্গানাথের গর্ভধারিণীর নাম শ্রীমতি কমলমণি দেবী। রামজয় চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ



কঞ্জঘাটার—কুমার দেবেন্দ্রনাথ রায়।

একাদশ-বর্ষ বয়সে কুমার দুর্গানাথের উপনয়ন হয়। কুমার দুর্গানাথের শ্রীমতী রাণী রমময়ী ও ত্রিভঙ্গিনী নামে দুই পত্নী। কুমার দুর্গানাথ অতি বিচক্ষণ ছিলেন এবং বিষয়কর্ম্মে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ভদ্রপুরের কিয়দংশ পূর্ব্বে তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। তিনি সেই অংশ পুনরায় খরিদ করেন এবং তাঁহাকে এই জন্য অনেক মোকদ্দমা করিয়া বিষয় অধিকার করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গীত, তাস এবং দ্যূত-ক্রীড়ায় বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং প্রসিদ্ধ গায়ক বা খেলোয়াড় আসিলে রাজা দুর্গানাথ অর্থদানে তাহাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিতেন। তিনি ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে হঠাৎ জ্বররোগে পীড়িত হইয়া অজ্ঞান হইয়া যান এবং সেই পীড়ায় ১২৯৯ সালের ১৩ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার বেলা ১০টার সময়ে ধরাধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার প্রথমা-পত্নী-গর্ভজাত এক পুত্র এবং দ্বিতীয়া পত্নী-গর্ভজাত দুই কন্যা। পুত্রের নাম কুমার দেবেন্দ্রনাথ ও কন্যাদ্বয়ের নাম সরোজিনী এবং প্রিয়ভাষিণী। কুমার তরুণবয়স্ক, কিন্তু তথাপি ধীর, গম্ভীর, বহুদর্শী এবং বিচক্ষণ। তাঁহার সৌজন্য ও অমায়িকতাগুণে সকলেই আকৃষ্ট। তিনি বিষয়কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী এবং সকল বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু। পিতৃ-সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হওয়ার কিছু দিন পরে তিনি পিতৃঋণ সমস্ত পরিশোধ করতঃ বিষয়কার্য্য সুন্দররূপে পরিচালনা করিতেছেন। তিনি বিশেষ দয়াবান্ ও পরদুঃখ-কাতর। পিতার ন্যায় কুমার দেবেন্দ্রনাথেরও সঙ্গীতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। তিনি ১৮৭৫ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। কুমার দেবেন্দ্রনাথ পূর্ব্বপুরুষগণের মহতী কীর্ত্তি সকল পুনঃ-সংস্কার করিয়া বিশেষ যশোভাজন হইয়াছেন। কুমার দেবেন্দ্রনাথের দুই কন্যা। তাহার দুই ভগ্নী শ্রীমতী সরোজিনী এবং শ্রীমতী প্রিয়ভাষিণী দেবীর সহিত যথাক্রমে হেতমপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজ রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র কুমার মহিমা নিরঞ্জন ও কুমার কমলা নিরঞ্জনের বিবাহ হয়।

রাণী প্রসন্নময়ী ভদ্রপুরনিবাসী সুখময় রায়ের কন্যা শ্রীমতী বিরাজমোহিনীকে পালিতা কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত দৌলতাবাদ থানার অধীন ছয়ঘোড়া গ্রামনিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। রাণী প্রসন্নময়ী পালিতা কন্যা ও জামাতাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার অন্তে কুমার দেবেন্দ্রনাথও উক্ত পরিবারকে সেইরূপ

পুত্রের নাম গোপালনাথ, দ্বিতীয় পুত্রের নাম অনন্তরাম। কুমার দুর্গানাথ তাঁহার পিতার কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন।

সমাদর করিতেছেন। ঈশ্বরবাবুর অচিন্ত্যরূপিণী নামে এক কন্যা ও সতীশচন্দ্র নামক এক পুত্র।

কুঞ্জঘাটা রাজবাটীতে, মহারাজ নন্দকুমারের ভ্রাতা কেবল কৃষ্ণের 'রাও' উপাধির, এবং জগচ্চন্দ্রের 'রায়' উপাধির সনন্দ সযত্নে রক্ষিত আছে।(১)

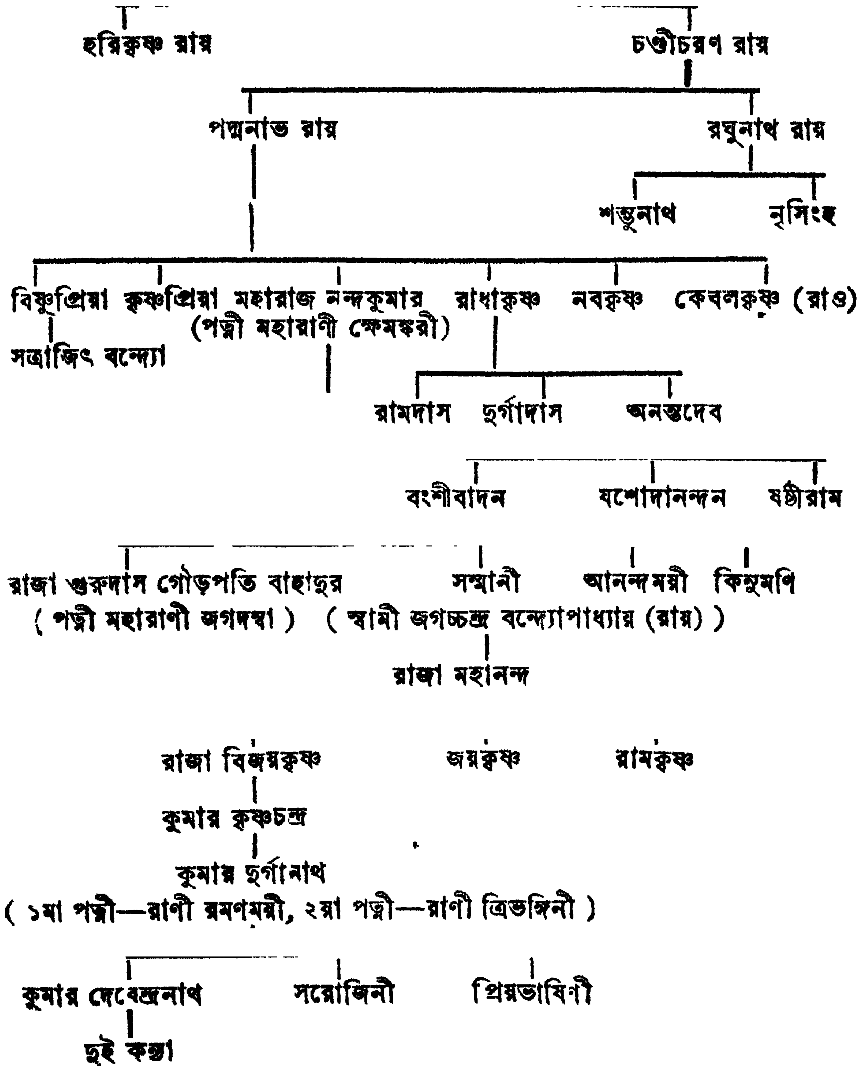
মহারাজ নন্দকুমার একজন সঙ্গীতাভিজ্ঞ ও সাধক পুরুষ ছিলেন, তাঁহার বিরচিত গানে তাহার বিশেষ আভাস পাওয়া যায়। তৎ-রচিত একটী সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ভৈরবী—ঠেকা

কবে সমাধি হবে শ্যামা-চরণে।
অহং-তত্ত্ব দূরে যাবে সংসার-বাসনা সনে॥
উপেক্ষিয়ে মহাতত্ত্ব, ত্যজি চতুর্ব্বিংশতত্ত্ব,
সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব, দেখি আপনে আপনে॥
জ্ঞানতত্ত্ব ক্রিয়াতত্ত্বে, পরমাত্মা-আত্মতত্ত্বে,
তত্ত্ব হবে পরতত্ত্বে, কুণ্ডলিনী-জাগরণে॥
শীতল হইবে প্রাণ, আপনে পাইব প্রাণ,
সমান উদান ব্যান ঐক্য হবে সংযমনে॥
কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চভূত পঞ্চময় পঞ্চ
পঞ্চে পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ বঞ্চনা করি কেমনে॥
করি শিবাশিব-যোগ, বিনাশিবে ভব-ভোগ,
দূরে যাবে অন্য ক্ষোভ হরিত সুধার সনে॥
মূলাধারে বরাননে ষড়্‌দল লয়ে জীবনে,
মণিপুরে হুতাশন মিলাইবে সমীরণে॥
কহে শ্রীনন্দকুমার ক্ষমা দে হরি নিস্তার
পার হবে ব্রহ্মদ্বার শিবশক্তি আরাধনে॥

(সমাপ্ত)

(১) রাজা গুরুদাসের 'রাজা বাহাদুর' উপাধির সনন্দ এবং তাঁহার জমীদারীর সনন্দও পূর্ব্বে কুঞ্জঘাটা রাজবাটীতে রক্ষিত ছিল; কিন্তু অধুনা এই সনন্দগুলি এবং ইহাদের সহিত কুঞ্জঘাটা রাজবাটীর ফটো, মহারাজ নন্দকুমারের খেলাতের ছোরা ১ খান ও সপার্ষদ গৌরাঙ্গদেবের প্রাচীন চিত্র ফটোসহ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে উপহার দেওয়া হইয়াছে।


রামগোপাল রায়
হরিকৃষ্ণ রায়
চণ্ডীচরণ রায়
পদ্মনাভ রায়
রঘুনাথ রায়
শম্ভুনাথ
নৃসিংহ
বিষ্ণুপ্রিয়া
কৃষ্ণপ্রিয়া
মহারাজ নন্দকুমার
(পত্নী মহারাণী ক্ষেমঙ্করী)
রাধাকৃষ্ণ
নবকৃষ্ণ
কেবলকৃষ্ণ (রাও)
সত্রাজিৎ বন্দ্যো
রামদাস
দুর্গাদাস
অনন্তদেব
বংশীবাদন
যশোদানন্দন
ষষ্ঠীরাম
রাজা গুরুদাস গৌড়পতি বাহাদুর
(পত্নী মহারাণী জগদম্বা)
সম্মানী
(স্বামী জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রায়))
আনন্দময়ী
কিনুমণি
রাজা মহানন্দ
রাজা বিজয়কৃষ্ণ
জয়কৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ
কুমার কৃষ্ণচন্দ্র
কুমার দুর্গানাথ
(১মা পত্নী—রাণী রমণময়ী, ২য়া পত্নী—রাণী ত্রিভঙ্গিনী)
কুমার দেবেন্দ্রনাথ
সরোজিনী
প্রিয়ভাষিণী
দুই কন্যা

ভদ্রপুর-কাহিনী

(পরিশিষ্ট)

এতদঞ্চলের রেশমের কারবার এক সময় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বীরভূমের গনুটীয়া প্রভৃতি নানা স্থানে রেশম প্রস্তুত হইত। তুঁত-পাতার চাষ রেশম-কীট প্রতিপালন কৃষকগণের একটী লাভজনক ব্যবসায় ছিল। পাশ্চাত্য ভূখণ্ড হইতে নকল রেশমের আমদানী এবং তদুপরি অনাবৃষ্টি, অন্নকষ্ট প্রভৃতি নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হওয়ায় ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বীরভূম হইতে রেশমের কারবার সম্প্রতি একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গনুটীয়ার কুঠী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভদ্রপুরের কারবার কোন প্রকারে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছে মাত্র। এক সময়ে এই ভদ্রপুরের কুঠীতে বৎসরে প্রায় লক্ষাধিক টাকার রেশম প্রস্তুত হইত। মূলধন বিদেশীয় হইলেও এতদঞ্চলের বহু গরীব-দুঃখী ও মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় তদ্দ্বারা কম লাভবান্ হইতেন না। কুঠীর অধিকাংশ কার্য্যই দেশীয় কর্ম্মচারিগণের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। ভদ্রপুরের কুঠীতে চুক্তি-প্রথা প্রচলিত থাকায় কুঠীর অবনতি হওয়ার ইহাও একতম কারণ। মালিক একটা দর বাঁধিয়া দিতেন যে, এই দরে রেশম প্রস্তুত করিতে হইবে। ২৫৲ ৩০৲ টাকা বেতনের কর্ম্মচারী লোকসানের ভয়ে এবং প্রধানতঃ লাভের আকাঙ্ক্ষায় কম দরেই রেশম প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিত। যদিও উৎকৃষ্ট রেশমের উপর শতকরা দশটাকা হারে কমিশন নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশ-প্রচলিত উন্নত উপায়ে রেশমগুটীর আবাদ অবগত না থাকায় অত্রস্থ কৃষিজীবিগণ প্রতিযোগিতায় সুলভ মূল্যে "রেশম কোয়া" জোগান দিতে পারিত না। এদিকে স্বত্বাধিকারিগণের অমনোযোগিতায় উৎকৃষ্ট প্রণালীর যন্ত্রাদির অভাবে রেশম প্রস্তুতের খরচও বেশী পড়িত। ইহার উপর নকলের দৌরাত্ম্য! পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিক মতে ভেজাল দেওয়া নকল রেশমের অবাধ আমদানীর প্রাবল্যে এদেশের আসল রেশম হঠিয়া গেল। "মুড়ি মুড়কীর আর এক দর" হইবে কি করিয়া?

ভদ্রপুরের রেশম কুঠীটী গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে ব্রহ্মাণী নদীর তীরে অবস্থিত। 'কুঠীর' কোন ধারাবাহিক বিবরণী পাওয়া যায় না। প্রাচীন ব্যক্তিগণের

অনুমানে কুঠীর বয়ঃক্রম প্রায় দেড়শত বৎসর হইবে। ভদ্রপুরের ভক্ত কবি "সিদ্ধান্তামৃত" প্রভৃতি রচয়িতা শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভদ্রপুর-মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক "একশো হাসির কথা"র শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতির মতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোং এই কুঠীর প্রতিষ্ঠাতা। ভদ্রপুরের প্রাচীন ধনাঢ্য শ্রীযুক্ত ধনকৃষ্ণ আলিপাত্র একটী মুদ্রা দেখাইয়া বলেন, "মুদ্রাটী যত দিনের, কুঠী তত দিনের"। মুদ্রাটী দেখিয়াছি। তাহার একপৃষ্ঠে একটী পারশী কবিতা—

"সিক্কা জাদ্‌বার হাফতে কেশওয়ার সাহে আলম বাদসা,
হামিয়ে দীনে মহম্মদ শাহিয়ে ফজলে এলা।"

(অর্থাৎ মহম্মদের ধর্ম্মপথের সহায়ক আল্লাতালার অনুগ্রহ-প্রাপ্ত সাতমুলুকের বাদশা সাহ আলম কর্ত্তৃক মুদ্রিত মুদ্রা)

এবং অন্য পৃষ্ঠে—

"দাঃ ওনাঃ সাঃন্ (জোলুষ)

(অর্থাৎ "উনিশ জোলুষ" ?) ক্ষোদিত রহিয়াছে। (১)

ইতিহাসে অবগত হওয়া যায়, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট্ সাহ আলম বর্ত্তমান ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোংর বৃত্তিভোগ করিতেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোং এতদ্দেশে হুগলী, কাশীমবাজার প্রভৃতি স্থানে কয়েকটী কুঠী স্থাপন করেন। এই সমস্ত কুঠীর মধ্যস্থতায় বিলাতজাত কাচ-দ্রব্যাদি এতদ্দেশে আমদানী এবং এ দেশজাত রেশম, কার্পাস বস্ত্র, ও আরো বহু মূল্যবান্ দ্রব্য বিলাতে রপ্তানি হইত। ভদ্রপুরের রেশম-কুঠী এই ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বেও মুর্শিদাবাদের "বাবলাবোনা" কুঠীর অধীন ছিল। সুতরাং অনুমান হয়, এই কুঠী ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোং প্রতিষ্ঠিত। এই কুঠী এক সময় "বেঙ্গল সিল্ক কোং", তৎপরে "লায়াল মার্শেল এণ্ড কোং" এবং সর্ব্বশেষ "জেমস্ মার্শেল এণ্ড কোং" কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। জেমস্ কোং কুঠী বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। জঙ্গীপুরনিবাসী "হাজি ইব্রাহিম" ও "মনিরুদ্দীন সেখ" এই কুঠী ক্রয় করিয়াছিলেন। হাজি ইব্রাহিমের মৃত্যু হইয়াছে, সেখ মনিরুদ্দীন সম্প্রতি এই কুঠীর পরিচালক।

(১) ভদ্রপুরের শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মৌলবীর দ্বারা এইরূপ পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।

কুঠীর কর্ম্মচারিগণ--ম্যানেজার, গোমস্তা, মোহরার, হাজিরানবীশ, সর্দ্দার, তাগিদ্‌দার, কাটানী, পাক্‌দার প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। কোম্পানীর আমলে সাহেব ম্যানেজার নিযুক্ত হইতেন। এখন আর সাহেব ম্যানেজার নাই। গোমস্তা (দেওয়ান) ও মোহরার প্রভৃতি কর্ম্মচারী এতদ্দেশীয়। ম্যানেজারের বেতন তিন চারি শত টাকা ছিল। দেওয়ান, মোহরার প্রভৃতি ৪।৫ জন কর্ম্মচারীর বেতন বার্ষিক প্রায় ছয়শত টাকা। (পূর্ব্বে ২৫৲ হইতে ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৫০৲ বেতনের দেওয়ান চুক্তি-প্রথা অনুসারে কাজ করিয়া বার্ষিক প্রায় তিন চারি হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতেন।) সর্দ্দার পাইক প্রভৃতির বেতন বার্ষিক প্রায় তিনশত টাকা। এতদ্ব্যতীত কাটানী, পাক্‌দার, কুলি, মজুর প্রভৃতিতে ব্যয় হয় বার্ষিক প্রায় পাঁচ ছয় হাজার টাকা। বর্ত্তমান সময়ে বৎসরে আনুমানিক হিসাবে প্রায় ৫০।৫৫ মণ রেশম প্রস্তুত হয়। প্রতি সের ১২৲ টাকা হইতে ষোল টাকা মূল্যে বিক্রীত হইলে বার্ষিক প্রায় ২৫।৩০ হাজার টাকার রেশম প্রস্তুত হইতেছে অনুমান করা যাইতে পারে। অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে, তাহার কারণ বর্ত্তমান কর্ম্মচারিগণ আয়-ব্যয়ের প্রকৃত হিসাব অবগত নহে।

কুঠীর পূর্ব্বতন আকার "বানকখানা" ও "তন্দুরাদির" বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। পুরাতন 'বানক' নদীস্রোতে ভগ্ন ও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। পুরাতন কামরাও এখন নাই। বর্ত্তমানে এই কারখানাতে একটী লৌহনির্ম্মিত 'বয়লার' (Boiler) আছে, বয়লারের মোটা ফাঁপা নলটীর গাত্র হইতে কতকগুলি ক্ষুদ্র সরু নল বহির্গত হইয়া (বানকস্থিত শতাধিক ঘাই বা কুণ্ডের) এক একটী কুণ্ডে গিয়া পতিত হইয়াছে। জলপূর্ণ ঘাইগুলিতে রেশম গুটী রাখা হয়। বয়লারের অগ্নিতাপে উত্তপ্ত জল বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া উক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলপথে ঘাইয়ে গিয়া পড়ে। তদ্দ্বারা কুণ্ডের জল উত্তপ্ত হওয়ায় রেশম গুটী সিদ্ধ হয়। (২) এই সিদ্ধ "কোয়া" হইতে কাটানিগণ সূত্র বাহির করিয়া দেয়, এবং উহা সম্মুখবর্ত্তী ঘূর্ণ্যমান্ 'তহবিল' নামক (কাষ্ঠের ফ্রেমে) যন্ত্রে আসিয়া জড়াইয়া যায়। তহবিল ঘুরান পাকদারের কার্য্য। সর্দ্দার ও তাগিদদারগণ নিকটে উপস্থিত থাকিয়া কাটানী ও পাকদারের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করে। প্রত্যেক "জোয়ার" (যেখানে পাশাপাশি কয়েক খানি গ্রামে প্রচুর কোয়া প্রস্তুত হয়), হইতে বন্দে বন্দে অর্থাৎ শ্রাবণ, কার্ত্তিক,

(২) পূর্ব্বে কাঠের আগুনে জলপূর্ণ ঘাই উত্তপ্ত করা হইত।

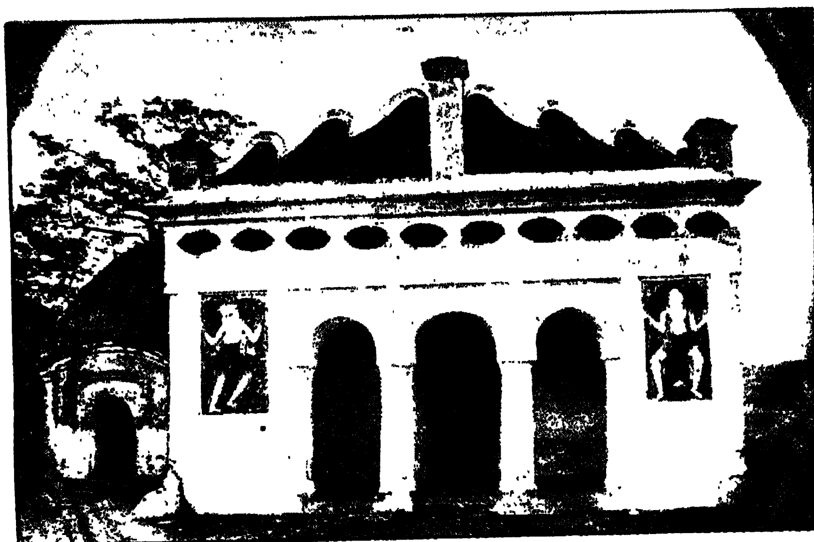
চৈত্র প্রভৃতি এক একটী নিরূপিত সময়ে রেশমগুটী আমদানী করা হয়। বলাবাহুল্য, এই খরিদের সুবিধা অসুবিধা অনুসারেই ব্যবসায়ের লাভালাভ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

ভদ্রপুরের অতি নিকটবর্ত্তী শিমলানডিহি বা শিবনন্দী গ্রামে জয়কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী নামক একজন সাধকপুরুষ বাস করিতেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার জন্মস্থান উক্ত শিবনন্দী গ্রামেই এবং তিনি রাজা গুরুদাস গৌড়পতি বাহাদুরের সমসাময়িক ছিলেন। জয়কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত হইয়াছে। শিবনন্দী গ্রামের পূর্ব্ব প্রায় পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী "গুড়ে" নামক গ্রামে "বজর-পড়া" শিব নামে একটী ভগ্ন শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। প্রবাদ—চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কোন শিষ্যই উক্ত শিবের প্রতিষ্ঠাতা। শিষ্যের নাম কেহ জানে না। সকলেই বলে, সে প্রথম জীবনে গরু চরাইত বলিয়া রাখাল নামেই খ্যাত হইয়া রহিয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় শিবনন্দী গ্রাম হইতে প্রায় দশ বার ক্রোশ দূরবর্ত্তী ডাহাপাড়ার ঘাটে নিত্য গঙ্গাস্নানে গমন করিতেন। গঙ্গাস্নানে যাইবার পথে একদিন একটী পুষ্করিণীতে কতকগুলি প্রস্ফুটিত পদ্ম দর্শনে আগ্রহান্বিত হইয়া তিনি সমীপবর্ত্তী গোচারণ-রত এক রাখালকে পদ্মগুলি তুলিয়া আনিয়া দিতে বলেন। রাখাল সাঁতার জানিত না। সুতরাং গভীর জলে নামিয়া পদ্ম তুলিয়া আনিয়া দিতে অস্বীকৃত হইলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহাকে নিজ হস্তস্থিত লাঠিগাছটী দিয়া বলিয়া দেন যে, এই যষ্টি-মাহাত্ম্যে পুষ্করিণীর জল তোমার হাঁটুর উপরে উঠিবে না। জলে নামিয়া রাখাল লাঠির মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিল এবং যথাসাধ্য কতকগুলি কমল তুলিয়া আনিয়া দিল। রাখালের এই সরল বিশ্বাসে সন্তুষ্ট হইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। দীক্ষিত হওয়ার পর রাখাল অতুল ধন-সম্পদের অধিকারী হয়। একদা শিব-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়া রাখাল গুরুদেবের অনুমতি লইতে আসিলে দিন স্থির ও অনুজ্ঞা দান করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় আরও আদেশ করেন যে, আমি উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত শিবস্থাপন করিও না। নির্দ্দিষ্ট দিনে নিমন্ত্রিত সকলেই রাখালের গৃহে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে, এখন কেবল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপস্থিতির অপেক্ষা। সমবেত জনসাধারণের উৎকণ্ঠার সহিত বেলাও বাড়িতে লাগিল, কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সাক্ষাৎ মিলিল না। শেষে তাঁহার আগমন সম্ভাবনার সহিত দিবাও প্রায় অবসান হইয়া আসিল দেখিয়া ব্রাহ্মণ

(পৃষ্ঠা ১৩৯



বীরভূম-বিবরণ



সুপুর---সুরথেশ্বর-শিবমন্দির।

পণ্ডিতগণ ৺শিবপ্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফেলিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় ঠিক সেই সময়েই চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই শিহরিয়া উঠিল। তিনি রাখালের মুখে সমস্ত শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন এই শিবলিঙ্গ মূর্ত্তিতে যদি শিবত্ব সঞ্চার হইয়া থাকে, তবে ইহা অবিকৃত থাকুক। নতুবা ইহা এখনই বজ্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হউক। শুনিতে পাওয়া যায় তৎক্ষণাৎ সেই শিবের মাথায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইয়াছিল। সকলে অভিশাপ ভয়ে কাতর হইলে তিনি তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া রাখালকে সেই খণ্ডিত শিবমূর্ত্তির পূজা করিতেই আদেশ দান করেন। তদবধি উক্ত শিব "বজ্রপড়াশিব" ও জয়কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বংশ 'বজ্রপড়ার বংশ" বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। জয়কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্বন্ধে আরও অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত রহিয়াছে যাহা বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম।

ভদ্রপুরের সমীপবর্ত্তী (ব্রহ্মাণী নদীতীরে) ঘাসিম তলার আশ্রমে 'হরি-বোলা' নামে এক বাবাজী বাস করিতেন। প্রায় ষাট বৎসর গত হইল তিনি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তাহার সম্বন্ধে ও অনেক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। যথা—তিনি কখনও ভিক্ষা করিতেন না; "চালে চালে বসতি গাঁয়ে মানুষ নাই রে ভাই" এই ছড়াটি গান করিতে করিতে তিনি মাঝে মাঝে গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। ঘুরিতে ঘুরিতে যে কোনও জাতির স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে যাহাকেই তিনি কোনও কিছু খাইতে দেখিতেন, তাহারই পাত্র হইতে উচ্ছিষ্ট আহার্য্য এক মুঠা উঠাইয়া লইয়া স্বচ্ছন্দ মনে নিজ মুখে তুলিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেন। কেহ তিরস্কার করিলেও গ্রাহ্য করিতেন না। সময়ে সময়ে উলঙ্গ হইয়াও ভ্রমণ করিতেন। "হরিবোলা" যে দিন দেহ ত্যাগ করেন, ভাগীরথী তীরবর্ত্তী রঘুনাথগঞ্জ হইতে কয়েক জন শববাহক কিছু কলাই লইয়া তৎপর দিন ভদ্রপুরে ফিরিয়া আসিয়া বলেন যে বিগত কল্য রঘুনাথগঞ্জে গিয়া 'হরিবোলা' তাঁহার আশ্রমে অনুষ্ঠিত উৎসবে ব্যয় করিবার জন্য এই কলাই খরিদ করিয়া দিয়াছেন। এই ঘটনায় সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন এবং বিশেষ ঘটা করিয়া তাহার ঔর্দ্ধদৈহিক মঙ্গলোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে কলাইগুলি ও তাহাতেই ব্যয় করা হইয়াছিল। হরিবোলা বাবাজীর সম্বন্ধে আরও বহুবিধ অলৌকিক কাহিনী ও শুনিতে পাওয়া যায়।

ভদ্রপুরে মহারাজ নন্দকুমার প্রতিষ্ঠিত কালিকা দেবীর বিষয় ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত "ভদ্রকালির" কথাও পূর্ব্বে উল্লেখ

করিয়াছি। সম্প্রতি আরও দুইটী মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তি দুইটীর একটী "বাসুদেব মূর্ত্তি" গ্রামস্থ কোনও পুষ্করিণী খনন কালে এই মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। মূর্ত্তিটীর সেবা পূজা হয় বলিয়া ফটো গ্রহণ করিতে পারা যায় নাই। মূর্ত্তিটী প্রাচীন বলিয়াই অনুমিত হয়। অপরটী ভদ্রপুর গ্রামের মধ্যে ষষ্ঠীতলা নামক স্থানে একটী সুবৃহৎ বটবৃক্ষমূলে পড়িয়া আছেন। ষষ্ঠ বলিয়া তাহার পূজাও হয়। এই মূর্ত্তিটী ও একটী পুষ্করিণী গর্ভ হইতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি। মূর্ত্তিপরিচয় ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

সুপুর-কাহিনী।



ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের বোলপুর ষ্টেশন হইতে একক্রোশ ব্যবধানে পশ্চিম দিকে অজয়নদ-সেবিত মনোহর সমতলভূমির উপর সুপুর নামক প্রাচীন গ্রাম। গ্রামের চতুষ্পার্শ্ব লতাগুল্ম ও বৃক্ষের সমাবেশে এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া আছে। পশ্চিমে তালবৃক্ষ-সমাকীর্ণ বহু স্বচ্ছসলিল সরোবর শোভিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর। দক্ষিণে অজয়ের শীতল স্রোত পূতসলিলা জাহ্নবীর সহিত সম্মিলন-মানসে মন্থরগতিতে প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্বে এবং উত্তরে এখন কোন উল্লেখযোগ্য সীমানির্দ্দেশক চিহ্ন নাই। বর্ত্তমান সময়ে এই গ্রামে বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের বাস দৃষ্ট হয়। [গ্রামের অবস্থা ও পরিচয়]

প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে সুপুর বঙ্গভূমির মধ্যে অতি স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল, কিন্তু তাহার পর হইতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে এই স্থানের জলবায়ু এরূপ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে যে, নানাবিধ সংক্রামক পীড়ার উৎপাতে অনেক বংশের বিলোপ ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সুপুর ও রায়পুরের অধিবাসীসংখ্যা ৩৩১১।(১) কিরূপে এই গ্রামের নাম সুপুর হইল এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতার নাম কি, তাহা অভ্রান্তরূপে নিরূপণ করা দুরূহ। তবে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে আমরা যে স্বপুরের উল্লেখ দেখিতে পাই, অনেকে সুপুরকে এই স্বপুরের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমান করেন। আমরা যথাস্থানে ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইব। [স্বাস্থ্য ও লোক-সংখ্যা] [নাম-প্রকরণ]

একশত সত্তর বৎসরের অধিক হইল তদানীন্তন বঙ্গের ভীষণ শত্রু মহারাষ্ট্রীয় দস্যুগণ যখন সমগ্র বঙ্গভূমি বিধ্বস্ত করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই সময়ে এই গ্রামে আনন্দচাঁদ গোস্বামী নামক একজন মহাপণ্ডিত বাস করিতেন। তিনি একজন পবিত্রচেতা, ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে জীবনযাপন করিতেন; ব্রত, উপবাস এবং দেবার্চ্চনা তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। মহা বিপদে পতিত হইলেও তিনি অধীর বা অব্যবস্থিতচিত্ত না হইয়া সমাহিতচিত্তে সহিষ্ণুতাবলম্বন পূর্ব্বক তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াস পাইতেন। তিনি বলিষ্ঠ ও দৃঢ়কায় [আনন্দচাঁদের পরিচয়]

(১) Census report, রায়পুর সুপুরের একটী পল্লীমাত্র।

ছিলেন, তাঁহার বর্ণ এত সুন্দর ও গৌর ছিল যে, প্রবাদ আছে কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিবার সময় তাঁহার স্বচ্ছ গলনালী মধ্যে তাহা দৃষ্টিগোচর হইত। গোস্বামীপ্রভুর অনেক শিষ্য সেবক ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। তৎকালীয় বৈষ্ণবগণের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল এবং বর্ত্তমান-কালেও সেই বিশ্বাস বদ্ধমূল আছে যে, আনন্দচাঁদ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রী৺গৌরাঙ্গমহাপ্রভুর অবতার-বিশেষ। গোস্বামীপ্রভু শিষ্য ও ভক্তগণের নিকট যে প্রণামী পাইতেন তাহাতে তাঁহার বিশেষ আয় হইত। এতদ্ভিন্ন তাঁহার এলাকাধীন কোন বৈষ্ণব উত্তরাধিকারী-শূন্য হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মৃত ব্যক্তির যাবতীয় সম্পত্তি তাঁহার অধিকার-ভুক্ত হইত।

[মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ হইতে প্রজাগণের রক্ষা]

মহারাষ্ট্রীয় অত্যাচারের সময় একদা রজনীকালে বহু নরনারী গোস্বামী প্রভুর ভবনে আগমনপূর্ব্বক তদীয় সিংহদ্বারে সমবেত হইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তিনি আর্ত্তগণের কোলাহলে জাগরিত হইয়া তাহাদিগের নিকট আগমন করিলে তাহারা কাতরস্বরে লুণ্ঠন ও অত্যাচারকারী মহারাষ্ট্রীয় দস্যুগণের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। বর্গিগণের অত্যাচারে কয়েকমাস পূর্ব্বে গ্রামবাসিগণের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে। তাই নিরুপায় গ্রামবাসী প্রতিকার ও আশ্রয় জন্য গোস্বামীর শরণাপন্ন হইল। গোস্বামী প্রভু কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বর্গিগণকে বাধা দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং সমবেত বিপন্ন গ্রাম-বাসীদিগকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা করিলেন।

[মহারাষ্ট্রীয় দস্যুদমন-কৌশল]

তিনি মহারাষ্ট্রীয় দমনার্থ যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দুইটী কিংবদন্তী আছে। প্রথমটী এই—বর্গিসৈন্য কষ্টসহিষ্ণু টাটুঘোড়ায় আরোহণপূর্ব্বক আক্রমণ করিতে আসিত। রাত্রিকালের সুযোগে গোপনে সেই সকল অশ্বকে খঞ্জ করা হইল। শত শত গ্রামবাসী বাঁশ কাটিয়া তাহাতে লাঠী প্রস্তুত করিল এবং প্রজ্বলিত মশালহস্তে মহারাষ্ট্র-শিবিরের সম্মুখীন হইল। আনন্দচাঁদ এই সকল প্রজার নেতাস্বরূপ অগ্রগামী হইয়া দস্যুগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। অকস্মাৎ এইরূপ অসংখ্য সুসজ্জিত জনসমাবেশ দর্শনে দস্যুগণ বিচলিত হইয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি বাঙ্গালীর এবম্ভূত সাহসিকতায় মুগ্ধ হইয়া গোস্বামী প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, গোস্বামী প্রভুও নির্ভয়ে কতিপয় বিশ্বাসী সঙ্গী সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই সম্মিলনের পর বর্গিগণ আর কোনরূপ অত্যাচার না করিয়া সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

দ্বিতীয় জনশ্রুতি অনুসারে আমরা অবগত হই যে প্রাচীনকালে সুপুরে একটী দুর্গ ছিল। অদ্যাপি সেই দুর্গ বা গড়ের প্রাকার দেখিতে পাওয়া যায়। আনন্দচাঁদ মহারাষ্ট্রীয়গণকে বিধ্বস্ত করিবার অভিলাষে গ্রামবাসিগণকে সেই গড়ের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, স্বয়ং এক শ্বেতাশ্বে আরোহণপূর্ব্বক একই সময়ে গড়ের চারিটী সিংহদ্বারে উপস্থিত ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় সর্দার সকল দ্বারে তাঁহাকে বিদ্যমান দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং অবশেষে গোস্বামী প্রভুর পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই ঘটনায় গোস্বামী প্রভুর প্রতি মহারাষ্ট্রীয় দস্যুপতির এরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিয়াছিল যে, ভবিষ্যতে সুপুরগ্রামে আর বর্গীর অত্যাচার হইবে না, তিনি এই মর্ম্মে একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দেন।

[আনন্দচাঁদের অলৌকিক শক্তি]

গোস্বামীপ্রভুর অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে আর একটী গল্প আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। বীরভূম জেলায় কুষ্টিকূড়ী নামক একটী গ্রাম আছে। তথায় হজরৎ (১) নামে একজন পরম ধার্ম্মিক মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী জমিদার বাস করিতেন। তাঁহার একটী পদ খঞ্জ ছিল। একদা তিনি ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আনন্দচাঁদ গোস্বামীকে দর্শন করিতে যান। তৎকালে গোস্বামী প্রভু একটী ভগ্নপ্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি হজরৎ জমীদারকে আসিতে দেখিয়া উক্ত প্রাচীর চালিত করতঃ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং বাটীর মধ্য হইতে হজরৎকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, হজরৎ সাহেব তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। যাহা হউক, নানা সদালাপের পর তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করতঃ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি গোস্বামী জীউর অমানুষিক শক্তির কথা আপন পারিষদ্‌বর্গকে বলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন ধর্ম্মান্ধ গোঁড়া মুসলমান এই আশ্চর্য্য কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া স্বয়ং পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। এতদর্থে তিনি একটী পাত্রে গো-মাংস রক্ষাকরতঃ তাহা বস্ত্রাবৃত করিয়া উপঢৌকন স্বরূপ প্রভুজীর নিকট লইয়া গেলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি সহাস্যে আবরণবস্ত্র অপসারিত করিবার আদেশ প্রদান করিলে তদাজ্ঞা প্রতিপালিত হইবার পর দেখা গেল যে, গোমাংসের পরিবর্ত্তে সেই পাত্রে অসংখ্য বিকসিত রক্তকমল শোভা পাইতেছে,

(১) ইনি সম্ভবতঃ সৈয়দ সাহ আবদুল্লা আলি হোসেন। এই মহাত্মা সিদ্ধপুরুষ ছিলেন বলিয়া খ্যাত। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়

এবং তিনিও তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া তদীয় আঘ্রাণ লইতে লাগিলেন। তখন মুসলমান তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বারংবার ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

গোস্বামী প্রভুর দৈবশক্তি বিষয়ে আরও নানাবিধ গল্প লোকমুখে প্রচারিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহার বর্ণনায় নিবৃত্ত হইলাম। এতদ্দ্বারা ইহাই সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, তিনি চতুষ্পার্শ্ববাসী লোকসমূহের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। এক্ষণে আমরা এই অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের জন্মকাল নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব।

আমরা ইতিপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, মহারাষ্ট্রীয়গণের বঙ্গদেশ-আক্রমণকালে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। ইহা ১৭০ বৎসরের অধিক-কালের কথা। এই সময়ে যখন তিনি তাহাদিগের স্থানীয় অত্যাচার নিবারণে বদ্ধপরিকর হয়েন, তখন সম্ভবতঃ তাঁহার যুবা বয়স, এই হিসাবে গণনা করিয়া দেখিলে তাঁহার জন্মকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অনুমিত হয়। কিংবদন্তীও এই অনুমান সমর্থন করিতেছে। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের জীবন সচরাচর সুদীর্ঘ হইয়া থাকে। প্রাচীন দলিলাদি দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, বঙ্গাব্দ ১২০৯ সালেও তিনি জীবিত ছিলেন; অতএব যদি অনুমান করা যায় যে, ১২২০ সালের (ইং ১৮১৪ খৃঃ) মধ্যে তিনি জীবনলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন তবে তাহা অসঙ্গত হইবে না। যদিও তাঁহার মৃত্যুকাল অবধারণ করিবার অপর কোন উপায় নাই, তথাপি স্থানীয় লোকের অনুমানও উপরোক্তরূপ। শুনা যায়, গোস্বামী প্রভুর পূর্ব্বপুরুষগণ সামান্য অবস্থাপন্ন ছিলেন। তিনি নিজ ক্ষমতায় যথেষ্ট বিষয় বৈভব উপার্জ্জন করেন। অদ্যাবধি সেই সকল ঐশ্বর্য্যের চিহ্নস্বরূপ পুষ্করিণী ও উদ্যানশোভিত সুবিশাল অট্টালিকা অসংস্কৃত ও জীর্ণাবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়া নিত্যপরিবর্ত্তনকারী কালের সর্ব্বগ্রাসিনী শক্তির কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছে। লোকে আনন্দচাঁদকে যোগিনীসিদ্ধ বলিত, জনসাধারণের বিশ্বাস যে, এতদ্দ্বারা তিনি দৈববল লাভকরতঃ অলৌকিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার জীবনেতিহাস সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিবার সম্ভাবনা নাই। ইহা আমাদিগের ইতিহাস বা জীবনী প্রণয়ন বিষয়ে পুরুষানুক্রমিক প্রবৃত্তির অভাবের ফলমাত্র। এইরূপে আমাদিগের জাতীয় ইতিহাসের কত রত্ন যে বিস্মৃতির অতলস্পর্শ সাগরতলে লুক্কায়িত আছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে।

আনন্দচাঁদের কোনও বংশধর বিদ্যমান নাই। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার জনৈক জ্ঞাতির দৌহিত্র তদীয় বাটীতে বাস করিতেছেন। গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত ৺শ্যাম-

রায়ের সেবা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান ভট্টাচার্য্যের প্রপিতামহের খুল্লতাত ব্রজকিশোর ভট্টাচার্য্য শক্তিমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। জনসাধারণের বিশ্বাস এই যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় আনন্দচাঁদের সমসাময়িক। ব্রজকিশোর প্রতিষ্ঠিত কালী ও শিবমন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। আনন্দচাঁদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। এইজন্য অনুমান হয় যে, ব্রজকিশোর তাঁহা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

এক্ষণে স্বপুরের পুরাতনতত্ত্ব যতটুকু জ্ঞাত হওয়া যায় ও পুরাকালের স্বপুর বর্ত্তমান স্বপুরে পরিণত হইয়াছে কি না তদ্বিষয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। তজ্জন্য আমাদিগকে প্রবাদ ও পৌরাণিক ঘটনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে। দুই একটী প্রবাদমূলক চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন উপকরণ নাই, যদ্দ্বারা আমরা অভ্রান্তরূপে সত্যতত্ত্বে উপনীত হইতে পারি। বহুকালাবধি বংশানুক্রমে প্রাপ্ত আবর্জ্জনাসঙ্কুল প্রবাদমধ্যে ভস্মস্তূপাবৃত বহ্নিবৎ অবিকৃত সত্যের আবিষ্কার কতদূর সম্ভাবনীয়, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গই বিবেচনা করিবেন। তবে প্রবাদ বা পুরাণবর্ণিত ঘটনার মূলে যে কিঞ্চিৎও সত্য নিহিত আছে, তাহা সাধারণতঃ স্বীকৃত হয়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য হইতে আমরা অবগত হই যে, সুরথ নামে কলিঙ্গদেশের কোন প্রসিদ্ধ ভূপতি সমগ্র ক্ষিতিমণ্ডলে নিজপ্রভুত্ব বিস্তার করিয়া অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। স্বপুর (১) তাঁহার রাজধানী ছিল। কেবল কর্ণাটরাজ্য তাঁহার হস্তগত হয় নাই। সুতরাং কর্ণাটবিজয়-মানসে কোলা-বিধ্বংসী জাতীয় কর্ণাটাধিপতির বিরুদ্ধে তিনি সৈন্য পরিচালনা করিলেন। কিন্তু তদানীন্তন কর্ণাটেশ্বর অম্বিকাদেবীর প্রতি আন্তরিক ভক্তিমান্ থাকাহেতু দেবী তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রসন্না ছিলেন। তজ্জন্য সুরথ কর্ণাট বিজয়ে বিফলমনোরথ হইয়া রাজধানী স্বপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সময়ে ভাগ্যলক্ষ্মীও তাঁহার প্রতি অপ্রসন্না হইলেন। তাঁহার দশাবিপর্য্যয় দর্শনে শত্রুগণ মস্তকোত্তলন করিতে লাগিল, এমন কি রাজকর্ম্মচারীবর্গও বিদ্রোহিবর্গের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিল। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া তিনি রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক নানাদেশ পরিভ্রমণকরতঃ অবশেষে মেধসমুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। পরে তিনি উক্ত মুনির সাক্ষাৎলাভে কৃতার্থ হইয়া তাঁহার নিকট নিজ দুর্ভাগ্যের বিষয় নিবেদন করিলে মুনিবর তাঁহাকে অম্বিকার্চ্চ-

(১) ততঃ স্বপুর মায়াতো নিজ দেশাধিপোঽভবৎ ... ... ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

নায় মনোনিবেশ করিতে উপদেশ প্রদান করেন। এই উপদেশানুসারে অভীষ্ট-লাভের আশায় তিনি মহামায়ার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে সিদ্ধিলাভ করেন এবং অবশেষে ভবানীর কৃপায় স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েন। রাজ্যলাভের পর উক্ত মুনিপ্রবরের উপদেশে তিনি অকালবোধন দ্বারা দুর্গাপূজার আয়োজন করেন। এই পূজায় লক্ষ বলি প্রদানের ব্যবস্থা হয়। কথিত আছে, বিদ্রোহী ও শত্রুগণ এই বলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। যে স্থানে ঐ সকল বলি রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা বলিপুর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই পূজায় চণ্ডিকাদেবী সন্তুষ্টা হইয়া সুরথকে বরদানে ইচ্ছুক হইলে, সুরথ কর্ণাটের জয়লক্ষ্মী ভিক্ষা করেন। তাহাতে দেবীর আজ্ঞা হয়, যুদ্ধকালে সাত দিন শুদ্ধরূপে চণ্ডী পাঠ করিতে পারিলে কর্ণাট-জয় সহজসাধ্য হইবে। পরে সুরথ তাঁহার আজ্ঞানুমত কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়া কর্ণাট জয় করেন।

[বলিপুর ডুমরাবন ও মেধসাশ্রমের স্থান-নির্ণয়]

এক্ষণে আমরা এই আখ্যায়িকা হইতে দুইটী স্থানের নাম প্রাপ্ত হই। একটী স্বপুর ও অপরটী বলিপুর। জনশ্রুতি এই যে বর্ত্তমান সুপুরই প্রাচীন স্বপুরের পরিবর্ত্তিত নাম এবং সুপুরের নিকটবর্ত্তী বোলপুর পুরাতন বলিপুরের অপভ্রংশ। এই দুই স্থানের নৈকট্য-নিবন্ধন আখ্যায়িকার সামঞ্জস্যের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। এতদ্ব্যতীত সুপুর গ্রামের উত্তরে ৪ ক্রোশ দূরে ডুমুরাবন নামে শালতরুসমাচ্ছন্ন যে একটী সুবৃহৎ অরণ্য দৃষ্ট হয়, কথিত আছে যে, এই অরণ্যানী মধ্যে পূর্ব্বকথিত মেধস মুনির আশ্রম ছিল। তথায় "বাঘরাই চণ্ডি" নামে চণ্ডিকা দেবীর একটী মূর্ত্তি অদ্যাবধি বিরাজিতা আছেন। ডুমুরাবনের অদূরে একটী শীর্ণকলেবরা সরিৎ প্রবাহিতা। স্রোতোবেগে উক্ত সরিতের তটভূমি ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে আজ কয়েক বৎসর হইল একটী সুবৃহৎ তাম্রাধার বহির্গত হইয়াছে। তাহা দেখিতে প্রায় আধুনিক ভেকের মত। প্রবাদ এই যে, এই দেবী উক্ত মুনি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিতা হন। এ স্থলে আমাদের ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, বর্ত্তমান কালে চট্টগ্রামের অন্তর্গত মারোয়াতলী গ্রামের(১) সন্নিহিত পর্ব্বতের সানুদেশস্থিত স্থানবিশেষ মেধস মুনির আশ্রম বলিয়া ঘোষিত হইতেছে এবং তথায় মন্দিরাদি নির্ম্মাণ জন্য অর্থের সংগ্রহ হইতেছে। (২)

[সুরথ রাজের পরিচয়]

(১) সুলভ সমাচার ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১১।

(২) তীর্থস্থান লইয়া এইরূপ বৈষম্য অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। তাহার কারণ আমাদের প্রাচীন কালের ইতিহাসের অভাব। সেই জন্য বলিতে পারি না যে, ডুমুরাবনই মেধস মুনির আশ্রম না নবাবিষ্কৃত মারোয়াতালী গ্রামের সন্নিহিত স্থানটি মেধস-আশ্রমতীর্থ। তবে ডুমুরাবন যে কোন তাপসের আশ্রম ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই ত গেল এক পক্ষের মত। অপর পক্ষ বলেন যে, সুপুররাজ সুরথ কলিঙ্গাধিপতি মহারাজ সুরথ নহেন, ইনি স্বনামখ্যাত সম্বৎপ্রবর্ত্তক, উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতুষ্পুত্র। এই সুরথাদিত্যও কলিঙ্গাধিপতি মহারাজ সুরথের ন্যায় লক্ষবলি প্রদান পূর্ব্বক চণ্ডিকা দেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের নাম প্রসিদ্ধ বলিয়া দৃষ্ট হয় যে, বিক্রমাদিত্য নাম সংশ্লিষ্ট যে কোন আখ্যানে লোকে উক্ত সংবৎ-প্রবর্ত্তক শকারি বিক্রমাদিত্যকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এস্থলেও এইরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা ও বিশ্বাস। কেন, তাহা বলিতেছি। বিক্রমাদিত্য নামে বহুসংখ্যক নৃপতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে জন্ম গ্রহণ করতঃ রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। আমরা মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতে অবগত হই যে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মঙ্গলকোটের নিকটবর্ত্তী ও অজয় নদের উপকূলস্থ উজ্জয়িনী বা উজানী নামক স্থানে বিক্রমাদিত্য নামে একজন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। যদিও কোন গ্রন্থে সুরথাদিত্য নামে তাহার কোন ভ্রাতুষ্পুত্র থাকার বিষয় লিখিত নাই, অথবা আমরা এরূপ কোন গ্রন্থ দেখি নাই, তথাপি উজানী ও সুপুর এই দুই স্থানের নৈকট্য নিবন্ধন উক্ত সুরথাদিত্য যে, এই বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতুষ্পুত্র এই মত অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া আমাদের বিবেচনা হয়। কোন্ যুক্তির বলে আমরা শত শত ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী নগরাধিপতি লোকবিশ্রুত বিক্রমাদিত্যকে এই সুরথাদিত্যের খুল্লতাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইব? এতদ্ব্যতীত যেমন কবিকঙ্কণের বিক্রমাদিত্যের সুরথাদিত্য নামে কোন ভ্রাতুষ্পুত্র থাকার বিষয় গ্রন্থে দেখা যায় না, তদ্রূপ বত্রিশ সিংহাসনের বিক্রমাদিত্যের উক্ত নামে কোন ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল তাহাও আমরা কোন পুস্তক হইতে অবগত হই না। [সুরথের দ্বিতীয় বিবরণ]

সুপুররাজকে লইয়া প্রবাদের মধ্যে মতভেদ দেওয়া গেল। এই স্থানেই মতভেদের শেষ হয় নাই। এখনও তৃতীয় পক্ষ বর্ত্তমান। সুপুরনিবাসী গুরুলাল গুপ্ত লিখিয়াছেন (১) যে সুপুরে সুরথ নামে একজন পরাক্রান্ত হিন্দুজমীদার বাস করিতেন। যৌবনে তিনি ইন্দ্রিয়পরায়ণ উচ্ছৃঙ্খল ও পশুস্বভাব ছিলেন। কিন্তু দৈবকৃপায় তাঁহার এরূপ কদর্য্য স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। শুনা যায় যে তিনি একদিন রজনীকালে স্বপ্নযোগে নরকের ভীষণ বীভৎস দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। দেখেন যে তিনি যে সকল নরনারী হত্যা করিয়া পাপরাশি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাদের প্রেতাত্মাসমূহ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার দিকে

(১) Vide Rural Sketches by Gurulal Gupta p. 20.

[সুরথের কীর্ত্তিচিহ্ন]

ধাবিত হইয়াছে। তথন সুরথ ভয়াকুলচিত্তে শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক পাগলের ন্যায় ইতস্ততঃ পলায়নপর হইলেন। তথাপি দেখিতে লাগিলেন যে, সেই ভীষণ প্রেতমূর্ত্তিসকল প্রতিহিংসা-সাধন জন্য তীব্রকটাক্ষে তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। তথন অনন্যোপায় হইয়া সুপুরপতি ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইয়া অনুতাপে আত্মহারা হইয়া, নারায়ণী-স্মরণ করিতে লাগিলেন। এবংবিধ সময়ে দেবীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। তিনি অম্বিকার কৃপায় সর্ব্বপাপমুক্ত হইলেন। তৎপরে উক্ত লেথক মহাশয় সুরথের চণ্ডীপূজা ও বলি প্রদানাদি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সুরথবর্ণিত ঘটনার অনুরূপ।

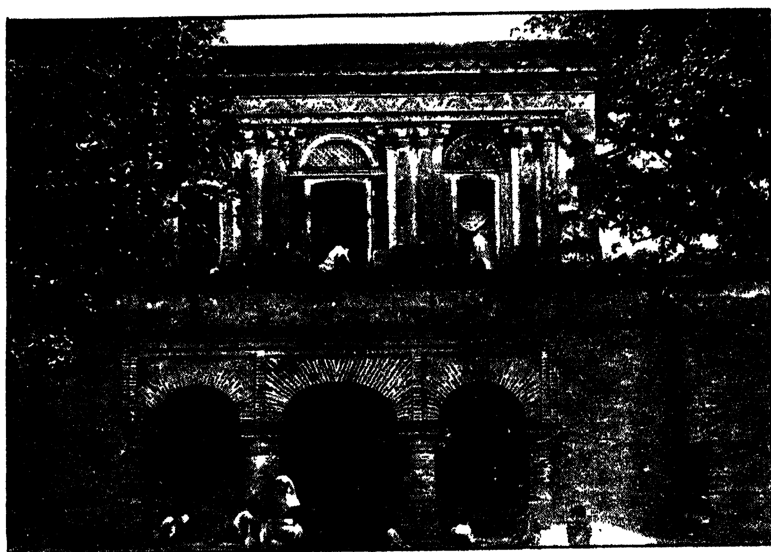
উপরোক্ত আখ্যায়িকাত্রয়মধ্যে গল্পাংশে কোনও পার্থক্য না থাকিলেও স্বপুর-বা সুপুর-পতিকে লইয়াই যত মতভেদ। নামে প্রভেদ নাই, পরিচয়েই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এরূপ মতভেদ বর্ত্তমান থাকিলেও এতটুকু স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন সময়ে সুপুর একটী বহুজনাকীর্ণ, সমৃদ্ধিশালী দুর্গশোভিত এবং প্রাকার-পরিবেষ্টিত নগর ছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই প্রাকারের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। গ্রামের পূর্ব্বোত্তর ভাগে 'রায়ান' নামক পুষ্করিণীর দক্ষিণতীরে সুপুর-রাজের বাটীর ভগ্নাবশেষ এথনও দৃষ্টি-গোচর হয়। (১) এ স্থানে কেহ কেহ সময়ে সময়ে অর্থ ও বহুমূল্য দ্রব্য পাইয়াছেন। গ্রামের বাহিরে উত্তর পশ্চিমাংশে রাজা সুরথপ্রতিষ্ঠিত 'সুরথেশ্বর' নামক শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছেন। এই শিবমন্দিরের আঙ্গিনার পূর্ব্বপার্শ্বে হস্তপদ ও মস্তকবিহীন ভৈরবমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। কথিত আছে—কালাপাহাড় উহা ভগ্ন করিয়া দেয়। শুনা যায় যে, উক্ত শিবমন্দির সুপুরের মথুর হাজরা ও উক্ত গ্রামের নিকটবর্ত্তী মির্জ্জাপুরনিবাসী মাণিকদাস বৈষ্ণব কর্ত্তৃক অনুমান ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে।

গ্রামের পশ্চিমাংশে 'সুবিক্ষে' নামক দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। তথায় মহানবমীর দিন বহুবিধ বলি প্রদত্ত হইয়া থাকে। গ্রামের উত্তর ও পশ্চিমে 'গড়ের বাগান' নামক দুইটী উদ্যান বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে ঐ সকল স্থানে গড় ছিল, এবং উহা সুপুরপতি সুরথ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া কথিত হয়।

(১) "A few years ago a number of diggers while excavating a tank near the supposed site of the palace of Surat Raja, unearthed a flight of steps greatly dilapidated and injured by time. Specimens of small hard bricks, pieces of cornice, fragments of commemorating pillars may be found in every abondoned place, attesting the fact that there lived in this village a wealthy chief"—(Rural sketches by Gurulal Gupta Page 70.)



সুপুর—সুরথেশ্বর-শিবমন্দির-প্রাঙ্গণে পতিত স্তম্ভ



ভাণ্ডীরবন—শ্রীগোপাল-মন্দিরের তোরণদ্বার

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত এই গ্রামে একটী 'যক' নামে প্রাচীন সরোবর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সরোবর সম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। আমরা সে বিষয়ের সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার না করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

[যক্ সরোবর ও রায়বংশের পরিচয়]

ঈশ্বর রায় ও ভগবান্ রায় নামক দুইজন বহুদর্শী চিকিৎসক কোন সময়ে এই স্থানে আগমন করিয়া বাস করেন। উক্ত ভগবান রায়ের ষষ্ঠ পুরুষ নানারূপ অত্যাচার করিয়া প্রভূত ধন সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় মৃত্যুকালে তিনি আপন ধনরাশি যকের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া যান। (১) নির্জ্জন প্রান্তরে অবস্থিত সেই সরোবরের মসীকৃষ্ণ অম্বুরাশি সাধারণের ভীতি উৎপাদন করিয়া থাকে, প্রাচীন ব্যক্তিগণও এই তড়াগ সম্বন্ধে নানারূপ বিস্ময়জনক ও আতঙ্কোৎপাদক গল্পের উল্লেখ করিয়া থাকেন।

[রায়পুর ও সত্যেন্দ্র প্রসন্ন]

রায়পুর সুপুরান্তর্গত একটী পল্লী। এই স্থানের উত্তর রাঢ়ীয় বাৎস্য গোত্রজ সিংহ-পরিবারমধ্যে কায়স্থ-কুলধ্বজ স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বর্ত্তমান কালে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি। ইনি ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ২৪শে মার্চ্চ তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন।

[সিংহবংশের পরিচয়]

বহুকাল পূর্ব্বে সত্যেন্দ্র প্রসন্নের আদিপুরুষ মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাঁদি গ্রামের আদিম নিবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মেদিনীপুর জেলার মধ্যে চন্দ্র-কোণা নামক গ্রামে বসতি স্থানান্তরিত করেন। সেই স্থানে সিংহ-পরিবার প্রতিষ্ঠিত 'সিংহদীঘি' নামক এক সুবৃহৎ সরসী ও বাসগৃহের ভগ্নাবশেষ এখনও পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কখন এই চন্দ্রকোণা গ্রামে আগমন করিয়া তথায় কতদিন বাস করিয়াছিলেন, তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইবার উপায় নাই।

বীরভূমে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির অভ্যুদয়কালে, পরবর্ত্তী পুরুষ লালচাঁদ সিংহ, ব্যবসায়ানুরোধে চন্দ্রকোণার বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, রায়পুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার সঙ্গে প্রায় সহস্রাধিক তন্তুবায়ও আগমন করিয়াছিল। এই তন্তুবায়গণ যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত করিত, তাহা তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

(১) শুনিতে পাওয়া যায় যে প্রাচীন কালে অর্থশালী ব্যক্তির উত্তরাধিকারী না থাকিলে, তিনি মৃত্তিকার নিম্নে একটি প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে তাঁহার অর্জ্জিত অর্থ রাখিতেন। পরে একটি অনাথ বালক ক্রয় করিয়া সেই প্রকোষ্ঠে তাহাকে আবদ্ধ করতঃ বহিরাগমনের সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া দিতেন। ক্রমে বালক অনাহারে অবসন্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ইহারই নাম "যক্" বা "যখ্ দেওয়া" এই শব্দ 'যক্ষ' শব্দের অপভ্রংশ।

সুরুলস্থ কমারশিয়াল রেসিডেণ্ট্ মিঃ চিপের (১) নিকট বিক্রয় করিতেন। এই সুরুল গ্রাম রাইপুরের সন্নিকটে অবস্থিত।

লালচাঁদের পুত্র শ্যামকিশোর এই ব্যবসা দ্বারা আপন অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধনকরতঃ নগর-রাজের নিকট হইতে সেনভূম পরগণার জমিদারি স্বত্ব ক্রয় করেন। তিনি যে এক উচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানকালে সিংহ পরিবার তাহাতেই বাস করিয়া থাকেন।

শ্যামকিশোরের তিনপুত্র, জগমোহন, ভুবনমোহন ও মনমোহন। জগমোহনের বিষয়-বুদ্ধি অতীব প্রখর ছিল। তিনি স্বয়ং নিজ জমিদারী তত্ত্বাবধান করিয়া তাহার অধিকতর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

ভুবনমোহনের ছয় পুত্র ও এক কন্যা, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রতাপনারায়ণ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট-পদে অভিষিক্ত হইয়া অতি সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করেন। কনিষ্ঠ রায় চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুরও উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে কলিকাতার ষ্ট্যাম্প্ কালেক্টার্ ও এক্সাইজ্ কালেক্টার্ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

প্রতাপনারায়ণের সুযোগ্য পুত্র হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ মহাশয় সাহিত্য-সমাজে বিশেষ পরিচিত।

মনোমোহনের তিন পুত্র, নীলকণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠ ও সিতিকণ্ঠ। নীলকণ্ঠের পুত্র রুদ্রপ্রসন্ন গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত-বিভাগে কার্য্য করিতেন। ইহাঁর পুত্র সজনীকান্ত কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল।

শ্রীকণ্ঠের পুত্র সন্তান ছিল না। সিতিকণ্ঠের চারিপুত্র রমাপ্রসন্ন, দেবেন্দ্র প্রসন্ন, নরেন্দ্র প্রসন্ন ও সত্যেন্দ্র প্রসন্ন। রমাপ্রসন্ন সিউড়ী কোর্টের গবর্ণমেণ্টের উকীল ছিলেন। হেতমপুর রাজষ্টেটের যাবতীয় মোকদ্দমার কার্য্য তাঁহার উপর ভারার্পিত ছিল। তিনি দানশীল, সরলহৃদয় ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। চারুচন্দ্র, প্রফুল্ল, শরৎচন্দ্র ও অনুকূল নামে তাঁহার চারিপুত্র।

চারুচন্দ্র সম্প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর লিগাল এড্ভাইজার পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রফুল্লচন্দ্র হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। অপর দুইটী পুত্র গৃহেই অবস্থিতি করেন।

নরেন্দ্র প্রসন্ন এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকেল কলেজে ইংরাজী

(১) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে John Cheap নামক বঙ্গীয় Civil service ভুক্ত একজন সাহেব বোলপুরের দুই মাইল পশ্চিমে সুরুল নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত কুঠীতে সর্ব্বপ্রথম Commercial Resident হইয়া আইসেন।

চিকিৎসা-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভকরতঃ আসিষ্টান্ট্ সার্জ্জন উপাধি প্রাপ্ত হয়েন এবং স্বগ্রামে কিছুদিন চিকিৎসাকরণান্তর, উক্ত চিকিৎসা শাস্ত্রে অধিকতর পারদর্শী হইবার নিমিত্ত ভ্রাতা সত্যেন্দ্র প্রসন্নের সহিত বিলাত যাত্রা করেন। তথায় S. M.S. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে সিভিল সার্জ্জেন নিযুক্ত হয়েন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রপ্রসন্ন কোন কারণবশতঃ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রতি ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ মহিম সিংহ Cambridge University তে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, দুঃখের বিষয় ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি ইংলণ্ডে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বীরভূম জেলা স্কুল হইতে বাবু শিবচন্দ্র সোম (১) হেড্ মাষ্টারের সময় প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মহাতাগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মিত্রের কন্যা শ্রীমতী গোবিন্দমোহিনী দাসীর পাণিগ্রহণ করেন এবং ১৮৮১ সালে বিলাত গমনকরতঃ ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। তিনি এই ব্যারিষ্টারী কার্য্যে এতদূর প্রশংসাভাজন হইয়া উঠেন যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার গুণের পুরস্কার-স্বরূপ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহাকে অস্থায়ীভাবে Advocate General পদে নিযুক্ত করেন। এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি উক্ত পদে স্থায়ী হন। তদনন্তর ভারত সম্রাট তাঁহাকে Law member এর সম্মানিত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ভারতবাসীর মধ্যে তিনিই সর্ব্ব প্রথমে এই পদ লাভ করেন। কিন্তু এই পদ গ্রহণ করার জন্য তাঁহার বিশেষ আর্থিক ক্ষতি হওয়ায় তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি এক্ষণে পুনরায় ব্যারিষ্টারী কার্য্যে ব্রতী হইয়া হাইকোর্টের ব্যারিষ্টারগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। বর্ত্তমান

(১) ইনি চুঁচুড়া-নিবাসী সোমবংশীয়। ইঁহার চরিত্র ও হৃদয় অতুলনীয়। সোম মহাশয় পারদর্শিতা-গুণে হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তথা হইতে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি হেতমপুর মহারাজের হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছেন এবং রাজষ্টেট্ হইতে পেন্‌সন পাইতেছেন। এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম ৮৩ বৎসর, কিন্তু এ বয়সেও তাঁহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ; যুবকও তাঁহার ন্যায় পরিশ্রম করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহার জন্মকাল ১২৩৬ সাল অগ্রহায়ণ মাস [১৮২৯ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাস] সোম মহাশয় শিক্ষাবিভাগে ৩৪ বৎসর কাল অতি প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করেন।

সময়ে বীরভূমের পূর্ব্ব গৌরব বিস্মৃতির অন্ধকারময় গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের গুণবত্তার জন্ম অনেক দিনের পর পুনরায় বীরভূমের মুখ উজ্জল হইয়াছে ।

সুপুর-কাহিনী

(পরিশিষ্ট)

এতদঞ্চলে প্রবাদ আছে সাতটী 'স' লইয়া সুপুর। অবশ্য এই 'স'এর মধ্যে 'শ'ও আছে। সাতটী 'স' যথা—১। 'সুরথেশ্বর শিব', ২। 'সুবিক্ষা দেবী', ৩। শঁ-ভার (পুকুর) ৪। 'শ্যামরায়' (আনন্দচাঁদ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহমূর্ত্তি), ৫। সুহ্ম রায় (ধর্ম্মরাজ, গ্রাম-দেবতা) ৬। শ্মশানকালী ও ৭। সা-পীর, (পীর, মুসলমানদের দেবতা)। বলা বাহুল্য যে সুপুরগ্রাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু পরে ভিন্ন সময়ে এই সাতটী 'স'এর কোন কোনটীর হওয়াও অসম্ভব নয়। সুরথেশ্বর শিব সুরথের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। "সুবিক্ষার" কোন মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ইনি চণ্ডীরই অপরা মূর্ত্তিরূপে পূজিতা হন বলিয়া জানা গেল। ধর্ম্মমঙ্গলে সুবিক্ষা নামে এক দেবীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 'শঁ-ভার'টীকে আমরা পরিখার অন্তিম চিহ্ন বলিয়া মনে করি। 'সুহ্মরায়' ধর্ম্মরাজ বহু দিনের বলিয়া মনে হয়। ইলিমবাজার (সেনভূম) অঞ্চল যে এক সময়ে সুহ্মদেশের অন্তর্গত ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।(১) ইলামবাজার অঞ্চলে সুহ্মেশ্বরী নামে একটী বৌদ্ধতারা-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় আমাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। অনুমান পাল-রাজগণ এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। পালরাজগণের সময়ে সেনভূমে লাউসেন নামক রাজার অভ্যুদয় হয়। তিনিই এতদঞ্চলে ধর্ম্মরাজ পূজার প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। বহু স্থানেই তিনি ধর্ম্মরাজমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুহ্মে প্রতিষ্ঠিত সুহ্মরায় ধর্ম্মরাজ তন্মধ্যে অন্যতম। এই নাম অনুকরণে তৎ-সমসময়ে বা পরবর্ত্তীকালে বহু স্থানে সুহ্মরায় নামীয় ধর্ম্মরাজপূজার প্রচলন হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। 'সা-পীর' এক জন মুসলমান ফকির ছিলেন। তাঁহার সমাধিক্ষেত্রই এখন মুসলমানগণের নিকট 'সা পীর' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পূজিত হইতেছে।

সুপুরকাহিনীতে আমীরা সুপুর ও সুরথ সম্বন্ধে কয়েকটী মতের আলোচনা করিয়াছি। চণ্ডীর "ততঃ স্বপুরমায়াতো নিজদেশাধিপোঽভবৎ" শ্লোক হইতে

(১) শ্যামারূপার গড় কাহিনী দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা স্বপুরের অপভ্রংশ সুপুর হইয়াছে বলেন তাঁহাদের সম্বন্ধে এখানে আরও কিছু বক্তব্য আছে। মহামহোপাধ্যায় নাগোজীভট্টকৃত চণ্ডীর টীকা অতি প্রাচীন; গোপাল চক্রবর্ত্তীর টীকাও অতি প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের টীকায় 'স্বপুর' অর্থে যে রাজধানী এরূপ ব্যাখ্যা কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। চণ্ডীতে লক্ষ-বলীর প্রসঙ্গও নাই। চণ্ডীতে আছে সমাধি ও সুরথ—

"নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিং চৈব নিজ গাত্রাসৃতক্ষিতম্॥"

সুতরাং 'স্বপুর' ও বলিপুরের ভিত্তি তেমন ঘাতসহ বলিয়া মনে হইতেছে না। এতদ্ভিন্ন আনন্দচাঁদ গোস্বামীর সম্বন্ধে একটী ভ্রমাত্মক প্রবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার সংশোধন আবশ্যক মনে করি। উল্লিখিত হইয়াছে 'বীরভূম খুষ্টিকুড়ী-নিবাসী ফকির সাহ আবদুল্লার সহিত আনন্দচাঁদ গোস্বামীর সৌখ্য ছিল ইত্যাদি।" কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলে গোস্বামী জীউ অপেক্ষা ফকির প্রায় দুই শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন। মঙ্গলডিহি-কাহিনী প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি যে, মঙ্গলডিহির ঠাকুর পর্ণিগোপালের সহিত ফকির সাহ-আবদুল্লার বন্ধুত্ব ছিল। প্রকৃত বৃত্তান্ত তাহাই। তাহা হইতেই এইরূপ হিন্দু-মুসলমান সাধকের পরস্পর বন্ধুত্বের প্রবাদ উদ্ভূত হইয়াছে। সে প্রবাদ যাহার তাহার সঙ্গে জড়িত হইয়াছে। তাহার কারণও আছে। যে সময়ে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের করুণা-প্লাবনে বঙ্গদেশ হইতে ভেদদ্বন্দ্ব তিরোহিতপ্রায় হইতেছিল, সেই সময় শ্রীচৈতন্যভাবানুপ্রাণিত শ্রীসুন্দরানন্দের মন্ত্রশিষ্য পর্ণিগোপাল ঠাকুর সেই একই উদ্দেশ্যানুসরণে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন। মুসলমান অত্যাচারে অধঃপতিত হিন্দু-সমাজ তখন প্রায় মরণাপন্ন। পর্ণিগোপাল ঠাকুরের প্রথম লক্ষ্য হয়, এতদঞ্চলের পল্লীগ্রামসমূহে হিন্দু-মুসলমানের চির-বৈরতা দুরীকরণ করা। এই মহদুদ্দেশ্যে তিনি যবন ফকির সাহ আবদুল্লার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। অবশ্য সমানে সমানেই এই বন্ধুত্ব সংঘটিত হইয়াছিল। মুসলমান হইলেই অত্যাচারী হইবে এমন কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নাই। সকল জাতির মধ্যে সকল সময়েই সাধু-সজ্জন বর্ত্তমান থাকেন, তখনও ছিলেন। তখনকার কালেও এই জাতি-বৈরতা দুরীকরণের জন্য অনেক ভবিষ্যদ্দর্শী চিন্তাশীল মুসলমানের হৃদয় ব্যাকুল হইত। ফকির সাহ আবদুল্লা তাঁহাদেরই মধ্যে অন্যতম। ইঁহাদের যত্নে এতদঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান যে নিরবচ্ছিন্ন প্রীতিবন্ধনে

আবদ্ধ হইয়াছিল বহু দিন পর্য্যন্ত তাহা অব্যাহত ছিল। সে মধুর স্মৃতির শেষ নিদর্শন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। বীরভূমের ইতিহাসে ইহা একটী স্মরণীয় ঘটনা। তাই বীরভূমের পল্লীবাসী হিন্দু-মুসলমানের এই মিলনকাহিনী সেকালের দুই জন হিন্দু-মুসলমান-সাধকের জীবন জড়িত করিয়া আপনারা কৃতার্থ হয়, তৃপ্তি লাভ করে।

পণিগোপাল ঠাকুরের সহিত সাহ আবদুল্লার সৌহার্দ্দ্যের প্রামাণ্য সাক্ষ্যেরও অভাব নাই। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মঙ্গলডিহি কবি প্রভুপাদ নয়নানন্দ তাঁহার প্রেয়োভক্তিরসার্ণব গ্রন্থে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। নয়নানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র কবি জগদানন্দ ঠাকুরের "শ্যামচন্দ্রোদয়" গ্রন্থে সাক্ষিস্বরূপ নিম্নোক্ত শ্লোকটী লিখিত আছে—

"যবনান্নং কৃতং পুষ্পং ব্যাঘ্রে মন্ত্রপ্রদায়কং।
স্বং নত্বা পণিগোপালং ক্রিয়তে পুস্তকং ময়া॥"

প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় সাহ আবদুল্লার প্রেরিত অন্ন পানুয়াঠাকুর পুষ্পে পরিণত করিয়াছিলেন এবং এক দিন ব্যাঘ্রে চড়িয়া সাহ আবদুল্লার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। ফকির তখন একটী প্রাচীরের উপর বসিয়া দন্তধাবন করিতেছিলেন; ঠাকুরকে আসিতে দেখিয়া তিনি দাঁতনকাঠিটী তাড়াতাড়ি মাটীতে পুঁতিয়া ফেলিলেন; অধিকন্তু প্রাচীর-বাহন চালাইয়াই কিয়দ্দূর অগ্রবর্ত্তী হওতঃ ঠাকুরের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। খুষ্টিকুড়ীতে একটী অদ্ভুত তেঁতুল বৃক্ষকে দাঁতনকাঠির গাছ বলিয়া লোকে আজিও সম্মান প্রদর্শন করে। মোটকথা মঙ্গলডিহির বৈষ্ণব-সাধক পণিগোপাল ঠাকুরের সহিতই যে যবন ফকির সাহ আবদুল্লার সৌহার্দ্দ্য ছিল উপরি উক্ত প্রবাদ পরম্পরায় তাহাই সমর্থন করে। আনন্দচাঁদ গোস্বামীর সহিত ফকিরের কোন সংস্রব ছিল না।

সুপুরের উত্তর-পশ্চিমাংশে 'ঝোটের ডাঙ্গা' নামে কতকটা স্থান জুড়িয়া বহু প্রাচীন ধ্বংস-স্তূপের কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। নামেই অনুমিত হইতেছে যে, তথায় কোনও দুর্গ ছিল। বাস্তবিকই সুরথ যিনিই হউন, প্রাচীন সুপুর যে পরিখা-প্রাকার-পরিবেষ্টিত দুর্গবদ্ধ স্থান ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ঝোটের ডাঙ্গায় রায়পুকুর নামে একটী জলাশয় হইতে কতকগুলি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু চিনিবার উপায় নাই। মূর্ত্তিগুলি অত্যধিক পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালে সিন্দূরের প্রলেপ সেই ক্ষয় পরিপূর্ণ করিতে

অগ্রসর হওয়ায় তাহাদের যা কিছু নিজস্ব ছিল বিলোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। সুপুরের নিকটবর্ত্তী রজতপুর নামক গ্রামের কোন দেবমন্দিরে এই পরিচয়হারা মূর্ত্তিগুলি পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। লোকে বলে রজতপুরে সুরথের রাজকোষ রক্ষিত হইত। ধনাগাররূপে ব্যবহৃত সেই ঐশ্বর্য্যশালিনী পুরী এখন রজতপুর নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

ভাণ্ডীরবন-কাহিনী

ভাণ্ডীরবন গ্রামের অবস্থিতি এবং বিবরণ

সিহুরীর উত্তর-পশ্চিম-কোণে প্রায় ছয় মাইল দূরে ভাণ্ডীরবন নামক লতা-গুল্মাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র মনোরম পল্লী অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র পল্লী রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য-সমূহের নিকেতন ; এই মনোরম পল্লীর সৌন্দর্য্য ও বনরাজি শোভা এবং সুখধাম বৃন্দাবনের অনুকরণে এ স্থানে রাধাকুণ্ড, নদীপুলিন, রাসমঞ্চ ও বিপিন দর্শনে দর্শকমণ্ডলীর স্বতঃই মনে হয়, এস্থানে দ্বিতীয় বৃন্দাবনের অপূর্ব্বসৃষ্টি হইয়াছে।

উত্তরে ময়ূরাক্ষী নদী ও আম্রকানন, দক্ষিণে পুষ্করিণী ও কর্ষিত-ভূমি, পূর্ব্বে বীরসিংহপুর গ্রাম এবং পশ্চিমে উন্মুক্ত প্রান্তর ও গোপালপুর গ্রাম এই চতুঃসীমা-মধ্যে গ্রামটী অবস্থিত।

পল্লীমধ্যে শ্রীশ্রী৺গোপালদেবের মন্দির। গ্রামের ঠিক পশ্চিম-প্রান্তে এই মন্দিরের উত্তরাংশে স্বল্প দূরে ক্ষীণা স্বল্পতোয়া ময়ূরাক্ষী নদী মন্থর-গতিতে প্রবাহিত।

কোন্ সময়ে কিরূপ ভাবে এবং কাহার দ্বারা এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আমরা যতদূর ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছি, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইলাম।

পল্লী মধ্যস্থ শ্রীশ্রীগোপালদেবের মন্দিরের ইতিহাস

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দাসরাজগণের আধিপত্য-সময় হইতে—এমন কি একাদশ শতাব্দীতে সুলতান মাহমুদের লুণ্ঠনকাল হইতেও বলা যায়—পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের দেবমন্দিরের উপর ভীষণ অত্যাচার হইয়াছিল। শেষোক্ত সময়ের মধ্যে অন্যান্য দেবমন্দির প্রভৃতির সহিত ব্রজধামের মন্দিরসমূহের সম্পূর্ণ ধ্বংসকার্য্য সংসাধিত হয়। ঐ সকল দেবমন্দিরের কোনটী ভগ্ন, কোনটী অঙ্গহীন, কোনটী এক কালে ধূলিসাৎ হইয়া যেন অদ্যাপি যবনগণের ভীষণ অত্যাচার-কাহিনী ঘোষণা করিতেছে।

বঙ্গের এই ভীষণ দুর্দ্দিনের, যবনগণের এই বিভীষিকাময় দেবসংহার-ব্রতের তাণ্ডবাভিনয়কালে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ধ্রুব গোস্বামী (১)

(১) এই ধ্রুব গোস্বামী মঙ্গলডিহি গ্রাম-প্রসঙ্গে বর্ণিতব্য, নৈমিষারণ্যবাসী বলিয়া কথিতব্য, ধ্রুব গোস্বামী একই ব্যক্তি বলিয়া অনুমিত হয়। এস্থানে ধ্রুব গোস্বামী বৃন্দাবনবাসী

নামক জনৈক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তাঁহার দ্বাদশগোপাল সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে পলায়নকরত এই ভাণ্ডীরবন গ্রামে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শুনা যায় যে, গোস্বামিপ্রবর অত্রত্য দোলমঞ্চ নামক মন্দিরে কিছুকাল অবস্থিতি করেন; কিন্তু একটী মর্ম্মবিদারক দুর্ঘটনায় তিনি এ স্থান ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনোদ্দেশে প্রস্থান করিতে বাধ্য হন। ইঁহার সময়ে সন্নিকটবর্ত্তী খটঙ্গা গ্রামে এক রাজা ছিলেন (১), এইরূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তাঁহার পরিবারস্থ কোন বিধবা যুবতীর সহিত তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণের অবৈধ প্রণয় সংঘটিত হয়। এই ঘোর পাপকাহিনী রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তদ্দণ্ডেই হতভাগ্য ব্রাহ্মণের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিতে আদেশ প্রদান করেন। নিঃসহায় ব্রাহ্মণ প্রাণভয়ে অনন্যোপায় হইয়া ধ্রুব গোস্বামীর আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরমকারুণিক গোস্বামিবর তাঁহাকে ভীষণ ভয়ে প্রকম্পিত-কলেবর দেখিয়া অভয় প্রদান করিলেন; কিন্তু রাজরোষ-বহ্নি গোস্বামীর শান্ত-সুশীতল-আশ্রমেও স্ফীতবক্ষে প্রবেশ করিল; রাজাদিষ্ট নরাকারে রাক্ষসমূর্ত্তি সৈন্যগণ ভৈরব গর্জ্জনে সন্ন্যাসীর আশ্রম বেষ্টন করিল ও সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ না করিলে তাঁহারও বিনাশসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। হতভাগ্য নিঃসহায় ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইয়া সন্ন্যাসীর আশ্রম ত্যাগ করত প্রাণের আবেগে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু বেগবান্ অশ্বারোহী রাজসৈন্যের নিকট বিপন্ন দুর্ব্বল ব্রাহ্মণের নৈরাশ্য-ক্লান্ত-গতি আর কতক্ষণ স্থায়ী হইবে? তিনি অচিরে ধৃত ও অতি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইলেন। যে প্রান্তরে এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, তাহা অদ্যাপি "সাত বিঘার মাঠ" বলিয়া অভিহিত। ব্রহ্ম-হত্যা-কলুষ-কলঙ্কিত এই ভীষণ প্রান্তরে চিরাভ্যস্ত কুসংস্কার-প্রণোদিত হইয়া বিষম অনর্থ-পাতের ভয়ে কোন ব্যক্তিই কর্ষণ করিতে পারে না; শ্রীশ্রীগোপালজীউর তত্ত্বাবধানে ইহার কর্ষণাদি হইয়া থাকে।

এই হৃদয়-বিদারক ব্রহ্মহত্যা-দর্শনে ধ্রুব গোস্বামীর কারুণ্য-প্রস্রবণ স্বভাব-কোমল হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিল এবং তিনি সেই মুহূর্ত্তেই এ স্থান পরিত্যাগ করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। তদনুসারে তিনি তাঁহার দ্বাদশ গোপাল সঙ্গে লইয়া ময়ূরাক্ষীতটে উপস্থিত হইলেন, জনপ্রবাদ এই যে, তখন চৈত্র মাস, প্রবল

বলিয়া প্রতীত হইতেছে। তাহার কারণ সাধুগণ অনেক স্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকেন, এবং যখন যে স্থানে অবস্থান করেন লোকে তাঁহাকে সেই স্থানেরই বলিয়া থাকে।

(১) এই রাজার অন্য কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।

বারিবর্ষণে ময়ূরাক্ষী জলে পূর্ণ হইয়া দুই কূল প্লাবিত করিয়া আপন গর্ব্বে স্ফীত-বক্ষে ছুটিয়াছে।

গোস্বামীর প্রতিজ্ঞা অটল; ময়ূরাক্ষীর এই ভয়াবহ তাণ্ডবনৃত্য দর্শনেও গোস্বামীপাদ কিছুমাত্র ভগ্নোৎসাহ না হইয়া অবিচলিত অধ্যবসায়ে একটী ক্ষুদ্র তরণী নির্ম্মাণ করিলেন। তারপর যে আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা একবার মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দেখিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়, হৃদয় পুলকে পূর্ণ হয়। তিনি তরণীর উপর একে একে একাদশ বিগ্রহ স্থাপন করিলে, শুনা যায় যে, দ্বাদশ গোপাল এই পবিত্র আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি ধারণ করেন; গোস্বামী গোপাল-দেবকে উত্তোলন করিতে প্রাণপণে উদ্যম করিয়া হতাশভাবে রোষে ক্ষোভে অভিমানে ভারাক্রান্ত হইয়া উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময়ে গোপালদেবের অনন্ত-মহিমা প্রভাবে ও তাঁহার মঙ্গলময় বিধানে গোস্বামী এক ভিক্ষুক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সেই পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে দেখিলেন। মধুর সম্ভাষণে ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া তাঁহারই হস্তে এই গোপালবিগ্রহ ন্যস্ত করিয়া সন্ন্যাসী এ স্থান হইতে প্রস্থান করেন। ব্রাহ্মণ ভক্তি-কণ্টকিত-হৃদয়ে গোপালমূর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিয়া চলিলেন, তিনি নিকটবর্ত্তী নোয়াডিহি গ্রামের শ্রীনন্দদুলাল ঘোষাল মহাশয়ের বাটীতে আগমন করেন এবং তাঁহার বিষ্ণুমন্দিরে গোপালকে রক্ষা করিয়া "স্নান করিয়া আসি" এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন, আর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না; তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। যাহা হউক, নন্দদুলাল ও গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ গোপালদেবের মনোমোহন প্রেমময় অপূর্ব্ব-মূর্ত্তি দর্শনে যুগপৎ বিস্ময় ও প্রেমরসে আপ্লুত হন এবং বিষ্ণু-মন্দিরেই প্রভুর সেবার সুবন্দোবস্ত করেন। পূজারী-ভবনে প্রথম প্রথম গোপালের জন্য নারীহস্তে রন্ধন ও উষ্ণ চাউলের ভোগ হইত। তৎপরে প্রভুর স্বপ্নাদেশ হয় যে, তাঁহার সেবাকার্য্যে নারীহস্তে রন্ধন নিষেধ এবং তিনি পূজারীকে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পায়সান্নের ভোগ দিতে প্রত্যাদেশ করেন, সেই অবধি গোপালজীউর পায়সান্নের ভোগ আরম্ভ হয়।

বহুদিন পরে মহাত্মা রামনাথ ভাদুড়ী নামক জনৈক স্বনামধন্য বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ভাণ্ডীরবনে মনোহর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া গোপালজীউকে ঘোষাল বংশের সহিত এখানে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন।

রামনাথ ভাদুড়ী কত খৃষ্টাব্দে এবং কি উদ্দেশ্যে বীরভূম-অঞ্চলে আগমন করেন

মহাত্মা রামনাথ ভাদুড়ীর বীর-ভূম আগমনের উদ্দেশ্য এবং সময়-নিরূপণ

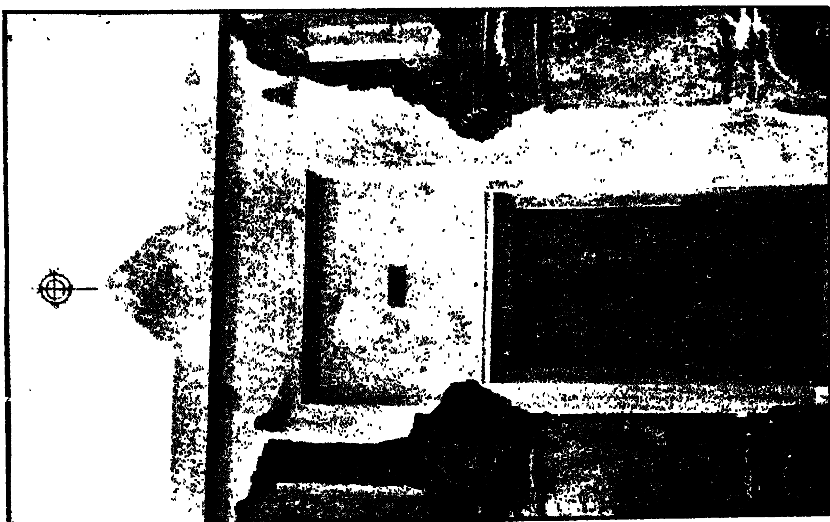
এ সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিকই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়। শ্রীযুক্ত হাণ্টার সাহেব তাঁহার "The Annals of Rural Bengal" নামক পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে যখন সমগ্র বঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়, তখন রামনাথ ভাদুড়ী এই বন্দোবস্ত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া বীরভূমে প্রেরিত হন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, এই মহাত্মার দ্বারা ভাণ্ডীশ্বর শিবমন্দির নির্ম্মিত হয়। তিনি যে ভাষায় এই ভাবটী ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, যে সময়ে রামনাথ ভাদুড়ী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে বীরভূমে আগমন করেন, সেই সময় তিনি উক্ত শিবমন্দিরটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু মন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত "রসাব্ধি ষোড়শ শকে" ইত্যাদি শ্লোক পাঠে আমরা অবগত হই যে, মহাত্মা রামনাথ ভাদুড়ী ১৬৭৬ শকাব্দে বা ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে বিভাণ্ডীশ্বর মহাদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন; সুতরাং ইহা অবিসংবাদিতরূপে স্বীকার করিতে হইবে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির উক্ত মহাত্মা-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি এই সময়ে কোন্ সূত্রে বীরভূমে আগমন করেন, তাহার কোনরূপ বিবরণ আমরা কোন পুস্তকে দেখিতে না পাইলেও এতৎ সম্বন্ধে এদেশে যে সকল জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা হইতে যতটুকু অবগত আছি এবং গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে আলীবর্দ্দী খাঁ মুর্শিদাবাদের নবাবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, রামনাথ ভাদুড়ী উক্ত নবাবের একতম উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

শুনিতে পাওয়া যায় যে, তদানীন্তন নগরাধিপতি আসদ্জ্জমান খাঁয়ের মুর্শিদাবাদ নবাবসরকারে দেয় রাজকর বাকী পড়ে, তজ্জন্য উক্ত কর আদায় করিবার জন্য রামনাথ ভাদুড়ী বীরভূমে প্রেরিত হয়েন। তিনি বীরভূমে আসিয়া পশ্চিমে হুসানাবাদ নামক গ্রামে নগররাজের গ্রীষ্মাবাসে কিছুদিন বাস করেন। সেই সময় লোকমুখে মহাত্মা রামনাথের দেব-দ্বিজে ঐকান্তিকী ভক্তি আছে জানিয়া তদানীন্তন বিভাণ্ডীশ্বর শিবের পাণ্ডা দুঃখহরণ চৌধুরী তাঁহার নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে শিব-সেবার দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করেন। তখন ভাণ্ডীরবন গভীর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। কিন্তু রামনাথ ভাদুড়ীর শিব-সন্দর্শনের প্রবলা বাসনা জাত হইয়া নগররাজ হুসানাবাদ হইতে বর্ত্তমান ভাণ্ডীরবন পর্য্যন্ত জঙ্গল কর্ত্তন করাইয়া একটী পথ প্রস্তুত করাইয়া দেন। মহাত্মা রামনাথ এই পথাবলম্বনে



ভাণ্ডীরবন ভাণ্ডেশ্বর-শিবমন্দির।



ভাণ্ডীরবন—বীরসিংহের কালীবাটী।

ভাণ্ডীরবনে গমন করিয়া শিবির সন্নিবেশকরত একান্ত ভক্তিগত-চিত্তে মহাদেবের পূজা-বন্দনাদি করিয়া তথায় কিছুকাল বাস করেন এবং শিব-মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সেবার জন্য প্রথমতঃ দৈনিক ।০ চারি আনা পয়সা মূল্যের ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দেন। তথা হইতে তিনি নোয়াডিহি গ্রামে যাত্রা করেন ও তথায় গোপাল দেবের অতুলনীয় নয়নানন্দকর শান্তস্নিগ্ধ প্রেমময়-মূর্ত্তি-দর্শনে ভক্তি-প্রেমরসে আপ্লুত হইয়া গোপালজীউএরও অতি সঙ্কীর্ণ ভোগের ব্যবস্থা দেখিয়া নিজ হইতে প্রত্যহ চারি আনা মূল্যের ভোগের বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

নবাব দরবারে রাজনগররাজের যে কর বাকি পড়িয়াছিল তাহার কিয়দংশ বা সম্পূর্ণরূপ নবাব সরকার হইতে মাপ করাইয়া দিবার জন্য তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন; এবং রামনাথের সুপারিশে রাজা সাহেব রাজকর হইতে অব্যাহতি পাইলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মহাত্মা রামনাথকে কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ লক্ষ টাকা পুরস্কার দিতে উদ্যত হন, কিন্তু বিচক্ষণ ধর্ম্মপরায়ণ রামনাথের হৃদয়-ক্ষেত্রে তখনও গোপালদেবের ও বিভাণ্ডীশ্বর শিবের দুরবস্থার স্মৃতি সমুজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত; তিনি ঐ অর্থ গ্রহণ না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে রাজনগরের রাজমাতার নামে হুকুমাপুর লাট ১৮৮নং তৌজী মধ্যে ভাণ্ডীরবন, বীরসিংহপুর, আড়াইপুর ও রাইপুর এই চারিখানি মৌজা পুরস্কার-স্বরূপ প্রার্থনা করেন। রাজা সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে তাহাই লাখেরাজ উল্লেখে প্রদান করেন। মহাত্মা ভাদুড়ী ঐ সম্পত্তি গোপালজীউএর নামে উৎসর্গীকৃত করিলেন এবং উক্ত সম্পত্তির লভ্য হইতে যাহাতে গোপালজীউ, বিভাণ্ডীশ্বর মহাদেব ও বীরসিংহপুরের কালিকার সেবা-পূজা ও ভোগাদির ব্যয়নির্ব্বাহ হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করিলেন। এই সময় তিনি ঘোষাল বংশের সহিত গোপালজীউকে এস্থানে আনয়ন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন ও মুর্শিদাবাদ হইতে কারিকর আনাইয়া ৺গোপালদেব এবং বিভাণ্ডীশ্বর শিবের সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

এই দেব-দ্বিজ-ভক্ত ভাদুড়ী মহাশয়ের শুভাগমনে এ অঞ্চলের ভাগ্য-গগনে সৌভাগ্য-রবি সমুদ্ভাসিত হইল। এই ধর্ম্মপ্রাণ রাজকর্ম্মচারী কালের বিধ্বংসি-হস্তে বিলয়োন্মুখ, দারিদ্র্য ও দুরবস্থার ভীষণ তাড়নে লাঞ্ছিত, বিগতপ্রভাব দেবতাগণের সমুদ্ধার করিয়া যে স্বকীয় সমুন্নত নিঃস্বার্থ-হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অতুলনীয় অভিনব ব্যাপার।

মহাত্মা ভাদুড়ীর সময় হইতেই ঘোষালবংশীয়গণ ভাণ্ডীরবনে বর্ত্তমান থাকিয়া গোপালজীউর সেবাদি কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। মহাত্মার এই

অলৌকিক অপার্থিব মহদনুষ্ঠানের জন্য এতদঞ্চলবাসী সকলেই অতীব কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার যশোগান করিয়া থাকে ; এবং তাঁহার স্মৃতি-গৌরব-রক্ষণ-মানসে এ স্থানে দোলযাত্রা, গোষ্ঠযাত্রা, রথযাত্রা, জন্মযাত্রা প্রভৃতি প্রত্যেক উৎসবেই তাঁহারই নামে সঙ্কল্প হয়।

গোষ্ঠযাত্রা, জন্মযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি উৎসবোপলক্ষে এস্থানে বহু লোকের সমাগম হয়। সিহুড়ি ও অন্যান্য স্থান হইতে আগত বহুল বিপণীশ্রেণী এ স্থানের আনন্দ, উৎসাহ ও সমারোহ সমধিক বর্দ্ধিত করে।

শ্রীশ্রীগোপাল দেবের মন্দিরের বিবরণ

গোপাল-মন্দিরের প্রবেশদ্বার পূর্ব্বমুখী, সম্মুখে সুন্দর নহবৎখানা। প্রতিদিন ঊষাকালে ও সন্ধ্যা-সমাগমে মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতলহরী ও তানলয়-বিশুদ্ধ সুমধুর স্বর্গীয়বাদ্য এ স্থান হইতে উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত ও মুখরিত করে এবং শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে এক বিমল ভক্তি ও অপূর্ব্ব ঈশ্বরপ্রেম ঢালিয়া দেয়। মন্দিরে মনোহর কারুকার্য্য-বিভূষিত স্তম্ভপরিবেষ্টিত সুন্দর নাটমন্দির। মন্দিরাভ্যন্তরে গোপালজীউ এর মণিময়মূর্ত্তি, গোপালের দারুবিগ্রহ দীর্ঘে ১।০ পোয়া পরিমিত। ইঁহার বামদেশ সুশোভিত করিয়া আদ্যাশক্তি প্রেমময়ী রাধাসুন্দরী বিরাজমানা নাই। ত্রিভঙ্গিমঠাম দ্বিভুজ মুরলীধর গোপালদেবের চারুমূর্ত্তি-দর্শনে অতি পাষণ্ডের প্রাণেও ভক্তি ও প্রেমের উদ্রেক হয়।

গোপালজীউর অদ্ভুত মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। মহাত্মা রামনাথ ভাদুড়ী গোপালদেবের স্বপ্নাদেশ-প্রণোদিত হইয়া যে মন্দিরনির্ম্মাণাদি মহদনুষ্ঠান সাধন করিয়াছেন, তাহা এ অঞ্চলের লোকমুখে শুনা যায়।

গোপালের মাহাত্ম্য-দর্শনে তাঁহার মনোমোহনমূর্ত্তি দর্শন করিতে নানা স্থান হইতে বহুতর যাত্রী এ স্থানে আগমন করে ও অত্রত্য অপূর্ব্ব নৈসর্গিক শোভা ও পবিত্র প্রশান্ত-ভাব দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হয়, ভক্তি ও প্রেমরসে আপ্লুত হইয়া যায়। গোপাল-মন্দিরে অতিথি-অভ্যাগত প্রভৃতির সৎকারের ব্যবস্থা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ছিল ; কিন্তু কালপ্রভাবে তাহা বিনষ্ট হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বের ন্যায় আর সে সুবন্দোবস্ত নাই।

গ্রামের ঠিক পশ্চিম প্রান্তে এবং গোপাল-মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ৩০।৪০ হস্ত দূরে দেবাদিদেব মহাদেবের উত্তুঙ্গ মন্দির যেন ধর্ম্মের পবিত্র

জ্যোতিঃ বিকাশ করিয়া অতীতের গৌরব স্মৃতি মাথায় (১) করিয়া সুনীল গগন চুম্বনে প্রয়াসী হইয়াছে। পূর্ব্বে মহাত্মা বিভাণ্ডকমুনি এই স্থানে আশ্রম স্থাপন করায় তাঁহারই নামানুসারে অত্রত্য মহাদেব বিভাণ্ডীশ্বর (২) নামে অভিহিত হইয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, বিভাণ্ডক মুনির আশ্রমেরই উপরে শিবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। বিভাণ্ডীশ্বরের মন্দির এবং তাহার বিবরণ

মন্দিরের সম্মুখেই একটী উচ্চ তিন্তিড়ী বৃক্ষ অতি প্রাচীনকাল হইতে সর্ব্ব-বিধ্বংসী কালের অমিত-প্রভাব রোধ করিয়া তাহাকে তীব্র উপহাসে জর্জ্জরিত করিয়াই যেন অদ্যাপি সগৌরবে বিরাজমান। এই বৃক্ষমূলে সন্তাপহারী ভৈরব-নাথ ঠাকুরের পবিত্র আশ্রম বিরাজিত, সেই জন্য এতদঞ্চলের অধিবাসিগণ এই স্থানটীকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করেন। অদ্যাপি এ স্থানে ভৈরব-নাথের খেচরান্নের ভোগ হয়।

গোপাল-মন্দিরের উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটী ও শিব-মন্দিরের উত্তরে একটী; এই তিনটী কুণ্ড অদ্যাপি অতীতের ক্ষীণস্মৃতি বক্ষে করিয়া হীনাবস্থায় বিরাজমান। (৩) মন্দিরদ্বয়-সন্নিকটস্থ কুণ্ড

বিভাণ্ডীশ্বর পশ্চিম-লিঙ্গ। এ অঞ্চলে পশ্চিমলিঙ্গ শিব অতি বিরল। বিগ্রহের চতুর্দ্দিক্ পিত্তল-ধাতু দ্বারা আবৃত।

চৌধুরীবংশীয় পাণ্ডাগণ মহাদেবের সেবাকার্য্যে ব্রতী আছেন। এ স্থানেও পায়সান্নের ভোগ হয়, আর পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ইঁহার সেবার যাবতীয় খরচ গোপালজীউএর সম্পত্তি হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। মন্দির পূর্ব্বমুখী। মনোহর লতা-গুল্মাদি এই স্থানটীকে অতীব মনোহর ও প্রীতি-প্রদ করিয়া তুলিয়াছে। মন্দির-প্রবেশ দ্বারের উপরিভাগে খোদিত নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী নিঃস্বার্থ কর্ম্মবীর দেব-হিত-ব্রতে দীক্ষিত মহাত্মা ভাদুড়ীর অমরত্ব অদ্যাপি বিঘোষিত করিতেছে :—

রসাব্ধিষোড়শশকে সংখ্যকে শাস্ত্রসম্মতে
রামনাথদ্বিজঃ কশ্চিৎ ভাদুড়ীকুলসম্ভবঃ।

(১) এই শিবমন্দির উচ্চে প্রায় ১৫০ ফুট হইবে।

(২) এই শিবলিঙ্গ বিভাণ্ডকমুনি কর্ত্তৃক স্থাপিত অথবা ইনি অনাদিলিঙ্গ তাহা নিঃসংশয়িত-রূপে জানিবার উপায় নাই।

(৩) এই সকল কুণ্ড পুরাকালে ইষ্টক দ্বারা সুন্দরভাবে বাঁধান ছিল। এক্ষণে ঐ সকল কুণ্ড অতি উপেক্ষিতভাবে জীর্ণাবস্থাগ্রস্ত।

ভাণ্ডীশ্বরং শিবং দৃষ্ট্বা একান্তভক্তিসংযুতঃ
তৎপ্রীত্যর্থে বিনির্ম্মায় ইষ্টকময়মন্দিরং ॥
বিচিত্রং রচিতং রম্যং রজতাভং পরিস্কৃতং
দদৌ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে
যাচতে তৎপদে ভক্তিং মুক্তিং বা দেহি শঙ্কর।

এই শ্লোকের প্রথম পংক্তি হইতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এই বিভাণ্ডীশ্বর-মন্দির ১৬৭৬ শকাব্দে বা ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। এই খোদিত শ্লোক-পাঠে আমাদের মনোমধ্যে স্বতঃই এক অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

মহাত্মা ভাদুড়ীর এই অনিত্য নশ্বর-দেহের পতন হইলেও তাঁহার যশঃ-শরীরের কখনও পতন হইবে না; তাহা অবিনশ্বর ও কল্পান্তস্থায়ী। তিনি স্বকীয় দেবতুল্য গুণরাশির দ্বারা মানবহৃদয়ে যেরূপ গভীর ভাবে স্বীয় মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা কখনই অপসৃত হইবে না। যতদিন কিছুমাত্র ধর্ম্মের জ্যোতিতে ভারত সমুদ্ভাসিত থাকিবে, ততদিন মহাত্মা ভাদুড়ীর কীর্ত্তি বিঘোষিত হইয়া "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এই মহাজন-বাক্যের পোষকতা সাধন করিবে।

এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, মহাতপা বিভাণ্ডক মুনি এই প্রকৃতির রম্য লীলা-নিকেতন সুশান্ত তপোবনোপম ভাণ্ডীরবনে আশ্রম-স্থাপন ও অমৃত-নিস্যন্দী ঋগ্বেদস্তোত্রগানে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করেন। বিভাণ্ডক কঠোর তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া এই ভাণ্ডীরবনের যোগাশ্রমেই ঋগ্বেদের ১০২৪ শ্লোক রচনা করেন, তাঁহারই নামানুসারে এ স্থানটী বিভাণ্ডকবন নামে অভিহিত হইত। কালক্রমে ইহা "ভাণ্ডীরবন" এই অপভ্রংশে পরিণত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, বৃন্দাবনের সন্নিকটস্থ ভাণ্ডীরবন নামক স্থানের অনুকরণেই এই ক্ষুদ্র পল্লীর নামকরণ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই ভাণ্ডীরবনের চতুর্দ্দিক্ নানা তরুরাজিসমাচ্ছন্ন ও লতাগুল্মাদিবেষ্টিত দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় ইহা একদিন ত্রিকালজ্ঞ নির্জ্জনতাপ্রিয় ঋষিগণের মনোরম তপোবনাশ্রম ছিল এবং এতদ্দর্শনে এতদঞ্চলের যে সদা-প্রচলিত জনশ্রুতি বিভাণ্ডক মুনির এস্থানে আশ্রমস্থাপন ঘোষণা করিতেছে, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

আর এক কথা ভাণ্ডীরবনের ব্যুৎপত্ত্যর্থ বটবন, কিন্তু এস্থানে বট-

বৃক্ষের বিশেষ প্রাদুর্ভাব না থাকিয়া গভীর শালবনেরই প্রাদুর্ভাব থাকায় ইহা যে বট বা ভাণ্ডীরবন এই নামের অনুকরণে ভাণ্ডীরবন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। এই সকল অনুমান ত্যাগ করিলেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুসন্ধানে এই জানা যায় যে, অত্রস্থ মহাদেব যখন "বিভাণ্ডীশ্বর" এই নামে অভিহিত হইয়াছেন, তখন বিভাণ্ডক নামক কোন মহাত্মার নামেই তাঁহার নামকরণ হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। আরও এতদঞ্চলের দৃঢ়-ভিত্তিমূলক জনশ্রুতিও যখন এই বাক্যের সমর্থন করিতেছে, তখন বিভাণ্ডক মুনিই যে এ স্থানে আশ্রম স্থাপন করেন সে বিষয়ে আমরা বিশেষ দৃঢ়মত হইয়াছি এবং তজ্জন্যই ইহা যে ভাণ্ডীর বা বটবনের অনুকরণে "ভাণ্ডীরবন" নাম প্রাপ্ত না হইয়া বিভাণ্ডকমুনির নামানুসারেই বিভাণ্ডকবন আখ্যা পাইয়াছে, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত এবং কালক্রমে যে বিভাণ্ডকবন নামান্তরিত হইয়া "ভাণ্ডীরবন" এই নামে পরিণত হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। 'ভাণ্ডীরবন' নামের উৎপত্তি

"বিভাণ্ডক-বন" এই নাম হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, পুরাকালে এই স্থান ভীষণ জঙ্গলে পরিণত ছিল; স্থানীয় জনপ্রবাদ ও হাণ্টার-লিখিত পুস্তকও এতদ্বাক্যের পোষকতা-সাধন করিয়া থাকে এবং এখনও ইহার চতুর্দ্দিকে শালবন দৃষ্ট হয়, এতদ্দ্বারাও স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এককালে ঐ বন বিভাণ্ডকবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জনপ্রবাদ এই যে, বিভাণ্ডক মুনির তিরোধানের পর মহাদেবের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়ে, তখন এই গ্রামের অদূরে বীরপুর নামক এক ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, উক্ত গ্রামনিবাসী বর্ত্তমান পাণ্ডাগণের কোন পূর্ব্বপুরুষ আসিয়া সামান্যভাবে নিয়ম রক্ষা করিয়া মহাদেবের পূজা করিয়া যাইতেন। তৎপরে যখন মহাত্মা রামনাথ ভাদুড়ী শিবের মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া ভোগাদির সুবন্দোবস্ত করেন, সেই সময় তিনি এই বিভাণ্ডক বনের বৃক্ষাদি কাটিয়া বীরপুর গ্রাম হইতে পাণ্ডাদিগকে আনয়ন করাইয়া এস্থানে বসবাস করান (১) এবং ঐ সময়েই অন্যান্য গ্রাম হইতে আগত অনেক লোকও এ স্থানে বসতি বিস্তার করে। তৎপরে এই মহাত্মা এই গ্রামের

(১) বীরপুর গ্রাম ভাণ্ডীরবনের অনতিদূরে অবস্থিত, তাহা এক্ষণে কর্ষিত ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। আমাদের অনুমান এই যে, এই গ্রাম ভাঙ্গিয়া সমস্ত লোক ভাণ্ডীরবনে উঠিয়া আসিয়া বাস করিয়াছে, বলিয়াই এই গ্রামের এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে।

প্রায় দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত নোয়াডিহি গ্রাম হইতে গোপালজীউএর সহিত ঘোষালবংশীয় ব্রাহ্মণগণকে এ স্থানে আনয়ন করেন। এইরূপে এই গ্রামের বসতিবিস্তার ও গঠন সম্পাদিত হইয়াছে।

এক্ষণে আমাদিগকে মীমাংসা করিতে হইবে, কোন্ সময়ে ভাণ্ডীরবন স্থাপিত হয়?

গ্রাম-গঠনের সময় নিরূপণ

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মহাত্মা ভাদুড়ীর সময়েই এই গ্রামের প্রতিষ্ঠা; শিবমন্দির-গাত্রে ক্ষোদিত শ্লোক হইতে জানা যায় যে, তিনি বিভাণ্ডীশ্বর মন্দির ১৬৭৬ শকাব্দ বা ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত করেন, সুতরাং এই সময়েই অর্থাৎ ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই যে এই গ্রাম গঠিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

আমরা ভাণ্ডীরবন হইতে যাহা কিছু অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইলাম। এক্ষণে আমরা এই গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

গ্রামের আধুনিক

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, চৌধুরীবংশীয় পাণ্ডাগণের এস্থানে আদিবাস। ইঁহাদের পরেই ঘোষালবংশীয় ব্রাহ্মণগণ এস্থানে আসিয়া বাস করেন। বর্ত্তমান সময়ে এই গ্রামে গোপালপুরের পুরোহিত ব্রাহ্মণ চারিঘর, তন্তুবায় ৩২ ঘর ও অন্যান্য নীচ জাতি প্রায় ৩০ ঘর সর্ব্বসমেত ৭০।৭২ ঘর লোকের বসতি।

এ স্থানে অতি সুন্দর তসরের বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে ও ফসলের উত্তমরূপ চাষ হইয়া থাকে। স্থানীয় স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট, গ্রামের কাহারও রোগাদি হইলে সিহুড়ী হইতে ডাক্তার আনাইতে হয়। গ্রামের বহুদূরে আমজোড়া ও সিহুড়ীতে পোষ্টাফিস থাকায় তত্রত্য অধিবাসিগণকে এ বিষয়ে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

এ স্থানে সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত একটী উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপিত। বিদ্যালয়ের অধ্যাপনাদি অতি উত্তম; প্রায় প্রতিবৎসর একটী করিয়া ছাত্র বৃত্তি পাইয়া থাকে।

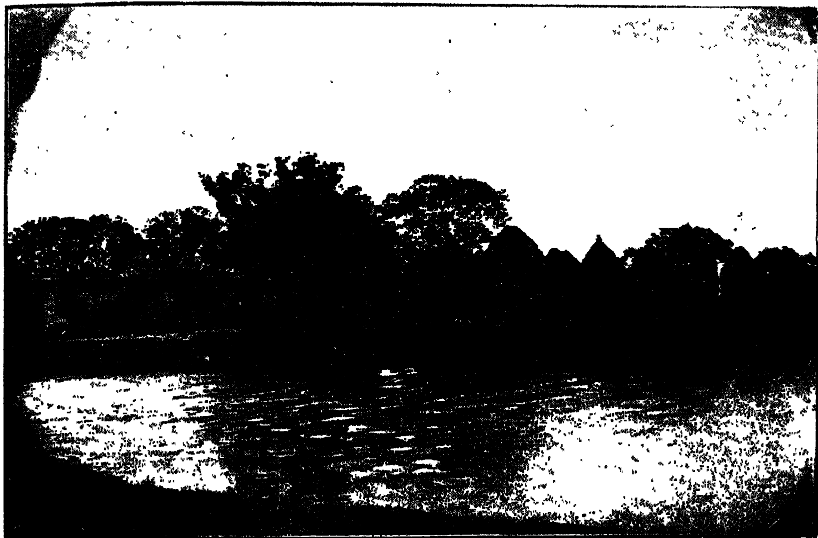
এ স্থানের জমিদার কেহই নাই। এ স্থানের অর্থাৎ ভাণ্ডীরবন, বীরসিংহপুর, আড়াইপুর ও রাইপুর এই চারিখানি মৌজার গোপালজীউই জমিদারের স্থলাভিষিক্ত এবং ইহাদের করাদি গোপালজীউই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।(১)

(১) ৺গোপালজীউএর জমিদারী কাগজ পত্রে যে মোহর ব্যবহৃত হয় তাহা অতি প্রাচীন।

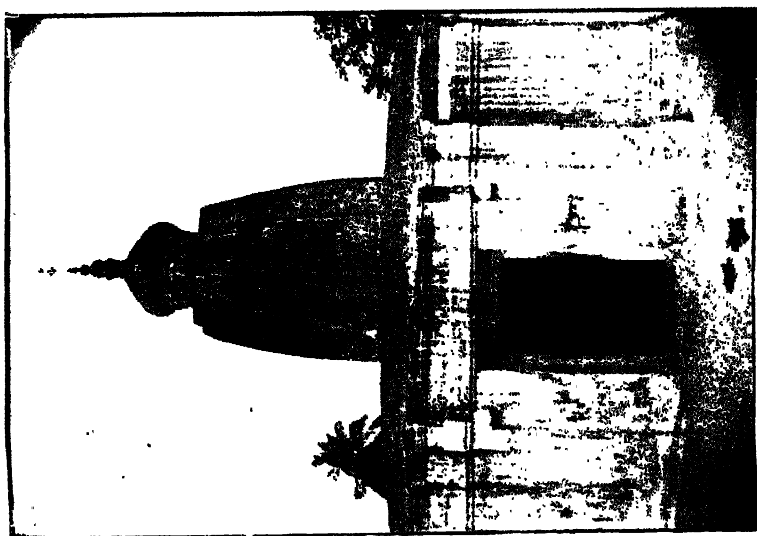
হুকুমাপুর লাট রাজনগরাধিপতির হস্ত-স্খলিত হইলে বর্দ্ধমানাধিপতি উক্ত লাট ক্রয় করিয়া লন। এই ভাণ্ডীরবন গ্রামটী হুকুমাপুরের অন্তর্গত দেবোত্তর মহাল বলিয়াই হুকুমাপুরের যিনি যখন জমিদার নিযুক্ত হয়েন তখন তাঁহাকেই এই দেবসেবার তত্ত্বাবধান করিতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে বর্দ্ধমানাধিপতি এই গ্রামের তত্ত্বাবধায়ক।

গ্রামবাসিগণ অত্যন্ত সুখে ও শান্তিতে বাস করে। এ স্থানে অত্যাচার-উপদ্রব দ্বেষ-হিংসা দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রামবাসী সকলেই বিশেষ ভদ্র, অমায়িক, বিনয়ী, সদাচারী ও ধর্ম্মপরায়ণ। পরস্পর পরস্পরের দুঃখে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করে। অপরিচিত অভ্যাগত বিদেশীকেও ইহারা বিশেষ শ্রদ্ধা ও সমাদর করিয়া থাকেন। সুমুধুর হরিনাম-সংকীর্ত্তনে গ্রামটী প্রত্যহ মুখরিত হয়। সন্ধ্যা-সমাগমে সেই মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে ভক্তমুখ-নিঃসৃত আবেগ-ভক্তিমাখা সুমধুর হরিনাম-ধ্বনি এ স্থানে ত্রিদিবধামের বিমলতা ও অপূর্ব্ব ভাব আনিয়া দেয়। বাস্তবিক এ স্থানের শান্তভাব ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যদর্শনে দর্শকবৃন্দ হৃষ্ট ও পুলকিত হন।

বীরভূমের সেই পূর্ব্ব-গৌরব আর নাই। বীর-কবি-ভক্ত-সেবিত বীরভূমের অপার্থিব গৌরব এক্ষণে অনন্ত-কালসাগরে বিলীন। বীরভূম একদা দেবতা-গণের অদ্ভুত মর্ত্ত্যলীলার অপূর্ব্ব নিকেতন ছিল। দুঃখের বিষয়, সেই রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী অধুনা দুঃখময় প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। ভাণ্ডীরবনও একদা দেবতা-গণের অদ্ভুত লীলা-নিকেতন ছিল; প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসিগণের পবিত্র আশ্রম ছিল। কিন্তু হায়! সর্ব্ব-বিধ্বংসী কালের অদম্য-প্রভাবে ইহার অতীত গৌরব কাহিনী বিলুপ্তপ্রায়।



বক্রেশ্বর—পাপহরা নদী।
(উত্তর তটে শিবমন্দিরাদি দক্ষিণে শ্মশান)



বক্রেশ্বর — শ্রীশ্রী৺বক্রনাথের মন্দির।

বক্রেশ্বর-কাহিনী

বক্রেশ্বরের বর্ত্তমান অবস্থিতি

প্রকৃতির ক্রীড়াস্থল বীরভূমির উপর কত শতাব্দী কত যুগ-যুগান্তর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তথাপি সেই বীরভূমি অদ্যাপিও প্রকৃতির অতিপ্রিয় নিত্যলীলা-ক্ষেত্ররূপে বিরাজমানা। সুপ্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ বক্রেশ্বর সাধারণের নিকট সুপরিচিত; স্বাভাবিক এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত দৃশ্যাবলীর একত্র সমাবেশে স্থানটী অতীব মনোরম; এজন্য সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্নজাতীয় নরনারীগণ বক্রেশ্বর দর্শনার্থ আগমন করিয়া থাকেন। বিশ্বেশ্বরপুরী বারাণসী যেরূপ বরণা এবং অসী নাম্নী নদী দ্বারা পরিবেষ্টিতা হইয়া পাপ-পঙ্কিল পৃথিবী হইতে পৃথক্‌ভাবে মুক্তিক্ষেত্ররূপে বিরাজ করিতেছে, বক্রেশ্বর ক্ষেত্রও সেইরূপ দুইটি স্বচ্ছসলিলা তরঙ্গিনী দ্বারা উত্তরপূর্ব্ব এবং দক্ষিণ দিকে পরিখাবেষ্টিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যেন উভয়স্থানেই দেবাদিদেব স্বাধিষ্ঠিত পুণ্যভূমির কলিকলুষময় কালরাজ্যের সহিত সীমা-নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সত্য বটে, বিপুলায়তনা বারাণসী নগরী সুদৃশ্য-সৌধাবলী এবং বিবিধ পণ্য-বীথিকা, কারুকার্য্য-খচিত অগণ্য দেবালয় ও চত্বরাদি দ্বারা পরিশোভিত হইয়া মহেশ্বর-রাজধানীর মহিমা এবং গৌরব ঘোষণা করিতেছে এবং তাহার সহস্রাংশের সহিতও তুলনায় বক্রেশ্বর-ক্ষেত্র নিম্নতম স্থানে অবস্থিত অথবা সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য, তত্রাচ এ স্থানে যে সকল স্বাভাবিক দর্শনীয় বিষয় আছে তাহা একবারে উপেক্ষণীয় নহে। এটী যেন মহিমাময় মহেশ্বরের নির্জ্জনাবাস; প্রভু যোগেশ্বর যেন এখানে নির্জ্জনতার সহিত বৈরাগ্য ও যোগসুখ উপভোগ করিতেছেন। প্রকৃতির নিভৃতাস্তরালে অবস্থিত বলিয়া এই বক্রেশ্বর ক্ষেত্র "গুহ্যতীর্থ" (১) অথবা "গুপ্তকাশী" বলিয়া পুরাণে কথিত হইয়াছে।

এই তীর্থক্ষেত্রের পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে বক্রেশ্বর নদ ধীরগতিতে প্রবাহিত হইতেছে; দক্ষিণাংশে পাপহরা নদী; তথায় নিত্য শব-সৎকার হইয়া থাকে। চতুর্দ্দিকস্থ প্রায় আট দশ মাইল দূরবর্ত্তী গ্রাম ও নগর হইতে মৃতদেহ এখানে সৎকারার্থ আনীত হয়। পাপহরা যেন মহাকালের অনির্ব্বাণ-চিতায় জীবদেহ-

(১) *** 'গুহ্যতীর্থং পরং মহৎ'—বক্রেশ্বরমাহাত্ম্যম্, প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

লয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া জীবজগতে নশ্বরতা ও বিবেক-বৈরাগ্যের উপদেশ প্রদান করিতেছে। নদীর পশ্চিমতীরে অর্থাৎ বক্রেশ্বর-ক্ষেত্রের অব্যবহিত পূর্ব্বাংশে একটী বিরল-পাদপ বনভূমি; বনের পশ্চিমাংশে বহুসংখ্যক শিবালয়-পরিবেষ্টিত বক্রেশ্বরদেবের উন্নত মন্দির। মন্দিরের দক্ষিণদিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ৮টী যোগকুণ্ড; এই কুণ্ডগুলি হইতে উষ্ণজল বুদ্‌বুদাকারে অবিরত প্রসৃত হইয়া পাপহরা নদীর সহিত মিলিত হইতেছে। মন্দির-প্রাঙ্গণেও শ্বেতগঙ্গা নামে একটী জলকুণ্ড আছে। এতদ্ভিন্ন জীবকুণ্ড নামক আর একটী যোগকুণ্ড আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেটীর জল শীতল। উষ্ণকুণ্ডের অব্যবহিত পার্শ্ববর্ত্তী কুণ্ডের জল কি জন্য শীতল তাহার কারণ নির্দ্দেশ ভগবদ্ভক্তের পক্ষে অতীব সহজ, কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্‌গণের পক্ষে বিষম সমস্যার বিষয়। যোগকুণ্ড এবং বক্রেশ্বরদেবের অন্যান্য বহুসংখ্যক শিবালয় বক্রেশ্বর মন্দিরের চতুর্দ্দিকে শ্রেণী-বদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। স্থানে স্থানে মন্দিরবিহীন অনেক শিবলিঙ্গও বিদ্যমান রহিয়াছেন।

শ্বেতগঙ্গা কুণ্ডের উত্তরপূর্ব্বকোণে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের (১) চারিদিকে কতিপয় বিকলাঙ্গ প্রস্তরময় দেবমূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। দাঁইহাটনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি এই পুণ্যক্ষেত্রে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দুইটী শিবলিঙ্গ এবং একটী কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি তথায় মহামায়ার নিত্যসেবা এবং অতিথি-সেবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই তীর্থক্ষেত্র ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীর অণ্ডাল-সাঁইথিয়া কর্ড-লাইনের দুবরাজপুর ষ্টেশন হইতে ছয় মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং সিউড়ি ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তের মাইল ব্যবধানে অবস্থিত; উভয় স্থান হইতেই যাত্রিগণের সুবিধার জন্য সদাশয় গবর্ণমেণ্ট সুপ্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। প্রতি বৎসর শিব-চতুর্দ্দশীর সময়ে এখানে সপ্তাহাধিককাল ব্যাপিয়া মহামেলা বসিয়া থাকে। সে সময়ে বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে যাত্রিগণ ও সাধু-

(১) এই বৃক্ষটী "অক্ষয়বটবৃক্ষ" বলিয়া কথিত হয়। অতিশয় স্থূল হওয়ায় ইহার প্ররোহ ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করায় তলস্থ সমস্ত বস্তুই মূল মধ্যে নিহিত করিয়াছে। এই জন্য কামধেনু, শ্রীমাধব, বৃষ, এবং পুরাণোক্ত অন্যান্য মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন সময়ে এই পবিত্র ক্ষেত্রে আসিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন তাঁহার চরণ-চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। একটী ষষ্ঠীমাতার ও কালীমাতার বেদীও এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

সন্ন্যাসিগণ বক্রেশ্বর দর্শন এবং কুণ্ডস্নান জন্য আগমন করিয়া থাকেন। মহামান্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যথাসম্ভব যাত্রিগণের সুখস্বচ্ছন্দতার এবং মেলার শান্তিরক্ষার বিধান ও সুব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ত্রৈলোক্যাধিপ বক্রেশ্বরাধিষ্ঠিত পবিত্র গ্রাম দুইভাগে বিভক্ত—বক্রেশ্বর ও ডিহি বক্রেশ্বর। এখানে অনেক ব্রাহ্মণের বাস। তাঁহাদের অধিকাংশই বক্রনাথের সেবা ও পাণ্ডাগিরি করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন। ইহা ব্যতীত এ গ্রামে অন্যান্য জাতিরও বাস আছে।

এই পবিত্র ক্ষেত্রের অবস্থিতি সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত স্বয়ম্ভু সংবাদে উক্ত হইয়াছে যে, এই পরম পবিত্র বক্রেশ্বরাখ্য তীর্থক্ষেত্র গৌড়দেশে অবস্থিত। এক দিকে পাপহরা, অন্যদিকে জাহ্নবীবেষ্টিত হইয়া—বিশেষতঃ পুণ্যপাদ বক্রেশ্বর ক্ষেত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া এই গৌড়দেশ পুণ্যের আধার হইয়াছে। এই গৌড়দেশবাসী প্রজাগণ সর্ব্বগুণবান্, ধর্ম্মশীল, কুবেরসদৃশ ধনী, পরাক্রমশালী এবং সত্যবাদী। এই স্থানে প্রভূত কুলীন ও লব্ধবর্ণ প্রভৃতি আছে।(১)

পুরাণ-বর্ণিত ক্ষেত্রের অবস্থিতি

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ক্ষেত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, অযোনিসম্ভবা লক্ষ্মীদেবীর স্বয়ম্বর-সময়ে বৈকুণ্ঠে এক বিচিত্র সভা রচিত হইয়াছিল (২), তথায় দেববৃন্দ-পরিবৃত দেবরাজ পুরন্দর সশিষ্য মুনিগণ এবং অপ্সর-কিন্নর প্রভৃতি শুভাগমনপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠের বিপুল শোভা বৃদ্ধি করেন। আমন্ত্রিত মহোদয়গণের অভ্যর্থনার ভার দেবেন্দ্রের উপর অর্পিত হয়। ক্রমে মুনিশ্রেষ্ঠ

ক্ষেত্রের উৎপত্তি

(১) "গৌড়দেশে মহৎ ক্ষেত্রং বক্রেশ্বরং সুসঙ্গতং।
যন্নাম স্মরণেনাপি মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ।
একয়া পাপহারিণ্যা জাহ্নব্যাচ বিশেষতঃ।
বক্রেশ্বরেণ ক্ষেত্রেণ পুণ্যো গৌড় প্রকীর্ত্তিতঃ।
গৌড়দেশস্য স্বভাববর্ণনং।—
নানাগুণসমাকীর্ণাঃ যত্র সর্ব্বে প্রজাগণাঃ।
নানা পুণ্যগণোপেতা ধনিনো ধনদোপমাঃ।
বহবো লব্ধবর্ণাশ্চ কুলীনা বহবস্তথা।
পরাক্রমযুতাঃ শূরা গৌড়দেশনিবাসিনঃ।"
(বক্রেশ্বরমাহাত্ম্যম্ প্রথমোঽধ্যায়ঃ।)

(২) "পুরা দেবসভায়াস্তং নৃত্যমভুন্মনোহরম্।
লক্ষ্মীস্বয়ম্বরে পুণ্যে ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যসংযুতে॥
তত্র দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বা মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ।
সমাজগ্মুঃ পরং দ্রষ্টুং কমলায়া স্বয়ম্বরং॥

লোমশ ও সুব্রত সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ পাদ্যার্ঘ দ্বারা অগ্রে লোমশ মুনির অভ্যর্থনা করিলে সুব্রত অপমান বোধ করিয়া ক্রোধ-কষায়িত-লোচনে ইন্দ্রকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ চৈতন্যোদয় হওয়াতে তিনি তপোভঙ্গ-ভয়ে শাপপ্রদানে নিরস্ত হইলেন। যদিও তিনি সঞ্জাত-ক্রোধকে প্রশমিত করিয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন বটে, তত্রাচ ক্রোধাতিশয্য-হেতু তাঁহার দেহ অষ্ট অংশে বক্র হইয়া গেল। সেই অবধি সুব্রত মুনি "অষ্টাবক্র" নামে জগতে বিদিত হইলেন। (১) তিনি লজ্জায় অনুতপ্ত হইয়া সভাস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক আর আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া তীর্থপর্যটনে বহির্গত হইলেন। কথিত আছে যে তিনি নানা বন, উপবন, মহাপীঠ, উপপীঠ ও তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া প্রথমে বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ঝাঝরা গ্রামে উপনীত হন ও তাহার পশ্চিম প্রান্তভাগে শ্যামামূর্ত্তি স্থাপন করিয়া কঠোর তপে নিযুক্ত হইলেন।

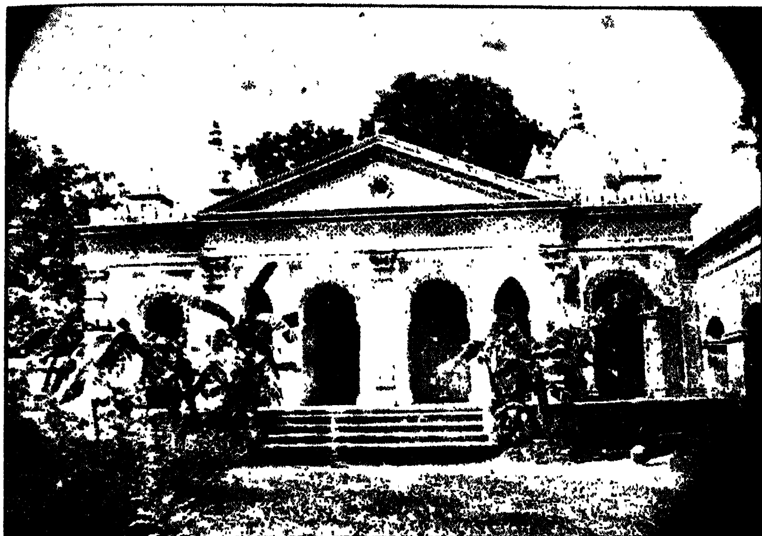
তপঃপ্রভাবে সেই স্থানে একটি কুণ্ড আবির্ভূত হয় ও তাহা হইতে ভোগবতীর পবিত্র সলিল উত্থিত হয় (২)। কিন্তু অষ্টাবক্র তথায় সিদ্ধি লাভ করিতে

তত্রামরেশ্বরো দেবঃ শচীনাথঃ পুরন্দরঃ।
অগ্রে দদ্যাৎ লোমশায় পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়কম্॥
লোমশঞ্চ মহাত্মানঃ দৃষ্ট্বা চ ভগবন্মুনিং।
সুব্রতেন সশাপেন্দ্রং তপোভঙ্গভয়ান্মুনিঃ॥
মহাকোপেন চাষ্টাঙ্গে বক্রত্বমগমন্মুনেঃ।
অষ্টাবক্রাভিধেয়ত্বং ততঃ প্রাপ দ্বিজোত্তমঃ॥"

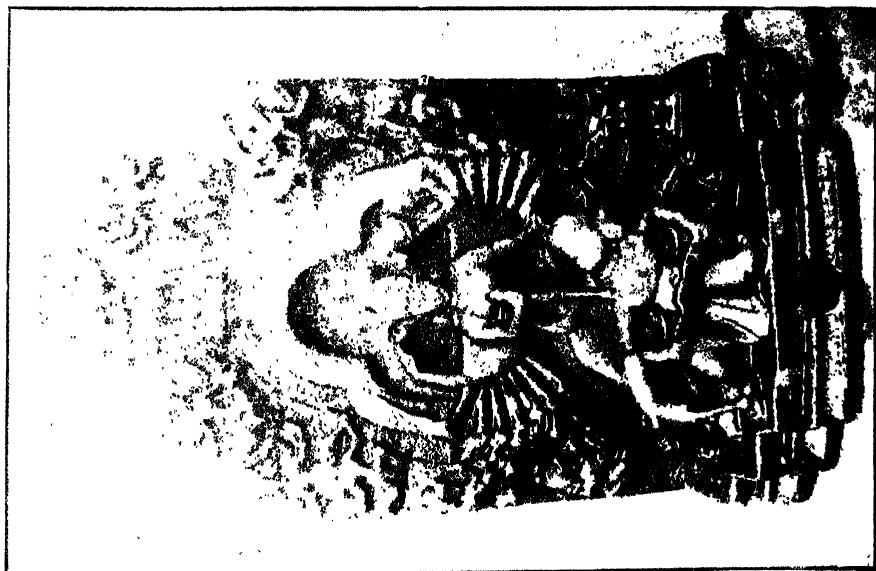
(বক্রেশ্বরমাহাত্ম্যং দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।)

(১) বিশ্বকোষ-প্রণেতা নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন অষ্টাবক্র সুমতির গর্ভে ও কাহোড়ের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। উদ্দালকের কাছে কাহোড় শাস্ত্রাদি পাঠ করিতেন। উদ্দালক শিষ্যের সেবা শুশ্রূষায় তুষ্ট হইয়া তাহার সঙ্গে আপন কন্যা সুমতির বিবাহ দিলেন। সুমতির অপর নাম সুজাতা। কিছুকাল পরে সুমতি গর্ভবতী হইলেন। একদিন কাহোড় পত্নীর কাছে বসিয়া বেদ পাঠ করিতেছেন ; বেদাধ্যয়ন করিবার সময় স্থানে স্থানে তাঁহার ভ্রম হইতে লাগিল। সুমতির গর্ভস্থ সন্তান পিতার সেই সকল ভ্রম সংশোধন করিয়া দিল। ইহাতে কাহোড় ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "এখনও তুমি ভূমিষ্ঠ হও নাই। গর্ভে থাকিয়াই তোমার স্বভাব এত বক্র, অতএব তুমি অষ্টাবক্র হইয়া জন্ম লইবে।"—বিশ্বকোষ,—অষ্টাবক্র—৬৫৩ পৃঃ।

(২) ঐ জলরাশিই স্রোতের আকারে উত্তরবাহী ধারায় প্রবাহিত হইয়া কিয়দ্দূর গিয়া পরে পূর্ব্বাভিমুখে অজয়নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, উক্ত কুণ্ড মধ্যে সুদীর্ঘ কামিনী কেশ অদ্যাপিও পাওয়া যায়।



বক্রেশ্বরের—কালীবাড়ী



বক্রেশ্বরের অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দ্দিনী

না পারিয়া অবশেষে বক্রেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রাণ-মন মুগ্ধ হইয়া গেল; তিনি দেখিলেন যে, স্থানটী বিবিধ বনস্পতিসমূহে পরিশোভিত এবং স্নিগ্ধ, শান্তি ও নির্জ্জনতার আধার হেতু সাধনার সম্পূর্ণ উপযোগী। সুব্রত তথায় আশ্রম স্থাপন করিলেন।

[সুব্রতের সিদ্ধি-লাভ]

প্রকৃতিই তত্ত্বজ্ঞান অনুসন্ধিৎসুর প্রধান শিক্ষক; সুব্রত বনপাদপরাজির নিকট হইতে সহিষ্ণুতা, ক্ষমা এবং আশ্রিত বৎসলতার জাজ্জ্বল্যমান উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন; কুসুমিত পুষ্পভার-সন্নিধানে পরসেবা এবং ঈশ্বরার্চ্চন অর্জ্জন করিলেন, কোমলা লতিকা-সকাশে পর-নির্ভরতা ও আশ্রয়-নিষ্ঠা শিক্ষা করিলেন এবং কলকণ্ঠ বিহগ-সমীপে মিষ্টভাষিতা এবং সঙ্গীত-সাধনার জ্ঞানলাভ করিলেন। তিনি বনস্পতির ন্যায় সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হইয়া, কৃশাঙ্গী বল্লরীর ন্যায় পরব্রহ্মে আত্মনির্ভর এবং অনন্যাশ্রয় হইয়া সুকণ্ঠ বিহঙ্গের ন্যায় সামগানপূর্ব্বক ভগবচ্চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে লাগিলেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, তিনি এই মহাশিক্ষার স্থান আর পরিত্যাগ করিবেন না। অষ্টাবক্র এইরূপে চঞ্চল মনকে স্থির করিয়া মনোরম লতাকুঞ্জে বসিয়া কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন।

অষ্টাবক্র বহুকালব্যাপী কঠোর তপস্যা করিয়া পার্ব্বতীনাথকে তুষ্ট করিলেন। ভোলানাথ স্তবে মুগ্ধ হইয়া এই বর প্রদান করিলেন যে "অদ্যাবধি তোমার পূজার পর আমার অর্চ্চনা হইবে, এবং তোমার নামেই আমার স্থিতি হইবে" (১) এবং এখন হইতে এই ক্ষেত্র সিদ্ধ পীঠ নামে খ্যাত হইবে।" (২)

[বক্রনাথের মন্দির]

ত্র্যম্বকের এই আদেশ হইবামাত্র বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা নদীর পূর্ব্বতটে অষ্টাবক্রের তপস্যাস্থানে একটী সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইল। তন্মধ্যে বিরাজিত বৃহত্তর পাষাণ লিঙ্গমূর্ত্তিটী অষ্টাবক্রের ও ক্ষুদ্রটী বক্রনাথের। মন্দিরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণাংশে যে প্রস্তরফলক খোদিত আছে, তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, এই অংশটী বীরভূমাধিপতি রাজা আসদ জমান খাঁয়ের দর্পনারায়ণ নামক জনৈক মন্ত্রীর দ্বারা ১৬৮৫ সালিবাহনে (১৭৬১ খৃষ্টাব্দে) নিৰ্ম্মিত হয়। মন্দিরের

(১) "সতত্ত্বং ত্বঞ্চ মদ্ভক্তোহপ্যসৌখ্যেন্দ্রিয়ভূতঃ সদা।
কৃত্বা ভবন্নাম চাগ্রণ্যং মম চাত্র স্থিতির্ভবেৎ" ॥

বক্রেশ্বর মাহাত্ম্যম্, দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(২) "ইদানীং সিদ্ধপীঠস্তু লোকে খ্যাতো ভবিষ্যতি।"

বক্রেশ্বর মাহাত্ম্যম্, দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পূর্ব্বদিকে রক্ষিত আরও দুইটী প্রস্তরফলকে হালশর্ম্মা ও সরাথ নামক দুই সহোদরের নাম খোদিত আছে, এবং তাহা হইতে এই অনুমিত হয়, যে এই দুই ভ্রাতা মন্দিরের এই অংশ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আর একাংশে ১৬৭৭ সালিবাহন (১৭৫৫ খৃঃ অব্দে) অঙ্কিত, কিন্তু অপরাংশ অস্পষ্ট। প্রস্তরফলকে অঙ্কিত সাল দেখিয়া মন্দির বা স্থানের প্রাচীনত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই; যেহেতু ভঙ্গুর জগতে কত ভাঙ্গিতেছে, কত গড়িতেছে। বোধ হয় কালক্রমে মন্দিরটী ভগ্নদশা প্রাপ্ত হওয়ায় তাহা সময়ে সময়ে সংস্কৃত হইয়াছে এবং এই সকল প্রস্তরফলকে সেই সকল সংস্কারকগণের নাম ও সময় অঙ্কিত হইয়াছে। (১)

[উষ্ণ প্রস্রবণ] এই সুউচ্চ দেবালয়ের উত্তরে ও পশ্চিমে যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল ভক্তিমান্ সাময়িক যাত্রিগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। অষ্টাবক্র-প্রতিষ্ঠিত বক্রেশ্বরের মন্দির ব্যতীত ভগবানের অদ্ভুত লীলাপ্রকাশক কয়েকটী উষ্ণ প্রস্রবণ এই স্থানে বিরাজিত থাকিয়া স্থানের মাহাত্ম্য অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়াছে। নিত্য প্রবহনশীল তপ্ত উৎসগুলিকে তত্রত্য অধিবাসিগণ কুণ্ড বলিয়া থাকে; ইহার মধ্যে জল ফুটিতেছে এবং তদুপরি ধূমশিখা সর্ব্বদা আকাশ-মার্গে উত্থিত হইতেছে। বীরভূম জেলার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট ক্রাইন সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন যে, পৃথিবীর মধ্যে যতগুলি উষ্ণ উৎস আবিষ্কৃত হইয়াছে,

(১) ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ৫ঠা জুন তারিখে প্রত্নতত্ত্ববিৎ বিশ্বকোষ-প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বক্রেশ্বরদর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং তথায় মন্দিরগাত্রে রক্ষিত অপর একটি প্রস্তরফলক হইতে "নরসিংহ" এর কয়েকটা মাত্র কথার উদ্ধার করিয়াছেন, অপরাংশ এত অস্পষ্ট যে, তাহা পাঠ করা যায় না এবং তথাকার অশ্বত্থবটের মূলদেশে রক্ষিত একটী ভগ্ন হরগৌরীর মূর্ত্তি লইয়া আসিয়াছেন। সেই মূর্ত্তিটীর উড়িষ্যা দেশীয় প্রাচীন মূর্ত্তির সহিত সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য আছে। পার্ব্বতীয় কবরী ও অলঙ্কার উড়িষ্যাদেশীয় রমণীগণের ন্যায় এবং তাঁহার মতে বক্রেশ্বর মন্দিরটীও উৎকল দেশীয় মন্দিরের অনুকরণে গঠিত। এই সকল দেখিয়া তিনি অনুমান করেন যে, রাজনগররাজ গাঙ্গেয় বংশসম্ভূত নরপতি অনঙ্গভীমের পুত্র নরসিংহ দেব গৌড়াধিপ মালিক তুগ্রাল ইতুগাল খাঁকে পরাজয় করিয়া লাক্ষুর (বর্ত্তমান রাজনগর) অধিকার করিয়া আধিপত্য-বিস্তার করেন, তৎকালে তিনি এই বক্রনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং উপরোক্ত প্রস্তর-ফলকে লিখিত "নরসিংহ" রাজপুরাধিষ্ঠিত নরসিংহদেব ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। তিনিই তৎকালে বক্রেশ্বর মহাপীঠে অনেক মূর্ত্তি স্থাপন করেন। নগেন্দ্র বাবু সংপ্রতি যে ভগ্ন মূর্ত্তিটী লইয়া গিয়াছেন, সেটি নরসিংহদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে অন্যতম।

মঙ্গলকোট (১) হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী বক্রেশ্বরে আসিয়া প্রত্যহ বক্রনাথের অর্চ্চনা করিতেন। তদ্দর্শনে ভক্তবৎসল অনাদিদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরদানে প্রতিশ্রুত হইলেন। শ্বেত নরপতি প্রণিপাত করিয়া এই পবিত্র ক্ষেত্রে স্বীয় নাম প্রচারিত হইবার এবং অন্তে ঐ শ্রীচরণপ্রান্তে আশ্রয় পাইবার কামনা করিয়া দুইটী বর প্রার্থনা করিলেন।

বক্রনাথ "তথাস্তু" বলিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন এবং সেই অবধি এই কুণ্ড "শ্বেতগঙ্গা" নামে প্রচারিত হইল। ইহার জল গঙ্গাজল তুল্য পবিত্র, অশেষ পাপহরণ ইহার মাহাত্ম্য। মহাদেবের অতি প্রিয় কুণ্ড বলিয়া ইহা তাঁহার মন্দির সন্নিকটে অবস্থিত ও প্রত্যহই এই পুণ্যবারিতে তাঁহার অবগাহন হইয়া থাকে। মাঘ মাসে এই সলিলে স্নান করিলে সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।(২)

ক্ষারকুণ্ড।—পুরাকালে লবণসাগর অগস্ত্য মুনির নিকট ভীত হইয়া এই তীর্থে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই সময়ে এই কুণ্ড ক্ষারমিশ্রিত হইয়াছিল বলিয়া তদবধি এই উৎসকে ক্ষারকুণ্ড বলিয়া থাকে। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ইহার জলে স্নান করিলে প্রলয় কাল পর্য্যন্ত স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।(৩)

সৌভাগ্যকুণ্ড।—জীবকুণ্ডের দক্ষিণে সৌভাগ্যকুণ্ড অবস্থিত। শঙ্করের অঙ্গ ও মহামায়া উমাদেবীর স্বেদ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। এখানে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ বিদূরিত হইয়া লোকের সৌভাগ্যের উদয় হয়।(৪)

বৈতরণী।—ব্রহ্মকুণ্ডের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে পুণ্যতোয়া বৈতরণী বিরাজিত। শুদ্ধচিত্তে এই কুণ্ড অতিক্রম করিলে জীব অনায়াসে শমনশাসন হইতে অব্যাহতি লাভ করে। বক্রেশ্বর নদীর দক্ষিণ দিকস্থ স্রোত 'পাপহরা' নামে অভিহিত। আদিকালে মেদিনী মহাপ্রলয়ে মগ্ন হইলে সৃষ্টিকর্ত্তার যাবতীয়

(১) এই মঙ্গলকোট গ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত।
বক্রেশ্বরমহাত্ম্যম্ ২৪ পৃঃ টীকা।

(২) "মাঘে মাসি কুহুস্নানং তত্র সর্ব্বাঘনাশনং"।
বক্রেশ্বরমাহাত্ম্যম্, পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

(৩) "তস্মাৎ তৎক্ষারসংযোগাৎ ক্ষারকুণ্ডপ্রতিষ্ঠিতং"
তজ্জলং শিরসা ধৃত্বা নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে"॥
বক্রেশ্বরমাহাত্ম্যম্ ষষ্ঠোঽধ্যায়।

(৪) "সৌভাগ্যকুণ্ডং বিখ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রমোচনং"
বক্রেশ্বরমাহাত্ম্যম্ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সৃষ্ট বস্তু লোপ পাইয়াছিল। তখন সৃষ্টিপ্রকরণের জন্য প্রজাপতি ও রুদ্রদেবের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। ক্রোধে ত্র্যম্বক উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলে অচিরে তদীয় মুখ হইতে এক ভৈরব নিঃসৃত হইলেন এবং পঞ্চানন অবিলম্বে তাঁহাকে ব্রহ্মার একটী মুণ্ড নখাঘাতে ছিন্ন করিতে আদেশ করিলেন। প্রভুর আজ্ঞা তদ্দণ্ডেই পালিত হইল, কিন্তু ব্রহ্মহত্যা করিয়া ভৈরব শান্তিহারা হইলেন; তাঁহার মন সর্ব্বদা পাপাগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। চিত্ত স্থির করিবার জন্য তিনি নানা তীর্থে ও আশ্রমাদিতে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই হৃদয়জ্বালার উপশম না হওয়ায় অবশেষে শিবদূত বক্রেশ্বরে আসিয়া চন্দ্রমৌলির কঠোর আরাধনা করিলেন। আশুতোষ তুষ্ট হইয়া এই বর প্রদান করিলেন যে, তোমার দুইকর যতদূর প্রসারিত হইয়াছে, ততদূর সর্পাকারে প্রবাহিত হইয়া পুণ্যসলিলা পাপহরা নাম্নী নদী তোমার নামের চির ঘোষণা করিবে ও ইহাতে অবগাহন করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ-মোচন হইবে ও অন্যান্য বহুবিধ ফললাভ হইবে।(১)

[মানগিরি গোঁসাঞির সমাধি]

প্রবাদ আছে যে, প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এই পবিত্র বক্রেশ্বরক্ষেত্রে মানগিরি নামক এক প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি এই স্থানেই যোগসিদ্ধ হইয়া জীবিতাবস্থাতেই সমাধি গ্রহণ করতঃ ৺কাশীধামে পুনরাভির্ভূত হন এবং তথায় জনৈক বক্রেশ্বরের পাণ্ডাকে দেখিয়া আদেশ করেন যে, তাহার বক্রেশ্বরক্ষেত্রের সমাধিস্থলে অচিরেই একটী শিবলিঙ্গ স্থাপন করিবে। ঐ সমাধিস্থানের মৃত্তিকা শূলপীড়িত ব্যক্তিগণ তথায় গিয়া ভক্তি-সহকারে ভক্ষণ ও উদরে লেপন করিলে তাহাদের পীড়া ও বেদনা অচিরে উপশম হইবে। ফলতঃ ঔষধ (মৃত্তিকা) গ্রহণকালে এক ডোর কৌপীন মানসিক করিয়া ঐ সমাধির উপরে প্রদান করিবে। সচরাচর অনেক রোগীকে ঐরূপ প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিতে শুনা গিয়াছে। এই সমাধিমন্দিরটী শ্বেতগঙ্গার উত্তর-তট-সংলগ্ন। এবং তটস্থিত বাঁধা ঘাটের বাম-পার্শ্বে অক্ষয় বটবৃক্ষের নিকট অবস্থিত।

(১) যাবৎ প্রসার্য্য বাহু দ্বৌ তপশ্চিন্নং মহামতে।
সর্পাকারে শিবক্ষেত্রে নদী পাপহরাস্তু তে॥
আসীদ্ভোগবতী গঙ্গা সা চ পাপহরা শুভা।
তব ব্রহ্মবধপাপং বিলয়ং যাত্বসংশয়ম্।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি যানি যানি কৃতানি চ।
তানি সর্ব্বানি নশ্যন্তু তেন পাপহরাম্বেষা।
—বক্রেশ্বরমাহাত্ম্যম্ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

গুহা।—বহুকাল পূর্ব্বে দুখু গিরি নামক এক যোগী এই বক্রেশ্বরক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া যোগ সাধনা করিতেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, একদা বক্রেশ্বরনিবাসী জনৈক পাণ্ডার একটী বৃহৎকায় বৃষ নিরুদ্দেশ হইলে, তিনি যোগিবরের আশ্রমে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবার অঙ্গীকার করিলে যোগীরাজ তিনটী অঙ্গুলি-স্ফোটক (তুড়ি) দিবামাত্রই ঐ গুহা হইতে বৃষটী বাহির হইয়া পড়ে। গুহাটী বক্রেশ্বর দেবের ও জগদারাধ্যা মহিষমর্দ্দিনী দেবীর মন্দিরের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় চারি হস্ত, প্রস্থ সার্দ্ধদ্বিহস্ত এবং উর্দ্ধেও প্রায় ইহা সার্দ্ধদ্বিহস্ত।

[ভৈরববেদী ও শাল্মলী বৃক্ষ]

শ্বেতগঙ্গার অনতিদূরে পশ্চিমোত্তর কোণে একটী অতি প্রাচীন সুবৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষের পাদমূলে নাতিউচ্চ ইষ্টকনির্ম্মিত গোলাকার বেদীর উপরে ভৈরবের এক প্রতিমূর্ত্তি আছে। উহা স্থানে স্থানে ভগ্ন হওয়ায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত খাঁকী বাবা (১) তাহা উত্তমরূপে সংস্কার করাইয়া বেদীর সম্মুখে এক খণ্ড প্রস্তরে নিজের নাম খোদিত করিয়া স্থাপন করিয়াছেন।

দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব দুর্ব্বিষহ পত্নী-শোকে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উন্মত্তবৎ বিকট তাণ্ডবে চরাচর সন্ত্রাসিত করেন। তখন সহসা প্রলয়কারী রুদ্রতেজ পৃথিবীকে পীড়িত করিয়া শূন্যদেশ সমাচ্ছন্ন করিতে থাকে। তদ্দর্শনে দেবগণ আতঙ্কে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। নারায়ণ সুদর্শনচক্রে সতীদেহ একপঞ্চাশৎ অংশে বিভক্তকরতঃ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিক্ষেপ করিলে ঐ বিভিন্ন অংশ যে যে স্থানে পতিত হয়, তাহা এক একটী পীঠস্থান বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। বক্রেশ্বরে দেবীর ইন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ মনঃ (ভ্রূমধ্যস্থ স্থান) পতিত হওয়ায় এই পুণ্যভূমি মহাপীঠরূপে চিরপূজিতা। এখানে দেবী "মহিষমর্দ্দিনী" ও মহাদেব ভৈরব "বক্রেশ্বর" (২) এই জন্য এই স্থানটীর নাম বক্রেশ্বর হইয়াছে।

(১) ইনি একজন সাধক পুরুষ। ইনি প্রায় ষষ্টিবর্ষের উর্দ্ধকাল বীরভূমে বাস করিতেছিলেন; এক্ষণে কলিকাতায় থাকিলেও অধিকাংশ সময় এ জেলায় ক্ষেপণ করিয়া থাকেন। তাঁহার বয়স নির্ণয় করা যায় না। অতি প্রাচীন লোকমুখেও শুনা যায় যে, তাঁহারাও তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে প্রায় এইরূপ দৈহিক অবস্থায় দেখিয়া আসিতেছেন। তিনি মৃতদেহ ভক্ষণ করেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে "খাঁকী বাবা" বলিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত তিনি যখন প্রথমে এখানে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি বিবস্ত্র হইয়া থাকিতেন বলিয়া তিনি এ জেলায় "নেংটা বাবা" নামেও পরিচিত। ইনি যোধপুর রাজবংশোদ্ভব বলিয়া খ্যাত হন।

(২) বক্রেশ্বরে মনঃপাতঃ।

এখানে শৃগাল, কুক্কুর ও গৃধ্রাদির পরস্পর মিত্রভাবে শব-ভক্ষণ দর্শন করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয় এবং ভূতভাবন ভবানীপতির প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া আত্মহারা হইতে হয়। ফলতঃ এরূপ ঐশিক লীলার প্রত্যক্ষদর্শন তীর্থক্ষেত্র অন্য কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় কিনা সন্দেহ।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বহু পরীক্ষা এবং গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পৃথিবীর অন্তঃস্তল তরল উষ্ণ ধাতুতে (Soda) পরিপূর্ণ, এই জন্য এ স্থান অত্যন্ত উত্তাপময়। ভূগর্ভের বালুকাস্তরে যে জল সঞ্চিত থাকে তাহা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থান হইতে প্রস্রবণ আকারে বহির্গত হয়। উভয় সিদ্ধান্তই প্রত্যক্ষ পরীক্ষাসিদ্ধ। ধরণীগত সঞ্চিত জলই ভূগর্ভস্থ উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া উষ্ণ প্রস্রবণের উৎপত্তি করিয়া থাকে। এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, বক্রেশ্বর-তীর্থের নিকটবর্ত্তী কুণ্ডগুলির জল সমোষ্ণ নহে কেন? আর একই স্থানে শীতল এবং উষ্ণ জলের প্রস্রবণ কিরূপে সম্ভূত হইল? আর এই সকল কুণ্ড-গুলি প্রায় ভূমিভাগের সহিত সমতল, কিন্তু ঐ গুলির নিকটে কূপ খনন করিলে তাহা অধিকতর গভীর করিতে হয় কেন? এবং সেই কূপের জল শীতল হইবার কারণ কি?

-*-



মঙ্গলডিহি হইতে প্রাপ্ত স্বর্ণমুদ্রা



মঙ্গলডিহি—শ্রীশ্রী শ্যামচাঁদ ও বলরাম প্রভুজীউ।

আরাধ্য যন্ময়া দেব্যা স্বরূপং যেনতদ্দ্বিজ ।
বিধিনা ব্রূহি সকলং যথাবৎ প্রণতস্য মে ॥

ঋষিরুবাচ

ইদং রহস্যং পরমমনাখ্যেয়ং প্রচক্ষতে ।
ভক্তোঽসীতি নমে কিঞ্চিৎ তবাবাচ্যং নরাধিপ ॥
সর্ব্বাসাদ্যাম্‌হালক্ষ্মী স্ত্রীগুণা পরমেশ্বরী ।
লক্ষ্যালক্ষ্যস্বরূপা সা ব্যাপ্য্যা কৃৎস্নং ব্যবস্থিতা ॥
মাতুলিঙ্গং গদাং খেটং পানপাত্রং চ বিভ্রতি ।
নাগং লিঙ্গং চ যোনীঞ্চ বিভ্রতি নৃপমূর্দ্ধনি ॥
তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভা তপ্ত-কাঞ্চন-ভূষণা ।
শূন্যং তদখিলং স্বেন পূরয়ামাস তেজসা ॥
শূন্যং তদখিলং লোকং বিলোক্য পরমেশ্বরী ।
বভার রূপমপরং তমসং কেবলে নহি ॥
স্বাভিন্নাঞ্জন-সংকাশা দংষ্ট্রাঙ্কিতবরাননা ।
বিশাললোচনা নারী বভূব তনুমধ্যমা ॥
খড়্গ-পাত্রশিরঃ খেটৈরলঙ্কৃতা চতুর্ভুজা ।
কবন্ধহারং শিরসা বিভ্রাণাং শিরসং স্রজং ॥
তাং প্রোবাচ মহালক্ষ্মী স্তামসি-প্রমদোত্তমাং ।
দদামি তব নামানি যানি কর্ম্মাণি তানি তে ॥
মহামায়া মহাকালী মহামারি ক্ষুধা-তৃষ্ণা ।
নিদ্রা-তৃষ্ণা চৈকবীরা কালরাত্রির্দুরত্যয়া ॥
ইমানি তব নামানি প্রতিপাদ্যানি কর্ম্মভিঃ ।
এভি কর্ম্মাণি তে জ্ঞাত্বা যোঽধিতে সোশ্নুতে সুখং
তামিত্যুক্ত্বা মহালক্ষ্মীঃ স্বরূপ মপরং নৃপ ।
সত্ত্বাখ্যেনাতিশুদ্ধেন গুণেনেন্দুপ্রভং দধৌ ॥
অক্ষমালা কুশধরা বীণাপুস্তকধারিণী ।
সা বভূব বরা নারী নামান্যস্যৈ চ সা দদৌ ॥
মহাবিদ্যা মহাবাণী ভারতী বাক্ সরস্বতী ।
আর্য্যা ব্রাহ্মী মহাধেনুঃ বেদগর্ভা সুরেশ্বরী ॥

অথোবাচ মহালক্ষ্মীঃ মহাকালীং সরস্বতীং।
যুবাং জনয়তাং দেব্যৌ মিথুনে স্বানুরূপতঃ॥
ইত্যুক্ত্বা তে মহালক্ষ্মীঃ সসর্জ্জ মিথুনং স্বয়ম্।
হিরণ্যগর্ভৌ রুচিরৌ স্ত্রী-পুংসৌ কমলাসনৌ॥
ব্রহ্মন্ বিধি বিরিঞ্চীতি ধাতরিত্যাহ তং নরম্।
শ্রীপদ্মে কমলে লক্ষ্মী ত্যাহ মাতা স্ত্রিয়ঞ্চ তাম্॥
মহাকালী ভারতী চ মিথুনে সৃজতি স্মহ।
এতয়োরপি রূপাণি নামানি চ বদামি তে॥
নীলকণ্ঠং রক্তবাহুং শতাঙ্গং চন্দ্রশেখরং।
জনয়ামাস পুরুষং মহাকালী সীতাং স্ত্রিয়ম্॥
স রুদ্রঃ শঙ্কর স্থাণুঃ কপর্দ্দীচ ত্রিলোচনঃ।
ত্রয়ী বিদ্যা কামধেনুঃ শাস্ত্রী ভাষাক্ষরাক্ষরো॥
সরস্বতী স্ত্রিয়ং গৌরীং কৃষ্ণং চ পুরুষং নৃপ।
জনয়ামাস নামানি তয়োরপি বদামি তে॥
বিষ্ণু কৃষ্ণ হৃষিকেশ বাসুদেব জনার্দ্দন।
উমা গৌরী সতী চণ্ডী সুন্দরী শুভগা শিবা॥
এবং যুবতয়ঃ সত্তঃ পুরুষত্বং প্রপেদিরে।
চক্ষুষ্মতেঽনুপশ্যন্তি নেতরেঽতদ্বিদো জনাঃ॥
ব্রহ্মণে প্রদদৌ পত্নীং মহালক্ষ্মীর্নৃপত্রয়ীং।
রুদ্রায় গৌরীং বরদাং বাসুদেবায় চ স্ত্রিয়ং॥

*　　*　　*

*　　*　　*

সকলের আদিভূতা মহালক্ষ্মী হইতে প্রথমতঃ তমোগুণে খড়্গ, পাত্র, (নর) শির ও খেটকালঙ্কৃতা, চতুর্ভুজা, দশনদংশিতোষ্ঠা, দলিতাঞ্জনবরণা, এক নারী উদ্ভূতা হইলেন। পরে শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অক্ষমালাঙ্কুশ ও বীণা-পুস্তকধারিণী চতুর্ভুজা কুন্দেন্দুধবলা আর এক নারীর উদ্ভব হইল। প্রথমার নাম হইল মহামায়া, মহাকালী ইত্যাদি এবং দ্বিতীয়ার নাম হইল ভারতী বাক্-সরস্বতী ইত্যাদি—অতঃপর মহালক্ষ্মী, কালী ও সরস্বতীকে এক এক মিথুন সৃষ্টির আদেশ দিয়া নিজে ব্রহ্মা ও লক্ষ্মীর সৃষ্টি করিলেন। কালী হইতে রুদ্র ও ভারতী এবং সরস্বতী হইতে বাসুদেব ও গৌরীর সৃষ্টি হইল। দেবী

মহালক্ষ্মী, ব্রহ্মাকে সরস্বতী, রুদ্রকে গৌরী ও বাসুদেবের করে পত্নীরূপে কমলাকে অর্পণ করিলেন। * * *

প্রসঙ্গত আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইতেছে। "দুর্গাসপ্তশতী" হইতে জানিতে পারা যায় যে, মধুকৈটভবধাধিষ্ঠাত্রী দশবদনা কালিকাদেবী উপরি কথিত চতুর্ভুজা কালিকাদেবীর অংশ। এইরূপ মহিষাসুর-বধাধিষ্ঠাত্রী অষ্টাদশ-ভুজা মহিষমর্দ্দিনী দেবী কথিত মহালক্ষ্মী দেবীর ও শুম্ভনিশুম্ভ-বধাধিষ্ঠাত্রী অষ্ট-ভুজা সরস্বতী দেবী-কথিত মহাসরস্বতী দেবীর অংশ। এক কথায় ইহারা অবতরী ও তাঁহারা অবতার। এইবার দুর্গাসপ্তশতীর "বৈকৃতিক-রহস্য" হইতে মূর্ত্তিস্থাপন-ক্রম বিবৃত করিতেছি।

"মহালক্ষ্মী র্যদা পূজ্যা মহাকালী সরস্বতী।
দক্ষিণোত্তরযোঃ পূজ্যে পৃষ্ঠতো মিথুনত্রয়ং॥
বিরিঞ্চি স্বরয়া মধ্যে রুদ্রো গৌর্য্যাচ দক্ষিণে।
বামে লক্ষ্ম্যা হৃষীকেশঃ পুরতো দেবতাত্রয়ং॥
অষ্টাদশভুজা মধ্যে বামে চাস্যা দশাননা।
দক্ষিণেঽষ্টভুজা লক্ষ্মীর্মহতী সমর্চ্চয়েৎ॥ মূর্ত্তি-স্থাপন ক্রম
অষ্টাদশভুজা চৈসা যদা পূজ্যা নরাধিপ।
দশাননাং চাষ্টভুজাং দক্ষিণোত্তরয়োস্তদা॥
কালং মৃত্যু শ্চ সংপূজ্যৌ সর্ব্বারিষ্টপ্রশান্তয়ে।
ন বাস্যা শক্তয়ঃ (২) পূজ্যাস্তথা রুদ্রবিনায়কৌ॥

প্রাধানিক-রহস্যোক্ত সর্ব্বাদিভূতা মহালক্ষ্মী দেবীর পূজা করিতে হইলে মহালক্ষ্মী দেবীর দক্ষিণে মহাকালী ও বামে মহাসরস্বতীর অর্চ্চনা করিতে হইবে। ইঁহাদের পৃষ্ঠে মিথুন দেবতাত্রয় থাকিবেন। মধ্যে অর্থাৎ মহালক্ষ্মীর পশ্চাতে বিরিঞ্চি ও সরস্বতী, তাহার দক্ষিণে অর্থাৎ মহাকালীর পশ্চাতে রুদ্র ও গৌরী এবং বামে অর্থাৎ মহাসরস্বতীর পশ্চাতে কমলা ও হৃষীকেশের পূজা হইবে। আর সম্মুখভাগে অর্থাৎ মহালক্ষ্মীর অগ্রে অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দ্দিনী। মহিষমর্দ্দিনীর বামে অর্থাৎ মহাসরস্বতীর অগ্রে দশাননা কালী ও দক্ষিণে অর্থাৎ মহাকালীর অগ্রে অষ্টভুজা সরস্বতী পূজিতা হইবেন। অষ্টাদশভুজা কিম্বা দশাননা বা অষ্টভুজার পূজা করিতে হইলেও মূর্ত্তিগুলি এইরূপ

(২) নব শক্তয়ঃ কবচোক্তা শৈলপুত্র্যাদয়ঃ পীঠশক্তয়োবা। (গুপ্তবতী টীকাকার)

ভাবেই অবস্থিত থাকিবেন। তবে অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দ্দিনীই যেখানে প্রধানা-রূপে পূজিতা হইবেন তথায় দশাননার দক্ষিণে কাল ও অষ্টভুজার বামে মৃত্যুর পূজা করিতে হইবে। উপরন্তু তথায় নবশক্তি ও রুদ্র এবং বিনায়কেরও পূজা হইবে। দেবীগণের মধ্যে অষ্টাদশভুজা ও মিথুনত্রয়ের মধ্যে হর-গৌরীর ভগ্নমূর্ত্তি মাত্র "বক্রেশ্বরে" পাওয়া গিয়াছে। নবশক্তি-মূর্ত্তি যে মহিষ-মর্দ্দিনীর মূর্ত্তির সহিত তদীয় চালচিত্রাকারে অঙ্কিতা রহিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। উপরি কথিত অপরাপর মূর্ত্তিগুলিও বক্রেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা ধারণাও করিতে পারি না, দুর্ব্বল আমরা এই মূর্ত্তিসংঘের মহান্ চিত্র কল্পনানেত্রে দেখিতে গেলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। কি বিরাট সে পরিকল্পনা! কি উদার সে সমাবেশ-শৃঙ্খলা। কি ভীম-কাণ্ড সে সৌন্দর্য্য! আজ আর কিছুই নাই! কালের দুর্ব্বার বিক্রম সব বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে! মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তিটী যথায় পাওয়া গিয়াছে তথাকার প্রস্তর-স্তূপ হইতে সংগৃহীত অনেকগুলি প্রস্তরখণ্ড শ্বেতগঙ্গা নামক সুবৃহৎ কুণ্ডটী বাঁধানোর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। কতকগুলি প্রস্তর পাণ্ডা মহাশয়-গণের গৃহ-সোপানাদির শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। তথাপি এখনও দুই চারিটী পড়িয়া আছে। দেখিয়া মনে হয়, দেবীর প্রাচীন মন্দির ঐ স্থানেই ছিল। কিন্তু ভগ্ন হরগৌরী-মূর্ত্তিটী দেখিয়া আবার নানারূপ সন্দেহ হয়। অর্থাৎ দেবী-মূর্ত্তিটী যেরূপ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, ভগ্ন হরগৌরী মূর্ত্তিটী দেখিয়া কেহ কেহ এরূপ অনুমানও করিতে পারেন যে, কোনও কালাপাহাড়ের ভয়ে হয়তো দেবীকে পুষ্করিণী-গর্ভে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। অপরাপর মূর্ত্তিগুলি অত্যাচারীর হস্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে ও হরগৌরী-মূর্ত্তিটী বিকলাঙ্গ হইয়া রহিয়া গিয়াছে। তবে পুষ্করিণী-গর্ভে এতগুলি প্রস্তর কোথা হইতে আসিল ইহাও এক সমস্যার কথা বটে। আমাদের মনে হয়, এখন যেখানে পুষ্করিণী হইয়াছে সেই স্থানেই মন্দির ছিল। ভূমিকম্পাদি প্রাকৃতিক বিপ্লবে তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। দেবী-মূর্ত্তিটী কোনও রূপে রক্ষা পাইয়াছিল। অপরাপর মূর্ত্তিগুলি হয়ত চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হরগৌরী মূর্ত্তিটী অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় পড়িয়াছিল, শ্বেতগঙ্গা বাঁধাইবার জন্য প্রস্তর-সংগ্রহ সময়ে তিনি বাহির হইয়াছিলেন এবং প্রস্তরের সঙ্গে মন্দির-সান্নিধ্য হইতে শ্বেতগঙ্গা তীরে নীত হইয়াছিলেন।

মহিষ-মর্দ্দিনীর মন্দির

বক্রেশ্বর একটী মহাপীঠ। কিন্তু কালক্রমে দেবীমূর্ত্তি অন্তর্হিত হওয়ায়

'ভৈরব-বক্রেশ্বর'ই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ইহাকে "সিদ্ধ-পীঠ" বলিয়াই প্রশংসা করা হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গের তান্ত্রিকাগ্রগণ্য স্বর্গগত পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়-সম্পাদিত "পীঠমালা" গ্রন্থে "মহাপীঠ" বা "সিদ্ধ-পীঠ" পর্য্যায়ে কোথাও বক্রেশ্বরের নাম উল্লিখিত হয় নাই। তিনি বক্রেশ্বরকে মহাপীঠ বলিয়াই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সে যাহা হউক, অষ্টাবক্র-সম্বন্ধেও গোলযোগ আছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত যে অষ্টাবক্র-বিবরণ "বক্রেশ্বর" কাহিনীতে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, সুব্রত মুনি ইন্দ্রসভায় সক্রোধ সংহরণ করিতে গিয়া আট ঠাঁই বাঁকা হইয়া গিয়াছিলেন। এদিকে মহাভারতে দেখিতে পাই, উদ্দালক ঋষির দৌহিত্র শ্বেতকেতুর ভাগিনেয় কহোড়পুত্র অষ্টাবক্র মাতা সুজাতার গর্ভ হইতে পিতার বেদপাঠের ভ্রম দেখাইয়া দেওয়ায় পিতৃশাপে অষ্টাবক্রত্ব লাভ করেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের সুব্রত বক্রেশ্বরে আসিয়া বঙ্কিমতা পরিহারপূর্ব্বক পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হন। মহাভারতের অষ্টাবক্র মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের সভায় বাদ-বিচারে "বন্দিকে" পরাজিত করিয়া পিতার উদ্ধার করেন এবং পিতৃ-প্রসাদেই নদীতে স্নান করিয়া বক্রতা মুক্ত হন। সেই হইতে কর্দ্দমিল নদী "সমঙ্গা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা হইলে অষ্টাবক্র হইতেছেন দুই জন। কিন্তু ইহার পরে আরও একজন অষ্টাবক্রের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি পিতৃ-আজ্ঞায় গোবধ করিয়াছিলেন। সংহিতাকার এক অষ্টাবক্র আছেন, তিনি বোধ হয় মহাভারতোক্ত অষ্টাবক্র হইবেন। আমাদের এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য যে, কোনও উপায়ে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অষ্টাবক্রের কাল নিরূপিত হইলে বক্রেশ্বর কাহিনীর জটিলতাও অনেক পরিমাণে সরল হইতে পারিত। অষ্টাবক্র-সমস্যা

বীরভূম জেলায় দুই তিন স্থানে পুরাতন বক্রেশ্বর আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। তত্তৎ স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস যে, ঐ সকল স্থানে "বক্রেশ্বর" নির্ম্মাণ হইতে হইতে পাখী ডাকিয়া উঠিয়াছিল সুতরাং ভোর হইয়াছে অনুমান করিয়া "নরলোক" জাগিতে না জাগিতে "বিশ্বকর্ম্মা" প্রস্থান করেন। তাই বক্রেশ্বর গড়িয়া উঠিতে পারেন নাই"। আমরা দুইটী পুরাতন বক্রেশ্বর দেখিয়া আসিয়াছি, প্রথমটী অণ্ডাল-সিন্থিয়া কর্ড লাইনের দুবরাজপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় দশ মাইল পশ্চিমে দেগঞ্জ নামক গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলমধ্যে অবস্থিত। তথায় একটী পুরাতন ভগ্নমন্দির ও একটী কুণ্ড আছে। কুণ্ড হইতে শীতল জল উত্থিত হইয়া দিবারাত্র অবিশ্রাম গতিতে বহিয়া যাইতেছে। মন্দিরটী পুরাতন বক্রেশ্বর

দেখিয়া শিবমন্দির বলিয়াই অনুমিত হয়, বর্ত্তমানে বিগ্রহশূন্য ও ভগ্ন। স্থানীয় লোকে কুণ্ডটীর নাম বা অপর কোনও তথ্য জানে না। যাহা জানে তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয়টী হইতেছে বীরভূমের সুপ্রসিদ্ধ নগর (লক্ষুর) হইতে কিছু দূরে। তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী উষ্ণ-প্রস্রবণ ও শিব-মন্দির আছে। ইহাতে অনুমান হয়, লোকে যেখানে যেখানে কুণ্ড হইতে জল উঠিতে দেখিয়াছে সেই সকল স্থানকেই বক্রেশ্বর হইতে পারিত বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে। তাহার কারণ এতদঞ্চলের জনসাধারণ উষ্ণ-প্রস্রবণ-কুণ্ডগুলিকেই অর্থাৎ স্বভাবোত্থিত গরম জলকেই বক্রেশ্বরের প্রধান মাহাত্ম্যজ্ঞাপক বস্তু বলিয়া মনে করে। তাহারা শক্তি হারাইয়াছে, সাধনাও ভুলিয়াছে, সুতরাং পীঠ-তীর্থাদির নিগূঢ় তাৎপর্য্যার্থ বিস্মৃত হইয়াছে। তাহারা যে কয়েকটা "প্রস্রবণ" কুণ্ডের সংখ্যাধিক্য থাকিলেই হয়তো এখানেও বক্রেশ্বর তীর্থের সৃষ্টি হইতে পারিত বলিয়া বিশ্বাস করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? তবে ইহার মধ্যে প্রশংসা করিবারও কিছু আছে। জনসাধারণের হৃদয়ে এ বিশ্বাস অনুস্যূত রহিয়াছে যে, প্রকৃতির রম্য ভবনই শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র। যাহা কিছু সুন্দর মনোহর, যাহা কিছু একটু বিশেষত্বময়, তাহাতেই শ্রীভগবদ্বিভূতির বিকাশ কিছু বেশী পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। তাই সেইটির সুন্দর চিদানন্দের দ্যোতনা লইয়া ভারতের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তীর্থে পরিণত হইয়াছে। নগ, নদী, কান্তার ব্যবধান বহুল ভারতবর্ষ, এই তীর্থের আবেষ্টনে একতার বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছে। দেশবাসী স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া দেশ-মাতৃকার চরণে মাথা নত করিয়াছে।

৺বক্রেশ্বরে প্রাপ্ত রাজনগর-রাজপ্রদত্ত

"সনন্দ" (ছাড়পত্র) ।*

তপ্পে হরিপুরের এতমাম্‌দার ও কর্ম্মচারী ও কোতওয়াল ও জমাদারান্‌ সুচরিত্রেষু—

আগে মৌজে ডিহি বক্রেশ্বরের গোপিনাথ শর্ম্মা ও রামজীউ শর্ম্মা ও লক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মা ও জয়চন্দ্র শর্ম্মা ও রাজিধর শর্ম্মা জাহির করিলা যে—উক্ত ডিহি বক্রেশ্বর—দেবত্তর মৌজা দরবস্ত ও চক গঙ্গারামের ডিহি ও চক শিবপুর—সাবিক বীররাজার দত্ত। ৺বক্রেশ্বরনাথ শিবঠাকুরের নিস্কর দেবত্তর মুদ্দ্যত পুরুস ২ হইতে ৺জীয়ের সেবা পূজা করিয়া দখিলকার আছে। বীররাজার দত্ত সনন্দ রাখে। এক্ষণ বক্রেশ্বরের মেলাতে হুজুরের লোক লস্কর হাতী ঘোড়াতে বাজারে জুলুম হাঙ্গাম করে। এজন্য দরখাস্ত করি বক্রেশ্বরের মেলাতে জুলুম না করে তেঁহায় যেমত হুকুম। অতএব উক্ত ডিহি বক্রেশ্বর

---

* "দেড়শত বৎসরের পুরাতন এই সনন্দখানি ৺বক্রেশ্বরের পাণ্ডা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী আচার্য্য মহাশয় অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছেন। আমরা মূল কাগজ দৃষ্টে নকল করিয়া আনিয়াছি। মূল সনন্দখানির উপরিভাগে পার্শিতে কতকগুলি কথা লিখিত আছে। আচার্য্য মহাশয় সনন্দখানি অল্পক্ষণের জন্যও হস্তান্তর করিতে অনিচ্ছুক। নিকটে কোনো পার্শিভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির একান্ত অসদ্ভাব, সুতরাং পার্শিতে কি লিখিত আছে তাহার পাঠোদ্ধার হয় নাই।

১১৭২ সালের ৯ই ফাল্গুন লক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মা প্রভৃতিকে মুন্সী রেয়াজউদ্দীন মহম্মদ মহাশয় এই "সনন্দ" লিখিয়া দিয়াছেন। বক্রেশ্বর তখন বোধ হয় তপ্পে হরিপুরের সামীল ছিল। তজ্জন্য মুন্সী মহাশয় হরিপুরের এতমাম্‌দার প্রভৃতিকে এই সনন্দ অনুযায়ী কার্য্য করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এই মুন্সী রেয়াজউদ্দীন কে তাহার কোনো পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "পরওয়ালিগি" শব্দে কি বুঝাইত, তাহার কোনো অর্থ বোধ করিতে না পারায় "মুন্সি" মহাশয়ের পদবী নির্ণীত হইল না। বঙ্গাব্দ ১১৭২ সালে—ইং ১৭৬৭ খৃঃ—রাজা আসাদ ওজ্জমান বীরভূমের অধীশ্বর ছিলেন। মীরজাফর আলি খাঁ

দরবস্ত দেবত্তর মৌজা ও চক গঙ্গারামে ডিহি ও চক শিবপুর সাবিক বীর-রাজার দেওয়া যথার্থ্য। তাহার সনন্দ রাখে। উক্ত শর্ম্মা পাণ্ডা মজকুরেরা পুরুস ২ মুদ্দ্যত হইতে ৺জীউর সেবা-পূজা করিয়া দখিলকার আছে। ও বক্রেশ্বরে যে বাজার হয় তাহাতে খাজনা আদায় করিয়া দখিলকার আছে। উক্ত দেবত্তর বৃত্তি বেশাদে কেহ জুলুম, হাঙ্গামা করিবে না। ও কখন শর্ম্মা মজকুরদিগকে তলপ করিবেক না। যেন পাণ্ডা মজকুর সাবেক স্থরত—৺জিয়ের সেবা পূজা করিয়া পুত্রপৌত্রাদি ভোগদখল করে। পরওা লিগি মুন্সী রেয়াজউদ্দীন মহম্মদ। ইতি সন ১১৭২ সাল তাং ৯ই ফাল্গুন।

তখন বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যায় শুক্ত মসনদে নবাবী করিতেছিলেন। ছাড়পত্রের লিখিত "উক্ত ডিহি বক্রেশ্বর—দরবস্ত দেবত্তর—মৌজার ও চক গঙ্গারাম ডিহি ও চক শিবপুর সাবিক বীররাজার দেওয়া যথার্থ তাহার সনন্দ রাখে" বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায় বীরভূমের ভূতপূর্ব্ব হিন্দু নরপতি বীররাজার প্রদত্ত পুরাতন সনন্দ তখন বর্ত্তমান ছিল। এখন আর সে সনন্দ-খানি পাওয়া যায় না। বলা বাহুল্য সেখানি পাওয়া গেলে অনেক পুরাতন ঐতিহাসিক-তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইত।" (প্রকাশক)

মঙ্গলডিহি-কাহিনী



ত্রয়োদশ শতাব্দী নানা কারণে প্রত্যেক বাঙ্গালীর চিরস্মরণীয় কাল। এই সময়ে বঙ্গদেশ মুসলমান অত্যাচারে জর্জ্জরিত। এই সময় নানা মতাবলম্বী ধর্ম্ম-বিপ্লবী ব্যক্তিগণের উৎপাত ও উৎপীড়নে শান্তিময় বঙ্গদেশ বিপর্য্যস্ত আর নেতার অভাবে সুদৃঢ় সমাজশাসন উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা প্রাপ্ত। এই মহাবিপদ্-সঙ্কুল সময়ে "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" স্বীয় মুখনিঃসৃত এই মহাবাক্য সফল করিবার জন্য নিরাকার চৈতন্য সাকার শ্রীচৈতন্য অবতারে নদীয়া নগরীতে ১৪০৮ শকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ভগবান্ যতবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ততবারই সপার্ষদ অবতীর্ণ হইয়াছেন, দেখা যায়। এবারও তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও পরে অনেকানেক পার্ষদ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং শ্রীমান্ মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া মধুর হরিনাম প্রচারে পাপান্ধ নরনারীকে বিপথ হইতে ফিরাইয়া ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। ঠিক এই সময়ে ঠাকুর পর্ণিগোপাল জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাকৃতিক শোভার আধার বীরভূমের নিভৃত পল্লী মঙ্গলডিহি পবিত্র করেন। তাই মঙ্গল-ডিহি অতি গণ্ডগ্রাম হইলেও এখনও তাহার নাম বিস্মৃতির বিশাল-গর্ভে বিনষ্ট হয় নাই। এই ক্ষুদ্র গ্রাম এখনও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ ও সমগ্র বঙ্গীয়সাহিত্য-সেবিগণের একটী পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিচিত।

শ্রীপর্ণিগোপাল জনসাধারণের নিকট পেনো বা পানুয়া ঠাকুর বলিয়া পরি-চিত। তিনি পান বিক্রয় করিয়া স্বীয় কুলদেবতার সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন বলিয়া তাঁহাকে পেনো বা পানুয়া ঠাকুর বলিত।

সদর ষ্টেশন সিউড়ী হইতে দাক্ষিণপূর্ব্বে দশ মাইল দূরে মঙ্গলডিহি গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের মঙ্গলডিহি নাম হইবার কারণ 'মঙ্গল' ও 'ডিহি' এই দুইটী শব্দের মধ্যেই বর্ত্তমান। ইহাতে পার্সী অথবা আরবী ভাষার কোন শব্দ বিদ্যমান না থাকায় আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, কোন পাঠান বা মোগল রাজ-পুরুষের দ্বারা ইহা স্থাপিত হয় নাই। আরও ইহা হইতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, এখানে ধর্ম্মভাব বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া-ছিল। এস্থানে কোন হিন্দু দেবতার অধিষ্ঠান হইতে যে ইহা মঙ্গলডিহি অর্থাৎ

করিয়াছিলেন, যাহার গন্ধে আমোদিত হইয়া ভক্তগণ স্বর্গাদিভোগৈশ্বর্য্য এমন কি পঞ্চবিধ মুক্তিকে সামান্ত বস্তুজ্ঞানে দূর হইতে পরিত্যাগ করেন, সেই ভক্তিদেবীর বিশ্ববিজয়িনী শক্তি-মাহাত্ম্যবর্ণন করিতে কেহই সক্ষম নহেন। ভক্তিই পরম গম্ভীর সচ্চিদানন্দ-সাগরকে স্বেচ্ছানুরূপ তরঙ্গায়িত ও উদ্বেলিত করিয়া থাকেন। ভক্তিপ্রভাবেই একদিন যশোদার ভববন্ধন মোচনকারী ভগবানের নয়নকমল হইতে পতিতপাবনী জাহ্নবীর আবির্ভাব হইয়াছিল। ভক্তি দেবীর বক্রমধুর বিক্রান্তিবশে মহানন্দই ক্রন্দনরূপে পরিণত হয়, শোকের ভিতর আনন্দের ফল্গু-নদী তীব্রবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। দুঃখের বন্ধন প্রেয়সীর ভুজলতাবন্ধনের ন্যায় আনন্দেরই কারণ হইয়া উঠে। পানুয়া ঠাকুরের প্রেমে ঠাকুর শ্যামচাঁদ আকৃষ্ট হইয়া যোজনশতদূরবর্ত্তী মঙ্গলডিহিতে আসিয়া বসতি করিলেন। এই শ্যামচন্দ্রোদয়ই পণিগোপাল ঠাকুরের অগাধ প্রেমের পরিচায়ক। অনিমা লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি পরিচারিকার ন্যায় ভক্তিদেবীর অনুগতা, তাই ভক্তশিরোমণি ঠাকুর মহাশয়ের নানা প্রকার অলৌকিক শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি পঞ্চকোটে পানবিক্রয় ও কাটোয়ায় গঙ্গাস্নান করিয়া মঙ্গলডিহিতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অভীষ্টদেবের সেবাকার্য্য প্রতিদিন নির্ব্বাহ করিতেন। পানের বোঝা একদিনও মস্তক স্পর্শ করিত না। ভগবান্‌ই সেই বোঝা বহন করিতেন, তাই মঙ্গলডিহির কবি জগদানন্দ তাঁহার 'শ্যামচন্দ্রোদয়' কবিতায় লিখিয়াছেন, "পূর্ব্বে নন্দের গৃহে, বাধা কভু নাহি বহে, পানুয়ার পিরীতে বহে পান।"

শুনিতে পাওয়া যায়, একদা পানুয়া ঠাকুরের একটী গাভীকে ব্যাঘ্রে লইয়া যায়, তচ্ছ্রবণে তিনি ব্যাঘ্রের নিকট গিয়া গাভীকে রক্ষা করেন এবং ব্যাঘ্রকে কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করিয়া মায়াশার্দ্দূলীর হস্ত হইতে তাহার উদ্ধারসাধন করেন।

তৎসম্বন্ধে আরও এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তৎকালে ঘোষটিকুরি গ্রামে সাহ আবদুল্লা নামক একজন সিদ্ধপুরুষ বিদ্যমান ছিলেন। তিনি পণি-গোপাল ঠাকুরের গুণগরিমার কথা স্মরণ করিয়া তীর্থের দর্শনাভিলাষে ব্যাঘ্রা-রোহণ পূর্ব্বক মঙ্গলডিহি অভিমুখে যাত্রা করেন। ঠাকুর মহাশয় তখন দেওয়া-লের উপর বসিয়া তিন্তিড়ি কাষ্ঠে দন্তধাবন করিতেছিলেন। সাহ আবদুল্লার আগমনের বিষয় জানিতে পারিয়া পানুয়া মিঞা সাহেবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দেওয়ালকে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন। অচেতন দেওয়াল ঘোষটিকুরি অভিমুখে ধাবিত হইল। পথিমধ্যে উভয়ের দর্শনে উভয়ে পরমানন্দিত হইলেন। সাহ আবদুল্লা আর মঙ্গলডিহিতে না আসিয়া ঠাকুর মহাশয়কে ঘোষটিকুরিতে

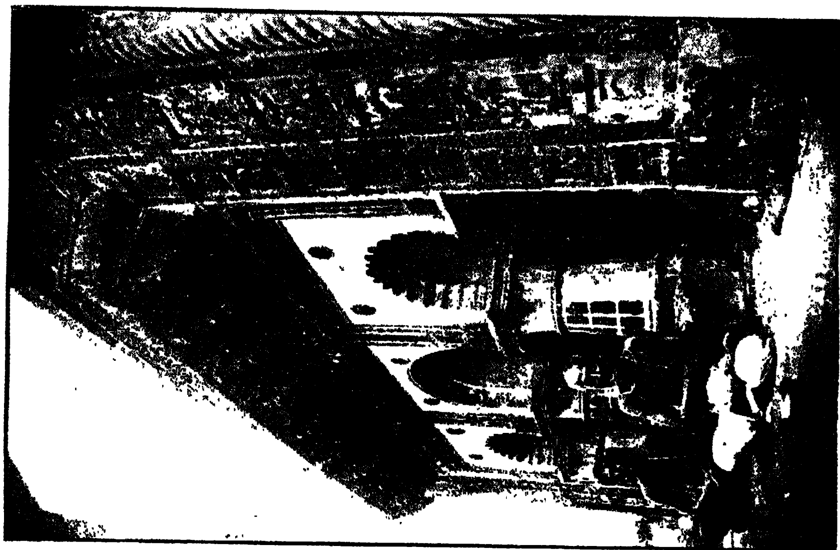
লইয়া যান, তথায় পানুয়া ঠাকুরকে আসনে উপবিষ্ট করাইয়া সাহ আবদুল্লা সেই আসনে উপবেশন করিতে গেলে সেই আসন তৎক্ষণাৎ দ্বিখণ্ড হইয়া যায়। সাহ আবদুল্লা ইহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ক্ষণপরে বস্ত্রাবৃত নানা প্রকার যাবনিক খাদ্য ঠাকুরমহাশয়ের সম্মুখে আনীত হইল, কিন্তু ঠাকুরের শুভদৃষ্টিপাতে তৎসমস্ত খাদ্যসামগ্রী পুষ্পপুঞ্জে পরিণত হইল। (১) শুনিতে পাওয়া যায়, পর্ণিগোপাল ঠাকুর দন্তধাবন করিয়া যে কাষ্ঠ ফেলিয়া দেন, তাহা হইতে দুইটী সুবৃহৎ তিন্তিড়ি-বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তাহা এখনও ঘোষ টিকুড়ি গ্রামে বর্ত্তমান আছে। তৎসম্বন্ধে এইরূপ নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তির কথা প্রবাদরূপে চলিয়া আসিতেছে।

কৃষ্ণদাসের এ সকল গৌরবের বিষয় নহে, প্রেমপিপাসু কৃষ্ণভক্তগণ স্বার্থ-সিদ্ধি কল্পনায় কি খ্যাতিলাভের আশায় অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিতে চাহেন না। তত্রাচ ভক্ত-মাহাত্ম্য দেখাইয়া ভক্তিপথে জনসাধারণের আস্থাবৃদ্ধি করিবার জন্য ভক্তিদেবীর ইচ্ছায় স্বতঃই অদ্ভুত শক্তির বিকাশ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণদাসের অন্য কামনা নাই, কামনা করিবার অবসরও নাই, কেবল মাধুর্য্যাস্বাদন জন্য দিবারাত্রই ব্যস্ত। ভক্তের নিকট কৃষ্ণের রূপ, কৃষ্ণের গুণ ও কৃষ্ণলীলা কতই মধুর, মধুর হইতে সুমধুর, আকাঙ্ক্ষা মিটে না, যতই পান করিতে থাকে ততই পিপাসা বৃদ্ধি হইতে থাকে। তাই মহাপ্রভু আকুলচিত্তে বলিয়াছিলেন, "কৃষ্ণরূপমাধুর্য্যের সিন্ধু। মোর মন সান্নিপতি, সব পিতে করে মতি, দুর্দ্দৈব বৈদ্য নাদেয় এক বিন্দু।" এই প্রগাঢ় লালসাই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ। দস্যুগণ যেরূপ গুরুতর লোভের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণের মমতা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে, লম্পট ব্যক্তির চিত্ত যেরূপ কামান্ধ হইয়া লজ্জা, ধর্ম্ম ও ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া প্রণয়িনীর দিকে প্রধাবিত হয়, তটিনীগণ যেরূপ সহস্র সহস্র বাধা-বিঘ্ন উলঙ্ঘন করিয়া অবিচ্ছিন্ন-বেগে সরিৎপতির সঙ্গম-লাভার্থ প্রবাহিত হইতে থাকে, ভগবৎভক্তেরও চিত্তবৃত্তি সেইরূপ তদীয় দিব্য গুণাবলীশ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া মাধুর্য্যসাগরে হাবুডুবু খাইতে খাইতে আত্মহারা হইয়া যায়, তাহার হৃদয়ে কি একরূপ রসের আবির্ভাব হইয়া হৃদয়কে যেন দুর্নিবার তরঙ্গে বিমথিত করিতে থাকে। শ্রীপর্ণিগোপাল ঠাকুর মহাশয় সেই ভগবদ্ভক্তের আদর্শস্বরূপ গোবিন্দ

(১) জগদানন্দের 'শ্যামচন্দ্রোদয়ে' নান্দীস্বরূপ গ্রন্থারম্ভে যে সংস্কৃত শ্লোক দুইটী লিখিত আছে তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

"মন্দিরে বর্ত্ততে যেন শ্যামসুন্দরবিগ্রহঃ। পর্ণবিক্রয় দ্রব্যেন পূজা যেন কৃতা পুরা॥
যবনান্নং কৃতং পুষ্পং ব্যাঘ্রে মন্ত্রপ্রদায়কং। তং নত্বা পর্ণীগোপালং ক্রিয়তে পুস্তকং ময়া॥

সাগরের মত্তমকর, নীলেন্দীবরের রসিক মধুকর ছিলেন। তাঁহার সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি-কলাপ শ্রবণে হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয়, কঠিন পাষাণও অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। পর্ণিগোপালের প্রকৃত নাম গোপালচন্দ্র, পিতার নাম মনসুখ, মাতার নাম অপরিজ্ঞাত। এক্ষণে পর্ণিগোপাল পানুয়া বা গোপালচন্দ্রের আবির্ভাবের সময় নির্ণয় করিবার প্রয়াস পাইব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তিনি সুন্দরানন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং সুন্দরানন্দ মহাপ্রভু অবতারের সময় জন্ম-গ্রহণ করেন। তাহা হইলেই নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে বা ১৪৮৫ খৃঃ ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং পর্ণিগোপালও তৎকালে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার ঔরসজাত কোন সন্তানসন্ততি ছিল না। তিনি গড়গড়ে গ্রামনিবাসী এক ব্রাহ্মণের পঞ্চ পুত্রকে পোষ্য-পুত্র-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করেন। পুত্রগণের নাম অনন্ত, কিশোর, হরিচরণ, লক্ষ্মণ ও কানুরাম। পানুয়ার মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তিতে ও বিগ্রহসেবায় তাঁহাদের অধিকার হয়। অনন্তের বংশধরগণ মঙ্গলডিহি হইতে শ্রীবলরাম শ্রীবিগ্রহ সমভিব্যাহারে দুবরাজপুরের সন্নিকটবর্ত্তী খয়রাশোলে লইয়া গিয়া তথায় বসবাস করেন। কিশোরের পুত্রসন্তান ছিলনা, কেবল হীরামুনী নাম্নী এক কন্যা ছিলেন। কাটোয়ার সন্নিকটস্থ কোনও গ্রামে সদ্বংশজাত এক ব্রাহ্মণ-কুমারের সহিত হীরামুনীর বিবাহ হয়। তাঁহারই বংশধরগণ শ্রীমদন গোপালের সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন এবং এই দৌহিত্রবংশ হইতে ৺মদন-গোপালের পাঠ নামে মঙ্গলডিহীতে অপর একটি পরিবারের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, বৃন্দাবনধামে সুখোৎসবকুঞ্জে পূর্ব্ব হইতে উক্ত শ্রীমদনগোপাল-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পর্ণিগোপাল ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চ পুত্রগণ পৃথক্ হইলে পর শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে শ্রীমূর্ত্তি শ্রীমতীসহ মঙ্গলডিহি গ্রামে আনীত ও প্রকাশিত হন। শ্রীমদনগোপালের সহিত শ্রীবিনোদ রায় জীউর একটি ধাতুময়ী মূর্ত্তি বিদ্যমান আছেন। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি পর্ণিগোপাল ঠাকুরের আদি কুলদেবতা। হরিচরণ অপুত্রক ছিলেন, লক্ষ্মণ ও কানুরামের পুত্রগণই শ্যামচাঁদের সেবাধিকারী হয়েন। লক্ষ্মণের পুত্রের নাম জানিতে পারা যায় নাই। কানুরামের পুত্রের নাম গোপালচরণ। ইঁহারই দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া মঙ্গলডিহি গ্রামকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম গোকুলানন্দ, কনিষ্ঠের নাম নয়নানন্দ। জ্যেষ্ঠ পরম প্রেমিক ও



মঙ্গলাডিহি শ্রীশ্রীশ্যামচাঁদের মন্দির



মঙ্গলডিহির--গ্রামদেবতা সর্ব্বমঙ্গলার অধিষ্ঠান-স্থান।

সুগায়ক ছিলেন। কীর্ত্তনের পদরচনায় তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল এবং সেই জন্য তিনি কাশীপুরাধিপতির নিকট হইতে গোবাগীডিহি ও মোতাবেগ নামক দুইটি নিষ্কর গ্রাম প্রাপ্ত হন। সেই সম্পত্তির আয় এখনও শ্যামচাঁদের সেবায় ব্যয়িত হয়। গোকুলানন্দের একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"উঠ মোর ভেয়ারে কানাই

প্রভাত হইল নিশি, খগ গেল দশ দিশি, আঁখি মেল আর ভোর নাই,
বদন মার্জ্জনা কর, খাও দধি দুগ্ধ সর, কটীতটে পর পীতবাস।
বৎস গাভী লয়ে সঙ্গে, আনন্দ কৌতুক রঙ্গে, চল যাই বৃন্দাবন-পাশ ॥
বৃন্দাবনে সুশীতল, আছে নানা পক্ক ফল, আম জাম রসাল পিয়াল।
তুলিবে সে সব ফল, শিঙ্গা ভরি লব জল, সুখে খাব আমরা রাখাল ॥
বলরাম দাদা আগে, নিতুই বিহানে জাগে, তোরে কেন জাগাইতে হয়।
গোকুলানন্দেতে কয়, এত নিন্দা ভাল নয়, মা যশোদা জল লয়ে রয় ॥"

কনিষ্ঠ নয়নানন্দ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন, তিনি মঙ্গলডিহীতে একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়া অনেক ছাত্রকে বিদ্যাদান করিতেন এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি-রসকদম্ব ও প্রেমোভক্তিরসার্ণব নামে দুইখানি গ্রন্থ ও অনেকগুলি কীর্ত্তনের পদ রচনা করেন। এই গ্রন্থমধ্যে কবি স্থানে স্থানে স্বরচিত ও নানা শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকসমূহ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণভক্তিরস-কদম্ব গ্রন্থ কবি নিজহস্তে তুলোট কাগজে লিখিয়াছেন। উহা দুই শত পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পুস্তকখানি মঙ্গলডিহীতে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির অন্তে এইরূপ লিখিত আছেঃ—

"শ্রীরূপের লিখন গ্রন্থ বৈষ্ণব মুখে শুনি
তাহার আভাস কিছু ভাষাতে বাখানি।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য
অভিরাম সুন্দরানন্দ সর্ব্বগুণবর্য্য
শ্রীপর্ণগোপাল প্রভু গোপালচরণ—
যাঁর পদে কায়মনে লইলাম শরণ—
কৃষ্ণভক্তি-রসকদম্ব-শ্রবণে উল্লাস
কাতরে বণিলা এই নয়নানন্দ দাস।"

গ্রন্থ-সমাপ্তি-প্রসঙ্গে নিম্ন লিখিত কবিতা লিখিত আছে—

"যুগ্মবাণ ঋতু চন্দ্র শকে পরিগণি।
বৃষরাশি গত ভানু মাস তাহে জানি ॥
ভূমি-পুত্রবারে তথা কুহুতিথিশেষে।
হইলেন গ্রন্থ সাঙ্গ পঞ্চম দিবসে ॥
সেনভূমমধ্যে মঙ্গলডিহি গ্রাম।
শ্রীপর্ণিগোপাল প্রভু যাহাতে বিশ্রাম ॥
ঠাকুর পানুয়া সেবা শ্রীশ্যামসুন্দর।
'বলরাম চন্দ্র' প্রভু রসিকনাগর ॥
সে মূর্ত্তি দেখিতে ভক্তের বাড়ে প্রেমরঙ্গ।
সেই স্থানে রহি গ্রন্থ হইল সাঙ্গ।
কৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব শ্রবণে উল্লাস।
কাতরে বর্ণিলা এ নয়নানন্দ দাস ॥"

অর্থাৎ ১৬৫২ শকাব্দার ৫ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার শুক্রপ্রতিপদে (১) উক্ত কৃষ্ণ-ভক্তি-রসকদম্ব লিখিত। নয়নানন্দ-কৃত রসকদম্বের অনুক্রমণিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা হইতেই গ্রন্থরচনার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

"এবে কহি গ্রন্থের অনুক্রমসূত্র।
যেবা যেই প্রকরণে হয়েছেন উক্ত ॥
প্রথমে প্রকরণে হৈলাম মঙ্গলাচরণ।
গুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণব বন্দনারূপ হন ॥
সর্ব্ব আরাধনা পর কৃষ্ণের অর্চ্চন।
মনে সম্বোধিয়ে প্রশ্ন প্রথম প্রকরণ ॥ (১)
শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় হয় জগতের প্রীতি।
ভক্তবশ ভগবান্ অভক্ত নিন্দা তিথি ॥
কৃষ্ণাশ্রয় বিনে ভবসিন্ধু নহে পার।
দ্বিতীয় প্রকরণে হইল তাহার বিচার ॥ (২)
বাল্যারভ্য কৃষ্ণসেবা বিষয়াবিষ্ট ত্যাগ।
অনাশ্রিত পশুতুল্য ইত্যাদি বিভাগ ॥
ইন্দ্রিয় থাকিতে যে ইন্দ্রিয়হীন জন।
ভক্তি শ্রেষ্ঠ তৃতীয়ে হৈল নিরূপণ ॥

বঙ্গাব্দা সন ১১৩৭ সাল খঃ ১৭৩০।

অকামা সকামা ভক্তি কৃষ্ণভক্তিবাণ।
অবিনাশী কৃষ্ণদাস তৃতীয়ে সকল॥ (৩)
চতুর্থ সাধন ভক্তি বৈধীর কথন।
উত্তম মধ্যম ভক্ত তটস্থলক্ষণ॥ (৪)
পঞ্চমে চতুঃষষ্টি ভক্তাঙ্গলক্ষণা। (৫)
ষষ্ঠে সেবা নাম আদি অপরাধবর্ণনা॥ (৬)
সপ্তমে রাগভক্তি প্রকটা প্রকটলীলা। (৭)
অষ্টমে ভাবভক্তি বর্ণন হইলা॥ (৮)
নবম বিভাগ সূত্র পূর্ণতিরতম।
ধীরোদাত্তাদি তথা নায়ক-কথন॥ (৯)
নিত্যসিদ্ধ্যাদি ভক্তি লক্ষণা নবমে।
দশমে অনুভাব তথা সাত্বিক কথনে॥ (১০)
ব্যভিচারি কহিলাম প্রকরণ একাদশে। (১১)
স্থায়ী ভাব কথন হইয়াছেন দ্বাদশে॥ (১২)
ত্রয়োদশে মুখ্য ভক্তি-রস-নিরূপণ।
শান্ত দাস্য পর্য্যন্ত তাহাতে লিখন॥ (১৩)
চতুর্দ্দশে সখ্য ভক্তিরসের বিচার। (১৪)
পঞ্চদশ প্রকরণে বাৎসল্যের সার॥ (১৫)
ষোড়শ সপ্তদশে উজ্জ্বল বর্ণন।
এইতো কহিল ইনি শাস্ত্র অনুক্রম॥* (১৬।১৭)

গোকুলানন্দের পুত্র জগদানন্দ সংস্কৃত ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন এবং পিতার ন্যায় সুকবি হইয়া পিতৃগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পিতৃব্য-প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠী জগদানন্দের হস্তে আসিলে তাঁহার যশঃ-সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং সেই যশোগানে আকৃষ্ট হইয়া নানা স্থান হইতে বিদ্যার্থিগণ আগমন করিয়া তাঁহার নিকট বিদ্যালাভ করিতেন। জগদানন্দ 'শ্যামচন্দ্রোদয়' নামক নাটক কবিতাচ্ছন্দে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তদ্রচিত একটি গান উক্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল :—

আরতি করে নন্দরাণী বালকমুখ হেরি,
গাওত নবনাগরী সব রাখাল সকল ঘেরি।

রম্ভাফল ঘৃতপ্রদীপ পুষ্পরচিত আলি,
সুন্দরীগণে হুলোতি দেই শিশুগণ করতালী ॥
রাখি শিঙ্গা বেণু যশোদা মা-ই কোরে নিল দুই ভাই-ই
মাখন দেহি, দেহি ক্ষীর খাওয়ে রাম কানাই-ই।
সকল শিশুর মুখ তুলি যশোমতি চুমো খাওয়ে,
মঙ্গল পুছে নন্দঘোষ জগদানন্দ গাওয়ে ॥

নয়নানন্দের পৌত্র ব্রজানন্দ। ইনি পিতামহের ন্যায় সুগায়ক ছিলেন ও ঐরূপ সঙ্গীত-রচনায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। ব্রজানন্দ কীর্ত্তনের পদ রচনা করিয়াছিলেন। জগদানন্দের পৌত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর রামচন্দ্রোদয় নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন. তাহার একটি শ্লোক নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

"রামে মরকতশ্যামে জানকী কনকীলতা।
নবীনজলদারম্ভে ঘনে সৌদামিনী যথা ॥"

জগদানন্দের একটি পৌত্রের নাম শ্যামসুন্দর, তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং পূর্ব্ব পুরুষের ন্যায় তিনিও চতুষ্পাঠীতে অনেক বালককে বিদ্যাদান করিতেন।

পর্ণীগোপালের বর্ত্তমান বংশধরগণ শ্রীশ্যামচাঁদকে ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনা করিয়া থাকেন এবং প্রতি বৎসর রাসের সময় মঙ্গলডিহিতে একটি বাৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বীরভূমের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই লতাগুল্ম-শোভিতা ও পর্ব্বত-পরিবেষ্টিতা বীরভূমি যথার্থই একদিন বীরগণের আবাসস্থান ছিল। এতদ্ব্যতীত বীর অর্থে শ্রেষ্ঠ, এই শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আলোচনা করিলেও জানা যায় যে. এই বীরভূমি একদিন বীরত্বে, কবিত্বে, বিদ্যায়, সাধনায়, সর্ব্ব বিষয়ে সমগ্র বঙ্গদেশের এমন কি অনেক বিষয়ে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আমরা হতভাগ্য স্বার্থান্ধ হইয়া পাগলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান, নিমিষের জন্যও একবার আমাদের বীরভূমের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার অবকাশ পাই না, তাই অনুসন্ধানের অভাবে আমাদের গৌরবান্বিত বীরভূমে কত গৌরব লুক্কায়িত এবং কত রত্ন বিস্মৃতির অতল জলে নিমজ্জিত হইয়াছে, তাহা জানিতে বা জানাইতে পারি না। আজ যে মঙ্গলডিহির পূর্ব্ব গৌরব লইয়া পাঠকগণের সমক্ষে ধরিলাম, এইরূপ কতশত গৌরব এইরূপ কত শত মঙ্গলডিহির নিভৃত পত্রকুটীরে ধ্বংসস্তূপে জর্জ্জরীভূত, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

পরিশিষ্ট

মঙ্গলডিহি-কাহিনী।

"জয় জয় ভকত বৎসল শ্যামচাঁদ।
পূর্ব্বে নন্দের গৃহে "বোঝা" কভু নাহি বহে
পানুয়ার পিরীতে বহে পান॥
গঙ্গার পশ্চিম পাশে ষোল ক্রোশ রাঢ়দেশে
বক্রেশ্বরের পূর্ব্বে স্থিত।
তার মধ্যে এক স্থান মঙ্গলডিহি নামে গ্রাম
শ্যামচাঁদ সঙ্গে বিরাজিত॥"

(শ্যামচন্দ্রোদয়, ঠাকুর জগদানন্দ)

মঙ্গলডিহি নামের ব্যুৎপত্তি

মঙ্গলডিহি নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে জানা গিয়াছে যে, এই গ্রামের রায় উপাধি-ধারী ব্রাহ্মণবংশ অতি প্রাচীন, এখনও এই বংশের দুই একজন বর্ত্তমান রহিয়াছেন। গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে ইঁহাদের বাসস্থানের বিপুল ধ্বংসাবশেষ আজিও রায়পাড়ার অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বমঙ্গলাদেবী গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীস্বরূপে আজিও পূজিতা হইতেছেন। গ্রাম-দেবতা মঙ্গলচণ্ডী দেবীর নামানুসারে গ্রাম "মঙ্গলডিহি" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই রায়বংশের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির, জনার্দ্দনের মন্দির এবং কালী ও দুর্গামন্দিরের ধ্বংসাবশেষ তাঁহাদের উদার ধর্ম্মানুরাগের পরিচয়স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। জনার্দ্দনের মন্দির বিগ্রহশূন্য; শুনিতে পাওয়া যায়—মন্দিরের হৈম-বিগ্রহ দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল। রায়বংশের প্রদত্ত দেবোত্তর-সম্পত্তির আয়ে আজিও দেবতাগুলির নিত্য পূজা হইয়া থাকে। দুর্গোৎসব বিলুপ্ত হইয়াছে; তবে শ্যামাপূজা এখনও একরূপে চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীপর্ণিগোপাল ঠাকুর

মঙ্গলডিহি গ্রামের পূর্ব্বাংশে স্থিত পুরিয়া পুষ্করিণীর কদম্বখণ্ডীর ঘাটে পর্ণিগোপাল ঠাকুর শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর কর্ত্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। সেই সময় প্রায় দ্বাদশ দিবসব্যাপী মহোৎসবে নানাস্থান হইতে সমাগত বহুবৈষ্ণব সংকীর্ত্তনানন্দে মঙ্গলডিহি পবিত্র করেন। এই ঘটনার স্মৃতি রক্ষার্থ আজিও নন্দোৎসবের দিন তাল, নারিকেল ইত্যাদি লইয়া আমোদ-উৎসবের পর পুরিয়াতে স্নান

মোর পূর্ব্ব ঠাকুরাণী দিয়াছেন অন্ন আনি
রামকৃষ্ণ করয়ে ভোজন।
সেই বংশে জন্ম মোর সেই ব্রজপুরে ঘর
কেন না পাইব দরশন ॥"

এই ভাবিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া যমুনার আরাধনা করিতে থাকেন। যমুনা সন্তুষ্টা হইয়া স্বপ্নাদেশ দেন—

"অচিরেই তুমি প্রভুর দর্শন পাইবে"

"কিন্তু বিগ্রহরূপে প্রভুর দর্শন পাবে
এবে নাহি লীলার প্রচার।
ব্রজের দ্বাদশ বন করি বুল পর্য্যটন
পাবে হরি শ্রীনন্দকুমার ॥"

ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে ব্রজের গোপেশ্বর মহাদেবের নিকট হইতেও তিনি এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং হৃষ্টচিত্তে তিনি শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই দ্বিজ এক নিভৃত নিকুঞ্জে এই শ্যামচাঁদ বিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন এবং বিগ্রহসহ কাম্যবনে গমন করেন; সেই অবধি তাঁহারা একাশীতি পুরুষ বিগ্রহসেবা করিয়া বৈকুণ্ঠ-ধাম গমন করিয়াছেন।

"আমি অবশেষ করিয়া সন্ন্যাস
বিদেশ ভ্রমিয়া ফিরি।
পিতৃ-পুরুষের 'সেবাটি' আছিল
তাহাত ছাড়িতে নারি" ॥ (১)

পরবর্ত্তী বিবরণ পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে।

শ্যামচন্দ্রোদয়ে লিখিত আছে, তীর্থপ্রত্যাগত সন্ন্যাসী পানুয়ার নিকট হইতে শ্যামচাঁদকে লইয়া গিয়া গ্রাম হইতে দুই ক্রোশের বেশী আর যাইতে পারেন নাই। রাত্রিযোগে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া পুনরায় মঙ্গলডিহিতে শ্যামচাঁদকে পানুয়ার নিকট ফিরাইয়া দিতে আসেন। এদিকে উষাকালে স্বপ্নাদিষ্ট পণিগোপাল ও শ্যামচাঁদ অন্বেষণে গমন করেন, পথিমধ্যে গ্রামের উত্তরপূর্ব্বকোণে উভয়ের যে স্থানে সাক্ষাৎ হয়, সেই স্থানে রাসমঞ্চ দোলমঞ্চ ইত্যাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। রথযাত্রা, রাসযাত্রা প্রভৃতি উৎসব রজনীতে আজিও "বনভোজনের" জন্য প্রভুকে

(১) ক্রমে-ক্রমে পূর্ব্ব-প্রবন্ধে কাম্যবন-স্থলে নৈমিষারণ্য লিখিত হইয়াছে।

তথায় লইয়া যাইতে হয়। শ্যামচাঁদকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীশ্রীপর্ণিগোপাল ও লক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণী নিম্নোক্তরূপ প্রার্থনা করেন।

"......শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া, ।

চরণে ধরিয়া বলে কোনও অপরাধ ছলে
আর কভু না যাবে ছাড়িয়া॥
আজি হৈতে আর মোরে না ছাড়িবে মন্দিরে
নিজ গুণে থাক পূর্ব্বাপর।
যার অপরাধ পাবে তাহার দমন দিবে
তবু মোর না ছাড়িবে ঘর॥
যাজক সেবক হলে যদি অন্য স্থানে গেলে
পশ্চাতে আসিবে এই ঘরে।
পূর্ব্বে ব্রজে ম্লেচ্ছ ভয়ে মন্দির ত্যজিয়ে গিয়ে
আবার আসিলে ব্রজপুরে॥
চিন্তামণি তুমি সেহ আমার সামান্য গেহ
ভয় লাগে পাছে বা ছাড়িবে।
আমার অবিদ্যমানে যদি কোনও জ্ঞানহীনে
সেবা করে ঘৃণা না করিবে॥"

শ্যামচন্দ্রোদয়ের রচনা স্থানে স্থানে কবিত্বপূর্ণ, বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিতে বিরত রহিলাম।

(শ্যামচাঁদের সেবার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ পর্ণিগোপাল ঠাকুর মঙ্গলডিহিতে বারুই-জাতির বসতি ও পানের বরুজ স্থাপন করেন। ইনি নিজেই পানের ব্যবসায় করিতেন। মঙ্গলডিহিতে আজিও পানের বরুজ বর্ত্তমান রহিয়াছে।)

গোকুলানন্দের একটী গান--

"নবীনঘনসারাভং শ্যামপীতপট্টাবৃতং
রত্নপালঙ্কমধ্যস্থং সুষুপ্তং তৎ বিচিন্তয়েৎ।

উঠ বাপু ওরে নন্দের নন্দন প্রভাত হইল রাতি।
অঙ্গনে দাঁড়াঞে রঞাছে সকল বালক তোমার সাথী॥
মুখের উপর মুখখানি রাখি ডাকয়ে যশোদা রাণী। কবি গোকুল-চন্দ্র
কত সুখ পেঞা ঘুমায়েছ তুমি আমি কিছুই না জানি॥

নয়ন মেলিয়া দেখহ চাহিয়া উদয় হঞাছে ভানু।
ছিদাম সুদাম ডাকে ঘনে ঘন উঠ ভেঁইয়া ওরে কানু॥
অঙ্গমোড়া দিয়া উঠিলা সত্বরে সুন্দর যাদব রায়।
বদন ধুইতে গোকুলচন্দ্রহি জলঝাড়ি লয়ে ধায়॥"

নয়নানন্দের কৃষ্ণভক্তি-রসকদম্বের সঙ্ক্ষেপতঃ পরিচয় পূর্ব্ব প্রসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে (২) এ স্থলে তাহার একটী গান ও তৎবিরচিত "প্রেয়োভক্তি রসার্ণবের" শেষাংশ মাত্র উদ্ধৃত হইতেছে।

গীত

কবি নয়নানন্দ

"উঠ গোপাল প্রাতঃকাল মুখ নেহারি তের
রজনী অবসান ভেঁই কাম ভেঁই মের
উঠতো ভানু দেখতো কানু রজনী গেই দূর
বালক সঙ্গে মেলতরঙ্গে রৌহিণেয় বলবীর
এই শ্রীদাম দাম সুদাম সঙ্গীগণ তের
পুরতো বেণু ধাওতো ধেনু আঙ্গিনা ভরল মের
নন্দরাণী পাসারি পানি বালক লেই কোর
মুখ নেহারি দুঃখ বিসরি (আজি) কিয়ে সুখ জানি ওর
শ্যামচন্দ্র চন্দ্র উদিত নাশল হৃদি ঘোর
হেরিয়া বয়ান কহিছে নয়ান উঠ কানাই মোর॥"

প্রেয়োভক্তিরসার্ণবে গ্রন্থসমাপ্তিসূচক নিম্নলিখিত কয়ছত্র কবিতা লিখিত আছে—

"শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রন্থ দর্শন করিয়া।
ভাবাচ্ছন্দে লিখিলাম কাতর হইয়া॥
আমি অতি ক্ষুদ্রমতি বিষয়ী দুরাচার।
গ্রন্থ বর্ণিবার শক্তি কি আছে আমার॥

(২) মঙ্গলডিহি ঠাকুরবাড়ীর সুযোগ্য পুরোহিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় মহাশয় "কৃষ্ণভক্ত রসকদম্ব" গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়া বীরভূমি-সম্পাদক কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি,এ, মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করেন। ইঁহাদের যত্নে গ্রন্থখানি ধারাবাহিকক্রমে বীরভূমিতে মুদ্রিত হইতেছে। নয়নানন্দের স্বহস্তলিখিত এই গ্রন্থখানি প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীগুরুর অনুগ্রহ বৈষ্ণব করুণা।
বিন্দু পাঞী ভাষাচ্ছন্দে করিলাম বর্ণনা ॥
মোর ইষ্ট হন প্রভু গোপালচরণ।
তাঁর পাদপদ্ম শিরে করিয়া ধারণ ॥
তাঁর আজ্ঞাবলে লিখি আমি ক্ষুদ্র হৈঞা।
সেই প্রভু আজ্ঞা কৈলা সদয় হইঞা ॥

তাঁহার আরাধ্য হন প্রভু কানুরাম, তাঁহার ইষ্ট শ্রীহরিচরণ আখ্যান।
তেঁহো পানুয়া গোপালের অতি প্রিয় হন, পানুয়া গোপাল হন গোপালের গণ।
তাঁহার মহিমা খ্যাত আছে সর্ব্ব জনে, ব্যাঘ্রে হরিমন্ত্র দিলা যে প্রভু কাননে।
খোনকারের থানা অন্ন কৈল পুষ্পময় যাকে স্পর্শি চোরগণ পথে অন্ধ হয়।
কি কহিব আমি সেই গোপাল মহিমা, সুন্দরের কৃপাস্পদ তাহার করুণা।
রামকৃষ্ণ প্রিয়সখা রত্নভানু সুত, কলিযুগে শ্রীযুত সুন্দর বিখ্যাত।

* * * *

এ দাস নয়নানন্দ গোপালের কিঙ্কর, শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র জ্যেষ্ঠ সহোদর।
তাঁহার আশয় সূত্র কতক দেখিয়া, এই গ্রন্থ লিখিলাম প্রচার করিয়া ॥

"শকে রসবাণ কাল শশিনি পরিমিতে শেষ গ্রন্থ ॥

১৭৫৩ শকাব্দায় অর্থাৎ
কৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব রচনা
পরিসমাপ্তির ১ বৎসর পরে } প্রেয়োভক্তিরসার্ণব গ্রন্থ রচনা শেষ হয়।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে জগদানন্দের যে আরত্রিক গানটী উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারই গৌরচন্দ্রিকাটী এস্থলে উদ্ধৃত ইহল—

"শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র জয় জয় মন্দিরে শুভ আরতি।
গৌর অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন মাল্য চম্পক মালতী ॥
হৃদয়ে উলসিত ফিরয়ে শচীমা দেখিয়া নিজ সুত মাধুরী।
রমণী মোহনরূপ দরশন করে নবদ্বীপ-নাগরী ॥
ভাব নিজ নিজ ভক্তবাঞ্ছিত গৌরপ্রেমরসে মাতয়ি।
মধুর কীর্ত্তন প্রেম নর্ত্তন তাল মৃদঙ্গকি বাজয়ি ॥
ভক্ত নব নব প্রিয় সখাগণ গৌর প্রেমরস বর্ষয়ি।
এ রস প্রিয় ঠাকুর সুন্দর জগদানন্দকি গাওয়ি ॥"

মঙ্গলডিহির অতীত গৌরব এখনও নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। প্রভুপাদ

শ্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুর, প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঠাকুর, শ্রীযুক্ত হরিকিঙ্কর ঠাকুর বি, এল, প্রভৃতি মহোদয়গণ পূর্ব্ব গৌরবের শেষ নিদর্শনস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছেন। প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুর মহাশয় মঙ্গলডিহির পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ বিষয়ে আমাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। নয়নানন্দের স্বহস্তে লিখিত "শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব" গ্রন্থ ইহারই নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিকিঙ্কর ঠাকুর বি, এল, মহাশয়ের মত আচারনিষ্ঠ ব্যক্তি আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহার অপরিসীম অনুরাগ। ভাব মধুর, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত রচনায় দক্ষতা তাঁহার অসাধারণ। পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের সহিত বৈষ্ণবোচিত গুণাবলীর সম্মিশ্রণে তাঁহাকে পূজার্হ করিয়া তুলিয়াছে। ইহারই পিতৃদেব প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঠাকুর মহাশয়। জানি না পিতার পুণ্যে পুত্রের উদয় হইয়াছে, না পুত্র সৌভাগ্যে পিতা গৌরবান্বিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরিকিঙ্কর ঠাকুর(৩) মহাশয় বরাটীকা প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বরাটীকার একটী গান—

"জাগহুঁ ব্রজরাজকুমার কানাই মেরা ভাই
নেহারত বোলত কত করে নবনীত মাই।
জাথি যূথী লতা তরু কুসুমিত
মুহুঃ কুহু রবে দিশা মুখরিত,
যমুনাস্নাত মন্দ বাত গন্ধ সাথ বাওয়ই।
মন্থরাগতি ব্রজ আভীরী
যমুনাপন্থে কাঁখে গাগরি
রে রে-কা-কানাই ভা-ভা-ভাই শিঙ্গা বাজত বলাই,
মথিতামৃত পয়োধি চন্দ
নিশি উপবাসী নয়নদ্বন্দ্ব
কিঙ্কর ভণে দেরে দরশনে জীবন কানাই।

(৩) শ্রীযুক্ত হরিকিঙ্কর ঠাকুর বি, এল, মহাশয় প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ অতি সততার সহিত হেতমপুর রাজষ্টেটের ম্যানেজারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন।

জোফলাই-কাহিনী

বীরভূমের অন্তর্গত দুবরাজপুর থানার অধীনে জোফলাই একটি গ্রাম। ইহার লোকসংখ্যা ৬৫১ ছয় শত একান্ন মাত্র। এই গ্রামে ব্রাহ্মণ, গ্রহাচার্য্য, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, বৈষ্ণব, কর্ম্মকার, মোদক, তন্তুবায়, নাপিত, সূত্রধর, কলু, ধীবর, বাগ্দী, ডোম ও বাউরী প্রভৃতি জাতির বাস। জনসংখ্যা দৃষ্টে সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, গ্রামখানি অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য, এখানে গগন-চুম্বিনী পর্ব্বত-মালা নাই, এ স্থানে লতাগুল্ম ও বিটপীরাজি-সুশোভিত নির্ম্মল নির্ঝরিণী মধুর কুলু কুলুনাদে মনঃপ্রাণ মাতাইয়া তুলে না, সুদূরব্যাপী অরণ্যের শ্যাম-শোভা নয়নপথে পতিত হয় না, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের উৎকৃষ্ট সামগ্রী বৈদ্যুতিক আলোকমালা এই নির্জ্জন গ্রামকে উদ্ভাসিত করে না, অথবা গমনশীল বাষ্পীয়-যানের গুরুগম্ভীরনাদে এই ক্ষুদ্র গ্রাম নিনাদিত হয় না। এ স্থানে বিস্তৃত রাজবর্ত্ম বা স্ফটিকময়ী সুরম্যসৌধমালা নাই। এইরূপে যদিও সকল প্রকার প্রাকৃতিক ও পার্থিব সুখে জোফলাই গ্রাম বঞ্চিত, তথাপি ইহা পারত্রিক পুণ্য-স্মৃতির নিদর্শনে পরিপূর্ণ, পার্থিবতার লেশমাত্র না থাকিলেও আধ্যাত্মিকতা একদিন এ স্থানে পূর্ণভাবে বিরাজমান ছিল। প্রাকৃতিক শোভায় সমুজ্জ্বল না হইলেও পরমভক্ত বৈষ্ণবগণের প্রেমময় অন্তর্নিহিত স্বর্গীয় শোভায় ইহা একদিন দ্যুতিমান্ ছিল, মনোবিজ্ঞানের বিচিত্র আলোকে সমালোকিত ছিল। আজিও সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ ঠাকুরের সৌরভময়ী প্রেমভক্তি-মিশ্রিত অপার্থিব-স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া সদম্ভে বিরাজমান থাকিয়া এই ক্ষুদ্র পল্লী জন-সমাজে পরিচিত হইতে সমর্থ হইয়াছে। তাই বলি, কলিকাতা প্রভৃতি মহানগরীর তামসিক, রাজসিক ভাব লইয়া ইহা সকলের নিকট পরিচিত নহে, কেবল পবিত্র প্রেমাধার-রূপে, সাত্ত্বিক ভাবের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত লইয়া ইহা সাধারণে সুপরিচিত। এখনও বৈষ্ণবগণ ভক্ত-চূড়ামণি বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ-ঠাকুরের সুমধুর লীলা-নিকেতন এই জোফলাই গ্রামের নামোচ্চারণকালে রোমাঞ্চিত হয়; নয়নে প্রেমাশ্রুর উদয় হইয়া থাকে।

আমরা সেই প্রভু-পাদের বংশ ও আত্ম-পরিচয় নিম্নে প্রদান করিতে যত্নবান্ হইলাম।

বড় দুঃখের বিষয়, পূর্ব্বে আমাদের ভারত ঢক্কার দ্বারা আত্ম-পরিচয় সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লজ্জা বোধ করিত। আত্ম-পরিচয় অতি সন্তর্পণে গোপন করিয়া জন-সমাজে উপস্থিত হওয়া হিন্দুগণের চির-প্রচলিত রীতি ছিল, সেই জন্য আমাদের অমূল্য রত্নের বিস্তৃত বিবরণী লাভ করা অতি কঠিন হইয়াছে।

যাহা হউক, জনশ্রুতি, প্রবাদ ও সেই মহাত্মার রচিত গ্রন্থ অবলম্বনে জগদানন্দের জীবনী লিখিতে প্রয়াস পাইলাম।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম প্রিয়-ভক্ত শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি ও মুকুন্দ। ইঁহারা জাতিতে বৈদ্য, উপাধি সরকার। ইঁহাদিগের পিতার নাম নারায়ণ সরকার। গৌরাঙ্গমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর যখন নবদ্বীপে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ চর্চ্চা আরম্ভ হয়, সেই সময় কনিষ্ঠ নরহরি বিদ্যালাভের জন্য নবদ্বীপ গমন করিয়াছিলেন, তিনি তথায় প্রেমময় গৌরাঙ্গের অপরূপ রূপ দর্শনে ও মধুর প্রেম-রসে আপ্লুত ও মুগ্ধ হইয়া প্রাণ-মন তাঁহারই চরণে অর্পণ করেন। তিনি গৌর-রসে মুগ্ধ হইয়া আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। (১) জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ গৌড়াধিপতির চিকিৎসক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ক্রমে জ্যেষ্ঠ সমস্ত বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠের নিত্য সুখময় সরল প্রেম-পথ অবলম্বন করিয়া ধন্য হইলেন। মহাত্মা মুকুন্দ, ঐহিক পত্নী-প্রেমে পারত্রিক ঈশ্বর-প্রেম বিস্মৃত হইয়া যাইবেন, আনন্দময় ঈশ্বর-প্রেমের প্রবলাকাঙ্ক্ষা দূরীভূত হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় দার-পরিগ্রহে নিতান্ত বিমুখ ছিলেন, পরে মহাপ্রভুর আদেশানুসারে বিবাহ করেন। কিয়ৎকাল গতে রঘুনন্দন নামে তাঁহার এক পুত্রের জন্ম হয়। পদ্মরাগ-আকরে পদ্মরাগেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে, রঘুনন্দনও পিতার অনুরূপ পুত্র হইলেন। প্রেম ও ভক্তি-গুণে ইনি মহাপ্রভুর এরূপ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন যে, সকলে তাঁহাকে প্রভুর বরপুত্র বলিত। রঘুনন্দনের প্রেম ও ভক্তি জন্মাবধি অচল ও অটল ছিল। কথিত আছে, একদা মুকুন্দ কোনও কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমনকালে তদীয় পুত্রকে শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ জীউর মাধ্যাহ্নিক ভোগ দিবার জন্য আদেশ দিয়া যান। রঘু তখন দশম বর্ষের বালক; পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া স্নানাহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক যথাসময়ে ঠাকুরের ভোগের মন্দিরে গমন করিলেন এবং প্রভুকে জোড় হস্তে ভোজন করিবার জন্য অনুরোধ

(১) ইনি নীলাচলে চৈতন্যদেবের অতি অনুরক্ত সঙ্গী ছিলেন। নরহরি বৈষ্ণব-কবি লোচন দাসের গুরু ও চৈতন্য-মঙ্গল রচনার উপদেষ্টা ছিলেন। নরহরি গৌরলীলার পদ-রচনার প্রবর্ত্তক। তিনি ১৫৪০ খৃঃ অব্দে গুপ্ত হন।

করিতে লাগিলেন। বিগ্রহদেব কাহারও সাক্ষাতে ভোজন করেন না, বালক রঘুনন্দনের তাহা জানা ছিল না। সেই জন্য সেই সরল-হৃদয় বালক বার বার গোপীনাথ জীউকে খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভু বালকের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার চিরাভ্যস্ত উদাসীন ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক চুপ করিয়া রহিলেন। তখন বালক ভয়-বিহ্বল চিত্তে কাঁদিয়া বলিলেন, "যদি প্রভু বালক বলিয়া তাচ্ছিল্য করিয়া ভোজন না করেন, তাহা হইলে তাঁহার পিতা নিশ্চয় মনে করিবেন যে, পুত্র প্রভুকে ভোজন না করাইয়া খেলাইয়া বেড়াইয়াছে এবং সে জন্য তাঁহাকে পিতার নিকট তিরস্কৃত ও দণ্ডিত হইতে হইবে। বালকের ঐকান্তিক ভক্তি ও ভালবাসা দেখিয়া ভক্ত-বৎসল আর উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। প্রভু নিজহস্তে রঘুনন্দনের অশ্রু-মার্জ্জনা করিয়া প্রত্যক্ষরূপে বালক-দত্ত আহারীয় দ্রব্যসকল ভোজন করিয়াছিলেন।

দিবাবসানে পিতা মুকুন্দ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া আরতির সময় দেখিলেন, প্রভুর হস্তে ভোজনাবশেষ লাগিয়া রহিয়াছে। দেখিয়াই তিনি মনে করিলেন, বালক রঘুনন্দনই এই সমুদায় অনর্থ ঘটাইয়াছে; সেবাপরাধে ভীত হইয়া মুকুন্দ পুত্রকে ডাকিয়া ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। বিনা কারণে পিতার দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া তিনি আদ্যোপান্ত ঘটনা পিতৃ-চরণে জ্ঞাপন করিলেন। তখনও রঘু মিথ্যা কথা বলিতেছে এই বিশ্বাস করিয়া মুকুন্দ তাঁহাকে আরও তিরস্কার করিতে লাগিলেন। রঘু তখন নিরুপায় হইয়া রাত্রির শীতলভোগও প্রভুকে খাওয়াইবেন এই বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

যথাসময়ে রঘুনন্দন রাত্রির ভোগ ৺গোপীনাথ জীউর সম্মুখে রক্ষা করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রভুকে ভোজন করিবার জন্য অনুরোধ ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ভক্তাধীন ভক্তের ক্রন্দনে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া স্বহস্তে পুনরপি ভোজন করিলেন। মুকুন্দ প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া দূর হইতে সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন, ভক্ত-চূড়ামণি ছুটিয়া গিয়া পুত্র-রত্নকে ক্রোড়ে তুলিলেন ও বার বার সস্নেহে শিরশ্চুম্বন করিতে লাগিলেন।

সেই অবধি পিতা-পুত্রের প্রেম-ভক্তি উত্তরোত্তর প্রগাঢ় হইতে লাগিল। মহাপ্রভু তাঁহাদের ভক্তির পরাকাষ্ঠা সন্দর্শনে সংকীর্ত্তনে সর্ব্বাগ্রে রঘু-নন্দনকে মালা-চন্দন দিতেন। তদবধি তদ্বংশীয় ঠাকুরগণ কীর্ত্তনে উপস্থিত থাকিলে তাঁহারাই অগ্রে মালা-চন্দন পাইয়া থাকেন।

এই পরম-ভক্ত শ্রীরঘুনন্দনের বংশে কবিবর জগদানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। জগদানন্দের পিতামহের নাম পরমানন্দ ও পিতার নাম নিত্যানন্দ। জগদানন্দের সর্ব্বানন্দ, কৃষ্ণানন্দ ও সচ্চিদানন্দ নামক তিন সহোদর ছিলেন। জগদানন্দের পিতা শ্রীখণ্ড ত্যাগ করিয়া রাণীগঞ্জের অন্তর্গত আগরডিহি দক্ষিণ খণ্ডে বাস করেন; এবং জগদানন্দও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ভ্রাতৃগণ হইতে পৃথক্ হইয়া জোফলাই গ্রামে বাস করিয়াছিলেন।

জগদানন্দের আবির্ভাবকাল নির্দ্দিষ্টরূপে নির্ণীত নাই। কিন্তু তাঁহার তিরোভাবের সময় নির্ণীত আছে। শ্রীখণ্ড-নিবাসী বংশধরগণের নিকট হইতে জানা যায় যে, ১৭০৪ শকাব্দার ৫ই আশ্বিন (১৭৮২ খৃঃ) বামন দ্বাদশীর দিনে কবিবর স্বর্গগত হন। এই উপলক্ষে প্রতি বৎসর একটি মহোৎসব হইয়া থাকে, ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, জগদানন্দ ১৭০৪ শকের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। এতদঞ্চলের প্রাচীন লোকের মুখে শুনা যায় যে, প্রবীণ অবস্থায় কবিবরের মৃত্যু হয়। সেই হিসাব ধরিয়া শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ (১) তাঁহার অশীতিবর্ষ বয়সে মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করেন এবং প্রবাদবাক্যও উক্ত অনুমানের সমর্থনকর; সুতরাং ১৬২৪ শক বা তন্নিকটস্থ সময়ে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে।

জগদানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি এক দিন স্বপ্নে মহাপ্রভুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সেই প্রেম ও রূপ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন; এই সময় কবিবর "দামিনী দাম" ও "গৌর-কলেবর" নামক দুইটি পদ রচনা করেন, যথা—

(১)

"দামিনী-দাম-দমন রুচি দরশনে
দূরে গেও দরপকি দাপ
শোন কুসুম তাহে কোন গণিয়েরে
প্রাতর অরুণ-সন্তাপ
গোরারূপের যাঙ বলিহারি
হেরি সুধাকর মুরছি চরণ-তলে
পড়ি দশনখ রূপধারী

(১) "জগদানন্দ-পদাবলীর" প্রকাশয়িতা।

সুবরণ, বরণ হেরি নিজকুবরণ
মানি আপন মনতাপে,
নিজ তনু জারি ভসম সম করইতে
পৈঠল আনল সন্তাপে
যো সম বিধিক অধিক নাহি অনুভব
তুলনা দিবারে নাহি ঠোর
জগদানন্দ কহে পহুঁক তুলনা পহুঁ
নিরুপম গৌরকিশোর ॥

(২)

গৌর-কলেবর মৌলি মনোহর
চিকুর ঐছে নেহারি
জনু, হেম মহীধর-শিখরে চামর
দেই উর পর ডারি ॥
পীন উর উপনীত কৃত উপবীত
সীতিম রঙ্গ
জনু, কনয়া ভূধর বেঢ়ি বিলসই
সুর-তরঙ্গিনী-সঙ্গ
আধ অম্বর আধ সম্বর
আধ অঙ্গ সুগৌর
জনু, জলদ সঞে অতি বাল রবি ছবি
নিকশে অধিক উজোর
জগত আনন্দ পহুঁক পদনখ
লাখই ঐছন ছন্দ
জনু, মীনকেতন করু নির্ম্মঞ্ছন
চরণে দেই দশচন্দ ॥

কথিত আছে, স্বপ্নে মহাপ্রভুর রূপ দর্শন করিয়া তিনি জোফলাই গ্রামে উক্ত মূর্ত্তির সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন (১) সেই বিগ্রহ অদ্যাপি বিরাজিত আছেন। পতিত ও ধর্ম্মত্যাগী ব্যক্তিগণকে সানন্দে কোল দিয়া স্বধর্ম্মে আনয়ন করা জগদানন্দের জীবনের একটি প্রধান ব্রত ছিল। প্রেম-অনুরাগ ও ভক্তিগুণে জগদানন্দ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ এতদ্দেশে প্রচলিত আছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অতিথি-সেবা তাঁহার জীবনের এক প্রধান ব্রত ছিল, নিত্য কত সাধু-বৈষ্ণব-ভিখারী তাঁহার দ্বারা আপ্যায়িত হইতেন। এক সময়ে পশ্চিমদেশীয় কতকগুলি সাধু তথায় উপস্থিত হয়েন এবং পথশ্রমে কাতর হইয়া ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠিত কূপের জল পান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে জোফলাই গ্রামে কূপ ছিল না, সেইজন্য জগদানন্দ বড়ই বিব্রত হইয়া যোড়করে মহাপ্রভুকে স্মরণপূর্ব্বক একটি লৌহদণ্ডের দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে পাতাল ভেদ করিয়া স্বচ্ছ সলিলরাশি অনর্গল ধারায় উত্থিত হইতে আরম্ভ করিল, জগদানন্দ তাহা দ্বারা সাধুগণের তৃষ্ণা-নিবারণ করিলেন। এই জলরাশি এখনও সরোবর আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। উহাকে সাধারণে "গৌরাঙ্গ-সায়ের" বলে। জগদানন্দ মহাপ্রভু প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের জন্য সর্ব্বদা দেশ-বিদেশে গমন করিতেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি পঞ্চকোট রাজ্যান্তর্গত আমলালাসুন্দরী নামক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, এখানে আসিয়া একদিন তিনি একটি নির্ম্মল সরোবরের মধ্যস্থলে জল-বেষ্টিত একটি রম্য-দর্শন দ্বীপ দেখিতে পাইলেন। কবিবর এই নির্জ্জন ও মনোহর স্থানটি ঈশ্বরারাধনার উপযুক্ত আশ্রম বিবেচনা করিয়া কাষ্ঠপাদুকা পরিধান করিয়াই সাধনবলে স্বচ্ছন্দে জলের উপর দিয়া সেই দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রত্যহ অদ্ভুত উপায়ে উক্ত দ্বীপে গমন করতঃ নির্জ্জনে ঈশ্বরারাধনায় রত থাকিতেন।

অচিরকালমধ্যে এই ঘটনা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল এবং ক্রমশঃ এই সংবাদ পঞ্চকোট-রাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি তথায় আগমনপূর্ব্বক স্বচক্ষে এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তদবধি হরিভজন করিবার

(১) গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিগ্রহ ভিন্ন এই মন্দিরে রাধিকাবিহীন গোপীনাথ এবং আরও কয়েকটি বিগ্রহ ও বহুতর শালগ্রামশিলা বিরাজমান আছেন। এই গোপীনাথ জগদানন্দ কর্ত্তৃক স্থাপিত কি রঘুনন্দন যে বিগ্রহকে প্রত্যক্ষভাবে ভোজন করাইয়াছিলেন, সেই গোপীনাথ, তাহার নিগূঢ়তত্ত্ব অবগত নহি।

জন্য পঞ্চকোট-অধিপতি জগদানন্দকে আমলালাসুন্দরী গ্রাম দান করিয়াছিলেন। জগদানন্দ ঐ সম্পত্তি তৎপ্রতিষ্ঠিত ৺গোপীনাথ জীউর নামে অর্পণ করেন। গোপীনাথ জীউর সম্পত্তির আয় হইতে জগদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত সকল বিগ্রহের সেবা-পূজা হইয়া থাকে।

সেই অবধি উক্ত বৃহৎ সরোবরটি 'ঠাকুরবান্ধ' নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। কবিবরকে সাধারণে ঠাকুর বলিয়াই ডাকিত, সেই জন্য এই জলাশয়ের নামও ঠাকুরবান্ধ হইয়াছে। তাঁহার অলৌকিক-শক্তির আর একটি পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল। প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহমূর্ত্তির অন্নভোগ একখানি প্রস্তর-নির্ম্মিত পাত্রে হইত, এক দিন তাহা দৈবাৎ পূজারিকর্ত্তৃক ভগ্ন হইলে পূজারি অতি দুঃখিতান্তকরণে ক্রন্দন করিতে থাকেন। জগদানন্দ আগমনপূর্ব্বক ক্রন্দনের কারণ অবগত হইয়া তাঁহাকে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে বলিলেন এবং পাত্রটির ভগ্নখণ্ডগুলিকে একত্র স্থাপন করিয়া তাহাতেই অন্নের ভোগ বিগ্রহসম্মুখে রক্ষা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন পূজারি তাহাই করিলেন এবং পরে দেখিলেন যে, সেই ভগ্ন প্রস্তরনির্ম্মিতপাত্র যুক্ত হইয়া নূতন পাত্রের আকার ধারণ করিয়াছে।

জগদানন্দের এই অলৌকিক শক্তি দেখিয়া অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তান তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও এই বংশের অনেক ব্রাহ্মণ শিষ্য আছেন।

কালিদাস নাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পদাবলীতে প্রকাশ যে, তিনি কবিবরের স্বহস্ত-লিখিত খসড়াপুঁথি, শ্রীখণ্ডবাসী রাধিকানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থভাণ্ডার হইতে পাইয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি "ভাষাশব্দার্ণব" নামক একখানি গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম কবিতার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"কংশকুঞ্জর-কেশরী কর-কুম্ভ করজে বিদার।
করভ করভুজ, কোরে কুলবতী,
করব কেলি বিহার॥
কেলী কলহক, কহব কাহিনী,
কুলজ কামিনীকান্ত।
কি রস কুবুধিনি, কুরূপকুবুজিনী,
কোরে কহরি একান্ত॥

কসিল কাঞ্চন, কাঁতি কামিনি,
কুচহি কাঁচুলি কেলি।
কাল কালিয়, কৃষ্ণ ভুজে কভু,
কহকি কবলিত ভেলি॥
কুসুমকাননে, কুহলে কোকিল,
কুকুহু কুহুকুহু বোল।
কেলি কৌতুক, কুমুদ বান্ধব,
করত কুমুদিনী কোর॥

*   *   *   *

করহ কবিকুল, কণ্ঠে কবিতা,
করিতে মন যদি ধায়।
কৃষ্ণ কৌশল, কাব্য করইতে,
জগত আনন্দ গায়॥

ইতি শ্রীমন্নরহরিচরণাশ্রিতেন কেনচিদ্বিরচিতে
ভাষাশব্দার্ণবে কাদিদিগ্দর্শনো নাম
প্রথমঃ কল্লোলঃ।

এই "ভাষাশব্দার্ণব" নামক অসম্পূর্ণ পুস্তক, সম্পূর্ণ হইয়াছিল কি না তাহা জানিবার উপায় নাই। পুস্তকখানির ২, ৩, ও ৪ সংখ্যক তিনখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে, ইহার এক এক অধ্যায়ের নাম "কল্লোল"। "ভাষাশব্দার্ণব" পুঁথিটিতে প্রথম কল্লোলের শেষ অংশ, দ্বিতীয় কল্লোল সম্পূর্ণ এবং তৃতীয় কল্লোলের প্রথমাংশ আছে।

কবিদিগকে শব্দ সাহায্য করিবার জন্ত তিনি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

উক্ত পুস্তকে মকার, জ. যকার আদি যুক্ত কতকগুলি শব্দ দেখিতে পাওয়াযায়। যথা—

"মঘমান, মেঘ, মুদির, মুখ, মরকতসুন্দর, মৌলি, মাথহি, মল্লী, মালতি, মোতিকমাল" ইত্যাদি; জয়জয়, জয়তি জগজীবন, জপিজপাওত, যুবতি, যুগতি, জীবিত-পতি, জড়জঙ্গম, জগমগ জোতি" ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয় জগদানন্দের কবিতাগুলিকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—সাধারণ, অনুকৃত, বাহ্যচিত্র ও অন্তশ্চিত্র।

"অকরুন পুন বাণ অরুণ, উদিত-মুদিত কুমুদবদন
চমকি চুম্বি চঞ্চরি পদুমিনকি সদনসাজে
কি জানি সজনি রজনী ভোর, ঘঘ ঘন ঘোষিত ঘোর
গত জামিনি, জিতদামিনি, কামিনী কুললাজে ॥

*　　*　　*　　*

এই পদটি সাধারণ শ্রেণীভুক্ত।

"আলিরি, হোতমনহুঁ হুলাশ শুলছন
বাম নিজভুজ উরোজ ঘন ঘন
ফুরই দুর সঞে,　　প্রাণ পিউ কিএ,
অদুর আওব রে।
যবহুঁ পহুঁ পর দেশ তেজব
তবহুঁ বেশ বিশেষ বিভূষণ
সবহুঁ ভাও বরে ॥"

উক্ত পদটি অনুকৃত কারণ সিংহভূপতি কৃত "বেরে পরম প্রেমসজনী" গীতটির অনুকরণে "আলিরি, হেতে মনহুঁ" পদটী রচিত হইয়াছে। এই দুইটি পদের সুর, ছন্দ ও বিষয় সবই এক।

"কিতব কেশব কুশল কি কহব
কনক মঞ্জরী রাই
কি জনি কতিখনে কবহি হো অব
কহিতে আও লুঁ ধাই।"

ইহা বাহ্য-চিত্র-শ্রেণীভুক্ত

"নরহরি নাম অন্তরে আছু ভাবহ" ইত্যাদি

পদগুলি অন্তশ্চিত্র শ্রেণীর অন্তর্গত।

জগদানন্দের কবিতাবলী পাঠ করিলে বুঝা যায় তাঁহার কবিত্ব সাধারণ নহে, তাঁহার গীতমঞ্জরীতে অসামান্য কবিত্ব ও কবিকুলবিজয়িনী অসামান্য শক্তির পরিচয় আছে, কাব্যসমালোচক মাত্রেই তাহা একবাক্যে স্বীকার করিবেন। তাঁহার কবিতার সুন্দর ছন্দোলালিত্যে, মনোহর রচনাচাতুর্য্যে এবং অপূর্ব্ব সজীব চিত্র অঙ্কনের অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে আমরা মুগ্ধ হই; তাঁহার পদাবলী যত বারই পড়ি না কেন, তত বারই এক নূতন নূতন ভাব দেখিতে পাই; তাঁহার এই নিত্য নব নিত্য মধুর অপূর্ব্ব পদাবলী পাঠ করিতে করিতে আমরা যেন এক নূতন

প্রেমরাজ্যে আসিয়া পড়ি, কৃষ্ণপ্রেমে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়। জগদানন্দের কবিতার এরূপ মোহিনী শক্তি যে, তাহার ছত্রে ছত্রে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এরূপ হরি প্রেম তরঙ্গান্দোলিত কারুণ্য-স্রোত প্রবাহিত যে, তাহা একবার পাঠ করিলে পাষাণ-হৃদয়ও গলিয়া যায়, জন্মদুঃখীও ক্ষণেকের তরে শোক-তাপ বিস্মৃত হয়।

তাঁহার মধুময় গীতাবলীর সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রীরাধার অভিসার

"মঞ্জু বিকচ কুসুমপুঞ্জ
মধুপ শবদ গুঞ্জগুঞ্জ
কুঞ্জরগতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল কুলনারী
ঘন গঞ্জন চিকুরপুঞ্জ
মালতী ফুল মালে রঞ্জ
অঞ্জনযুত কঞ্জনয়নী খঞ্জনগতিহারী॥
কাঞ্চনরুচি রুচির অঙ্গ,
অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ
কিঙ্কিনী কর কঙ্কন মৃদু ঝঙ্কৃত মনুহারী॥
নাচত যুগ ভ্রূ-ভুজঙ্গ
কালি-দমন-দমন-রঙ্গ
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে রঙ্গিল নীলসাড়ী
দশনকুন্দ কুসুমনিন্দু
বদন জিতল শরদ ইন্দু,
বিন্দু বিন্দু ছরম ঘরমে প্রেমসিন্ধু প্যারী
ললিতাধরে মিলিত হাস,
দেহ-দীপতি তিমির নাশ,
নিরখি রূপ রসিক ভূপ ভুলল গিরিধারী॥
অমরাবতী যুবতীবৃন্দ,
হেরি হেরি পড়ল ধন্দ,
মন্দ মন্দ হসনানন্দ নন্দন সুখ করি।
মণি মাণিক নথ বিরাজ,
কনক নূপুর মধুর বাজ,
জগদানন্দ থল-জল-রুহ চরণক বলিহারি॥"

কবিবর উক্ত পদের দ্বারা শ্রীরাধিকার নিশাকালে কুঞ্জে অভিসার বর্ণনা করিয়াছেন—কি সুন্দর বর্ণনা! প্রভু জগদানন্দ যেন শ্রীমতীর অভিসার-গমনের এক খানি অবিকল প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন এবং বাক্য-বিন্যাস দেখিলে মনে হয় যে, কোনও সুচতুর মালাকর যেন নানা প্রকার সৌরভময় কুসুম চয়ন করিয়া যে ফুলটি যেখানে দিলে ভাল দেখায়, সেইরূপভাবে মালা রচনা করিয়াছেন।

কবিবর জটিল ও সরল ভাষায় গীত রচনা করিয়াছেন; দেখা যায় উপরি উক্ত পদটিতে অনেকগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ বিন্যস্ত আছে। নিম্নলিখিত গীতটি, সরল ভাষায় রচিত, ঃ—

শুকসারিকাদ্বন্দ্ব।

রাধে জয় জয় বলি এ সারী
নিধুবন ভরি গাজে।
নীলওঢ়নী মুকুট টালনী,
রাকা শশধর বদন জিনি,
চরণ নূপুর মধুর মধুর,
রুনু ঝুনু ঝুনু বাজে॥
শারি বলে শুক তোমারে কই
রূপেতে কিশোরী হইল জই
কানু মনোহরা রাধিকা মুরতি,
পরাভব নটরাজে,
আধার কুঙ্কুম পাশা জলকেলি,
সে সব সমরে তব বনমালী,
জিনিবারে নারে, রাইপদ ধরি,
হারিয়াছে সখীমাঝে॥
আমাদের কিশোরী, রাজার কুমারী,
সব সখীগণ পূজে।
তোমার নাগর, রাখাল খেয়াতি,
সদা থাকে গোঠমাঝে॥

মৃগ পক্ষ আদি যত বৃক্ষ লতা,
নিজরূপ সম করিলা রাধা,
তোমার নাগর, হইল গৌর,
লুকাওল সখীমাঝে।
যেই দিন রাধা করিল মান,
দাশখত লিখি দিয়াছে শ্যাম,
তার সাক্ষী আছে, শুন হে শুক
নিশি শেষে পিক আজে ॥
শুক কহে সারি কি কর দ্বন্দ্ব,
দোঁহে সমগুণে কেবলে মন্দ,
জগদানন্দ, পরমানন্দ,
রসবতী রসরাজে ॥

দ্বাত্রিংশদ্বর্ণাত্মক তারকব্রহ্ম নাম জগদানন্দের এক অপূর্ব্ব রচনা, তাঁহার কবিত্ব, ছন্দোলালিত্য, রচনাকৌশল, শব্দবিন্যাস সকলই অতুলনীয় এবং এবম্বিধ রচনাকৌশলে তিনি পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী সকল কবিগণকে পরাজিত করিয়াছেন।

সাধারণের বিশ্বাস যে, জগদানন্দের পদসংখ্যা স্বল্প। কিন্তু কালিদাস নাথ মহাশয় তাঁহার অনেকগুলি অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন।

কোন কোন লেখক জগদানন্দকে শ্রীনিবাস প্রভুর পার্ষদ জগদানন্দ পণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কেহবা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশীয় রাধামোহন ঠাকুরের পিতা জগদানন্দ বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন কিন্তু শ্রীখণ্ডনিবাসী উক্ত বংশীয়গণ এ বাক্যের আদৌ সমর্থন করেন না এবং কালিদাস নাথ মহাশয় জগদানন্দ লিখিত যে খসড়া বহি পাইয়াছেন তাহাতে লিখিত আছে "খণ্ডবাশিয়া খণ্ড কপালিয়া জগদানন্দ ভাবই" এই পদটীতে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

জগদানন্দের বংশধরেরা অধুনা কেহ জোফলাই গ্রামে নাই। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল চন্দ্রঠাকুর নামক তাঁহার জনৈক বংশধর জোফলাই হইতে শ্রীখণ্ডে চলিয়া গিয়াছেন।

জগদানন্দ প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ সকল অদ্যাপি এই গ্রামে বিরাজিত। পাঠকগণের প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই সকল বিগ্রহের মধ্যে কোনটী প্রথম প্রতিষ্ঠিত।

যদিও তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই, তথাপি আমাদের অনুমান হয় যে, ৺গোপীনাথ জীউকে জগদানন্দ সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করেন, কারণ তিনি আমলালা প্রভৃতি সমস্ত সম্পত্তি উক্ত গোপীনাথ বিগ্রহের নামে দান করিয়া গিয়াছেন। কোনও কারণ না থাকিলে গৌরাঙ্গ-সেবক, জগদানন্দ উক্ত সম্পত্তিসকল মহাপ্রভুর চরণে উৎসর্গ না করিয়া গোপীনাথ জীউর নামে অর্পণ করিলেন কেন? আমাদের মনে হয় যে, মহাপ্রভু-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে জগদানন্দ যে সকল সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা ৺গোপীনাথ জীউর নামে দান করেন; ৺গৌরাঙ্গ-দেবের মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার পর কবিবর আমলালা প্রভৃতি সম্পত্তি যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি একই বিগ্রহ অর্থাৎ গোপীনাথ জীউর নামেই রাখিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে গোপীনাথ কবিবরের দ্বারা সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করি।

বিগ্রহ-মন্দিরের অনতিদূরে নৈর্ঋতকোণে জগদানন্দের বাসবাটীর ভিটা বর্ত্তমান আছে। ভিটার মধ্যে ইষ্টকের কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইজন্য অনুমান হয়, কবিবরের গৃহ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ছিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বামন-দ্বাদশীর দিন ৺ জগদানন্দের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে মহোৎসব হয়। জগদানন্দ পত্নীর তিরোধান উপলক্ষে আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে জগদানন্দের ভিটায় মহোৎসব হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে এখানে আসিয়া কোন অতিথি অভ্যাগত বিমুখ হইতেন না, প্রত্যহ অসংখ্য ব্যক্তি এখানে আহার পাইতেন, কিন্তু এক্ষণে ভ্রাতৃ-বিরোধ ঘটিয়া তাঁহাদের সম্পত্তির সমধিক হ্রাস হইয়াছে, সেই কারণে দেব-সেবা ও সাধু-সেবার ব্যয়ও হ্রাস করিতে হইয়াছে। আমরা কায়মনোবাক্যে এই পবিত্র বংশের উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

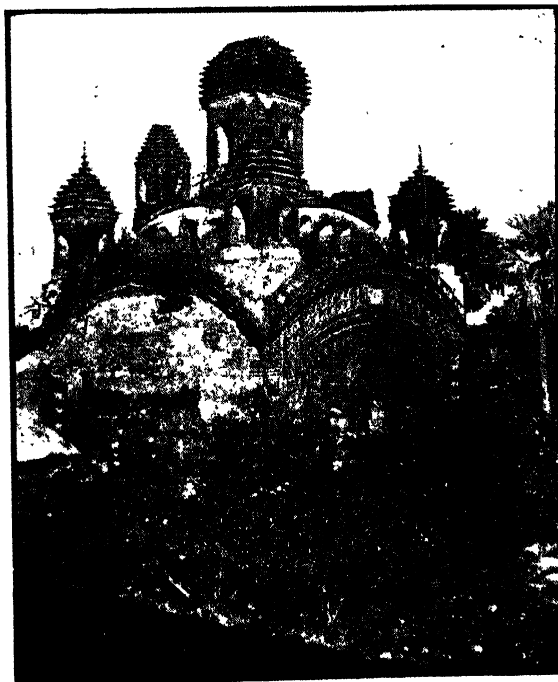
কেন্দুবিল্ব-কাহিনী

"বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্ব-সমুদ্র-সম্ভব রোহিণী-রমণেন ন॥"

সে আজ অনেক দিনের কথা। বীরভূমির কেন্দুবিল্ব-সমুদ্রে জগদোদ্ভতকর যে শশাঙ্ক সমুদিত হইয়াছিলেন, নিয়তির নিদারুণ নিয়মে বহুদিন হইল তিনি অস্তমিত হইয়াছেন। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার অমৃত-নিস্যন্দিনী কৌমুদী-ধারায় পরিপ্লাবিত হইয়া আজিও ধন্য এবং পবিত্র রহিয়াছে। সেই চিরস্নিগ্ধ সুবিমল জ্যোৎস্নাভিসেচনে, ভাবপ্রবণ বঙ্গ-হৃদয় আজিও ললিত কোমলতায় মধুময় হইয়া আছে। প্রেমভক্তির অফুরন্ত উৎস শ্রীগীত-গোবিন্দের গীতি-পীযুষ-ধারা কত অগণিত হৃদয়-কুসুম বিকসিত করিয়াছে, শান্তি-শীতলতায় পবিত্র ও কৃতার্থ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা হয় না। এই অমৃত-উৎস-সঞ্জাত দুইটী কলনাদিনী স্রোতস্বিনীর লীলায়িত প্রবাহ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির "বৃন্দাবন-গাথা' নান্নুর ও বিস্‌ফি হইতে সমুদ্ভূত হইয়া প্রেমাশ্রুপ্লুত বঙ্গদেশকে এক দিন অনিন্দ্য নির্ম্মলতায় অভিষিক্ত করিয়াছিল। কাব্য-নিকুঞ্জে সেই সুধাস্রাবী পিককণ্ঠ বহুদিন হইল নীরব হইয়াছে। কিন্তু ভারতের গগনে পবনে আজিও তাহার রেশ ঝঙ্কৃত হইতেছে। কত কণ্ঠে কত ভাবে এই সংগীত গীত হইয়াছে, এই সংগীতে নিত্যানন্দ-ধামের অমিয়বাণী শ্রবণ করিয়া কত হৃদয় গীতিময় হইয়া গিয়াছে,—ভগবৎ-প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে, সংবাদ রাখে কাহার সাধ্য। এক জনের মাত্র উল্লেখ করিতেছি, প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই গোবিন্দ-সংগীত শ্রবণে ভাবোন্মাদনায় আত্মহারা হইতেন—ধৈর্য্য হারাইতেন। সেই রোদনাবরুদ্ধ কণ্ঠ, ধুল্যবলুণ্ঠিত হেম-গৌর গৌরাঙ্গ-হৃদয়ে তখন স্ত্রীপুরুষের ভেদ-জ্ঞান তিরোহিত হইত। আদর্শ সন্ন্যাসী উন্মত্তের ন্যায় উধাও হইয়া গায়ক-গায়িকার পশ্চাদনুসরণ করিতেন। "চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি, কর্ণামৃত শ্রীগীত-গোবিন্দ" শ্রীচৈতন্য দেবের অতি প্রিয় ছিল। গম্ভীরার গুপ্তকক্ষে কয়েকটী অন্তরঙ্গ ভক্তসহ অতি সঙ্গোপনে তিনি এই গীতি-রস আস্বাদন করিতেন। অজয়ের জল-কলরোল মুখরিত



কেন্দুবিল্ব—শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদের মন্দির।



কেন্দুবিল্ব—শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদের মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগ।

আসিয়া অধিষ্ঠিত হইতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, পূর্ব্ব হইতেই বিক্রমপুর তান্ত্রিক-প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। বৈদিক-ভক্ত বর্ম্মরাজগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও এখানকার তান্ত্রিক-প্রভাব একেবারে লোপ করিতে সমর্থ হন নাই। মহাবীর বল্লালসেন এখানকার তান্ত্রিকতায় বিমোহিত হইয়াছিলেন। আপাততঃ আনন্দদায়ক বলিয়া ও দীর্ঘ-জীবন লাভাশায় উন্মত্ত হইয়া তিনি তান্ত্রিকতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। এই সময় তিনি তান্ত্রিকদের দ্বারায় সিদ্ধ হইবার আশায় নীচজাতীয়া কুমারী আনিয়া শক্তি-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহা হইতেই ডোমজাতীয়াকন্যা-ঘটিত অপবাদ প্রচলিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে, প্রথমতঃ তিনি বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার পক্ষপাতী ছিলেন ... ... ঘটনাচক্রে সেই সময়ের কিছু পরে সিংহগিরি নামে এক শৈব-তান্ত্রিক সিদ্ধ হইয়া বল্লালসেনের সভায় আসিয়া উপস্থিত হন। বল্লালসেন তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন।"

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এই সূত্রেই পিতা-পুত্রে মনোমালিন্য উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য বল্লালসেন লক্ষ্মণসেনকে নির্ব্বাসিত করেন। এসম্বন্ধে তাঁহারা পিতা-পুত্রে উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক নিম্নোক্ত সংস্কৃত শ্লোকের উল্লেখ করিয়া থাকেন। লক্ষ্মণসেন পিতার চৈতন্যোৎপাদনের জন্য তাঁহার নিকট নিম্নোক্ত শ্লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন :—

"শৈত্যংনাম গুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা
কিং ব্রুমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয় স্পর্শেন যস্যাপরে।
কিঞ্চান্তৎ কথয়ামি তে স্তুতিপদং যজ্জীবিনাং জীবনং
ত্বঞ্চেন্নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিষেদ্ধুং ক্ষমঃ॥"

ইহার উত্তরে বল্লাল লিখিলেন :—

"তাপো নাপগতস্তৃষা নচ কৃষা ধৌতা ন ধূলিস্তনো
ন স্বচ্ছন্দমকারি কন্দকবলং কা নাম কেলী কথা।
দুরোৎক্ষিপ্তকরেণ হস্ত করিণাস্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী
প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কার কোলাহলঃ॥"

লক্ষ্মণসেন পুনরায় লিখিলেন :—

"পরীবাদস্তথ্যো ভবতি বিতথোবাপি মহতাং
তথাপ্যেযো নুনং হরতি মহিমানং জনরবঃ

তুলোতীর্ণস্যাপি প্রকটনিহতাশেষ তমসো
রবেস্তাদৃক্ তেজো নহি ভবতি কন্যাং গতবতঃ ॥"

বল্লালসেন পুনরুত্তর করিলেন :—

"সুধাংশোর্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্য কণিকা
বিধাতুর্দোষোঽয়ং নচ গুণনিধেস্তস্য কিমপি।
চন্দ্রো নাত্রেঃ পুত্রো ন কিমু হরচূড়ার্চ্চনমণি-
র্নবাহন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিম্বা ন বসতি ॥"

এইরূপ কথা-কাটাকাটির পর লক্ষ্মণসেন নির্ব্বাসিত হন বা স্ব-ইচ্ছায় দেশান্তরিত হন। "রাজন্যকাণ্ডে" ইহার অন্য কারণ নির্দ্দেষিত আছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—"আধুনিক অনেক গ্রন্থেই ডোম বা চর্ম্মকার-কন্যা প্রসঙ্গে লক্ষ্মণসেনের নির্ব্বাসন বা পিতৃরাজ্য পরিত্যাগের কথা আছে। কিন্তু যদুনন্দনের মূল ঢাকুরে বর্ণিত আছে :—

"অনেক ভাবিয়া রাজা বিবাহ না করিল,
তথাপি ডোমের কন্যা ছাড়িতে নারিল।
তদন্তরে আর এক শুন বিবরণ,
ধনার্থে বিদেশ গত রাজার নন্দন ॥
তাহার বনিতা সাধ্বী আছে নিজ ধামে,
বিরহিণী হয়ে আছে পদ্ম-নিরীক্ষণে।"

পুত্রবধূর বিরহ-শ্লোক পাঠ করিয়া ধনার্থে বিদেশগত লক্ষ্মণসেনকে অতি সত্বর আনিয়া দিবার জন্য বল্লালসেন কৈবর্ত্তগণকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন—শ্লোকটি এই :—

"পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখ শান্তিং করোতু মে ॥"

শ্লোকটী লক্ষ্মণসেনের স্ত্রী-কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে।

যাহা হউক, বল্লালসেনের নীচ-সংসর্গজনিত প্রবাদ একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এই অপবাদ অপনোদনের জন্য তিনি পঞ্চকোটের গৌরবান্বিত শেখররাজবংশে কন্যা-সম্প্রদান করিয়াছিলেন। সেই বিবাহে তিনি তাঁহার উপাস্যাদেবী শ্যামারূপাকে পর্য্যন্ত যৌতুক দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, যে জন্যই হউক, আর যাহার জন্যই হউক, লক্ষ্মণসেন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কিয়দ্দিন অন্যত্র অতিবাহিত করিয়া-

ছিলেন। আমাদের মনে হয়, সেই সময়ে তিনি শ্যামারূপার গড় (সেন-পাহাড়িতে) ও লখনৌরে আগমন করিয়াছিলেন। (১) সেনপাহাড়ি হইতেই তিনি জয়দেবের সহিত পরিচিত হন। এই সাক্ষাৎকারের পর হইতেই তাঁহার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। "মদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর" লক্ষ্মণসেনের হৃদয় বৈষ্ণবধর্ম্ম-গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাঁহার শেষ জীবনে ইহার চরম পরিণতি। (২)

মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পূর্ব্বেই কবি দম্পতী বৃন্দাবনধাম প্রয়াণ করেন বলিয়া অনুমিত হয়। তথায় দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা নিত্যধাম লাভ করেন। সুতরাং মহারাজ লক্ষ্মণসেনের ন্যায় কবি-দম্পতিও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন, একথা বলা যাইতে পারে।

"ভক্তমালে" শ্রীজয়দেবের জীবনী বর্ণিত আছে। কবির জীবনী লইয়া বনমালী দাস "জয়দেব-চরিত্র" নামে আর এক খানি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। জনশ্রুতি হইতেও অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়। এই সমস্ত হইতে আমরা যাহা অবগত হইতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহাই সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

"বনমালী দাসের জয়দেব-চরিত্র প্রায় ৩০০ শত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত।" বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।" গ্রন্থশেষে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় গ্রন্থের রচনা-কালের বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি বীরভূম হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। (৩) আমাদের মনে হয়, গ্রন্থকার বনমালী দাস এতদঞ্চলে কোন স্থানের অধিবাসী

(১) ধোয়ী কবির "পবন-দূত" হইতেও এইরূপ বুঝিতে পারা যায় যে, এতদঞ্চলে লক্ষ্মণসেন কিয়দ্দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

(২) বংশানুক্রমে তান্ত্রিক ধর্ম্মানুষ্ঠানরত যুবরাজ লক্ষ্মণসেন যাঁহার দর্শন লাভের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন,—যাঁহার আদর্শে আজন্মপোষিত ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন, তদানীন্তন কালে তাঁহার প্রভাব কিরূপ ছিল অনুমান করিতে বিশেষ ক্লেশ-স্বীকারের প্রয়োজন হইবে না বোধ হয়।

(৩) বাঙ্গালা ১২০৮ সালের ৩রা ফাল্গুন শনিবার "ভৌইমিক" একাদশীর দিনে আলিনগর পরগণায় সাকিম খাএরপাড়া মোকাম শিউড়ীর মালফটকে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। কোন আদর্শ পুথি হইতে এই গ্রন্থ নকল করা হয় তাহা জানা যায় নাই। এগ্রন্থ অন্য কোথাও পাওয়া যায় নাই।

ছিলেন। যাহা হউক, গ্রন্থখানির যে মূল্য আছে, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন:—

"তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী ভক্তবৃন্দ ভক্ত-চূড়ামণি জয়দেবকে যে ভাবে দেখিতেন উহাতে তাহার পূর্ণ চিত্র আছে। সে চিত্র ইতিহাস না হইলেও মনোহর—জীবন-চরিত না হইলেও উপদেশপূর্ণ; ধর্ম্মগ্রন্থ না হইলেও ভক্তি-ভাবে ভোর।" শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি যে বর্ণে বর্ণে সত্য, জয়দেব-চরিত্র পাঠ করিলে তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভূত হয়।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, শ্রীজয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম বামাদেবী। তিনি পদ্মাবতী নাম্নী এক আলোক-সামান্যা রূপবতী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অগস্ত্যের লোপামুদ্রা ও বশিষ্ঠের অরুন্ধতীর মত এই মহিয়সী মহিলা পতির প্রকৃত অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী ছিলেন। চক্রদত্ত-প্রণীত সংস্কৃত ভক্তমালে উল্লিখিত আছে:—

"উভৌ তৌ দম্পতী তত্র একপ্রাণৌ বভূবতু।
নৃত্যন্তৌ চাপি গায়ন্তৌ শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন তৎপরৌ॥"

ইহার অধিক পতিপরায়ণতা আর কি হইতে পারে। শ্রীগীত-গোবিন্দে "পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী" "জয়তি পদ্মাবতী-রমণ জয়দেব কবিভারতী বর্ণিতমতিশাতম্" ইত্যাদি রূপে পদ্মাবতীর সহিত নিজ নাম বিজড়িত করিয়া কবি যেন কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন।

জয়দেব-চরিত্র গ্রন্থে বর্ণিত আছে:— দক্ষিণদেশে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক ও একান্ত হরিপরায়ণ ছিলেন। দারপরিগ্রহের পরে বহু দিন অনপত্য থাকিয়া নিতান্ত সন্তপ্তচিত্তে ব্রাহ্মণ শ্রীধাম পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আসিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট প্রার্থনা করেন যে, আমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে আমি তাহাকে আপনার সেবক এবং কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে আপনার সেবিকারূপে চিরতরে দান করিব। এই ঘটনার দ্বাদশ বৎসর পরে শ্রীজগন্নাথ দেবের কৃপালব্ধা পদ্মাবতী নাম্নী কন্যাকে জগন্নাথদেবের করে সমর্পণ করিবার মানসে ব্রাহ্মণ-দম্পতী পুরীধামে উপনীত হন। ব্রাহ্মণ-দম্পতীর উপর শ্রীজগন্নাথদেবের প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে। আমি পদ্মাবতীকে গ্রহণ করিলাম। এক্ষণে তোমরা—

" * * কেন্দুবিল্ব নামে এক গ্রাম।
অজয় নদীর ধারে মোর এক ধাম॥

পুরাতন তীর্থ সেই এবে লুপ্ত হইল।
তাহার মহিমা কিছু লোকে না জানিল ॥
যেই হেতু সেই ধাম উদ্ধার লাগিআ।
মোর অংশে দ্বিজরূপে জন্ম নিল গিআ ॥
জয়দেব নাম তার নবীন যৌবন।
হরিনামে মত্ত সদা অশ্রুত-লোচন ॥
সিংহনিভ আজানুলম্বিত দুই বাহু।
চন্দ্রিমা জিনিয়া মুখ ভ্রম পায় রাহু ॥
নব মেঘ জিনি অঙ্গ শ্যামল শরীর।
উনমত্ত হ'য়ে ফেরে সদাই অস্থির ॥
আর এক চিহ্ন কহি দেখিবে তাহাতে।
রাধাকৃষ্ণ নাম লেখা সকল অঙ্গেতে ॥
তাহারে দেখিয়া মনে ঘৃণা না করিবে।
যেমত আমাকে জান তেমতি গণিবে ॥
পদ্মাবতী কন্যা লয়ে তারে দান কর।
তবে সে সন্তোষ হয় মোর কলেবর ॥"

স্বপ্নাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহারা বিংশতি দিবসে কেন্দুবিল্বে আসিয়া উপনীত হন। কিন্তু গ্রামের লোক জয়দেবের কুল-শীলের বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহেন।(৪) ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা এইমাত্র বলিলেন যে, জয়দেব নামক এক ব্যক্তি অনেক দিন হইতে এই গ্রামে বাস করে। তাহাকে পাগল বলিয়াই অনুমান হয়। কখন হাসে, কখন বা কাঁদে, আবার হরিনাম গান করিতে করিতে নৃত্যও করে। নদীতীরবর্ত্তী এক শিবমণ্ডপে তাহার বাস। ব্রাহ্মণ-দম্পতীর নিকট তাঁহাদের অন্বেষণের কারণ বিদিত হইয়া গ্রামবাসিগণ তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া জয়দেবের সমীপে উপনীত হইলেন।

(৪) বনমালী দাসের এরূপ ধারণার কারণ কি বুঝিলাম না। জয়দেবের পৈতৃক বাস-ভূমি যে কেন্দুবিল্ব অর্থাৎ অন্ততঃপক্ষে ভোজদেবের আমল হইতে তাঁহারা যে কেন্দুবিল্বে বাস করিতেছেন, তদ্বিষয়ে সংশয়মাত্র নাই। "কেন্দুবিল্ব সমুদ্রসম্ভব রোহিণীরমণেন" শ্লোকটীতে কবি নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, 'কেন্দুবিল্বই' তাঁহার জন্মভূমি। তবে কেন গ্রামের লোক জয়দেবের কুলশীলের বিষয় অবগত ছিল না বুঝিতে পারিলাম না।

জয়দেব তখন কদমখণ্ডীর ঘাটে ধ্যানস্থ—

"গ্রাম-প্রান্তে বসি আছে অজয়-কিনারে।
কদম্বের বৃক্ষ তথা অতি শোভা করে॥
অজয়-তরঙ্গে বহে অতি সুশোভন।
কিনারে পুষ্পের শোভা গন্ধে হরে মন॥
মলয়-পবন তাহে বহে মন্দ মন্দ।
কদম্বতলাতে যেন পূর্ণিমার চন্দ্র॥
যমুনার শোভা যৈছে হয় বৃন্দাবনে।
তৈছে যে দেখয় উদ্দীপন হয় মনে॥"

লোক-সংঘট্টে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি সমাগত সকলকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পদ্মাবতীর পিতা তখন তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিতে লাগিলেন।

"জগন্নাথের আজ্ঞা রহে আমার প্রতিজ্ঞা।
সব দিগ রহে যদি তুমি দেহ আজ্ঞা॥"

জয়দেব কহিলেন—"স্পষ্ট করিয়া আপনার বক্তব্য বুঝাইয়া দিন।" তদ্গত-চিত্ত ব্রাহ্মণের কথা তখন তাঁহার নিকট প্রলাপবাক্যের ন্যায় অনুমিত হইতেছিল। অনন্তর ব্রাহ্মণ আত্মভাব-সংবরণপূর্ব্বক নিতান্ত দীনভাবে নিজ স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানাইয়া পদ্মাবতীকে গ্রহণ করিবার প্রার্থনা করিলেন। জয়দেব তদুত্তরে বলিলেন :—

"এত শুনি ঠাকুর তবে কহিলা তাহারে।
জগন্নাথ আজ্ঞা যদি করিল তোমারে॥
সেই মত আজ্ঞা যদি করিবেন আমায়।
তবে কন্যা বিভা করি কহিল তোমায়॥"

ইহাই স্থিরীকৃত হইল। সকলেই গ্রামমধ্যে আগমন করিলেন। রজনী-যোগে জয়দেব স্বপ্ন দেখিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব কহিতেছেন—

"তুমি আমি একদেহ ভিন্ন কভু নয়।
কন্যা বিভা কর মনে না করিহ ভয়॥
পদ্মাবতী লক্ষ্মীঅংশে জনম ইহার।
তোমার লাগিয়া কন্যা হইল অবতার॥"

স্বপ্নাবস্থাতেই জয়দেব প্রত্যুত্তর করিলেন:—"প্রভো! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম। কিন্তু আমার এক নিবেদন আছে। আমার বহুদিনের মানস, আমি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক এক খানি গ্রন্থ রচনা করি এবং গৃহে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবায় রত থাকি। আমার এই দুই বাঞ্ছা যদি পূর্ণ হয়, তবেই বুঝিব আমার প্রতি প্রভুর কৃপা হইয়াছে।" জগন্নাথদেব কহিলেন—"তোমার এই দুই বাসনাই পরিপূর্ণ হউক। তুমি শ্রীগীতগোবিন্দ নামক গ্রন্থ রচনা কর।"—

"কৃষ্ণলীলা সর্ব্ব যাহা কেহ নাহি জানে।
অনায়াসে বলিবে তুমি আপনার মনে॥"

"আর শ্রীবিগ্রহসেবার বিষয়েও সমস্ত বলিতেছি শ্রবণ কর। আমার এই পুরাতন তীর্থ কেন্দুবিল্বে তুমি কিছু দিন বিশ্রাম কর। তোমার প্রসাদে এই স্থানের মহিমা বৃদ্ধি হইবে। ইহা মহাতীর্থে পরিণত হইবে।"

"পূর্ব্বে কোন যুগে মোর এই ধাম ছিল।
বহুদিন গেল তাহা যে বিলুপ্ত হইল॥"

তথাপি এই স্থানে আজিও আমার যুগল-মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। অজয়ের হাঁটুজলে মাত্র অবতরণ করিয়াই তুমি তাহা প্রাপ্ত হইবে।

প্রভাত হইলেই গ্রামস্থ সকলের সহ ব্রাহ্মণ শ্রীজয়দেবকে তদীয় মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে কহিলেন। জয়দেব সর্ব্বসমক্ষে নিজ স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া কহিলেন যে, বিবাহে তাঁহার সম্মতি আছে। কিন্তু অগ্রে অজয় হইতে শ্রীরাধামাধব বিগ্রহের উদ্ধার করিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া সকলে বাদ্য-ধ্বনি সহকারে আনন্দ-উৎসব করিতে করিতে অজয়তীরে উপনীত হইলেন ও অজয়-গর্ভ হইতে শ্রীবিগ্রহদ্বয়ের উদ্ধারসাধন করিয়া গ্রাম-মধ্যে আনয়নপূর্ব্বক যথাবিহিত মহাভিষেক ও পূজাদি পরিসমাপ্ত করিলেন। বনমালী দাস বর্ণনা করিয়াছেন—শ্রীরাধামাধবের আবির্ভাব হইল।

"পৌষমাস-সংক্রান্তি ব্রহ্মমুক্তির সময়।
পূর্ণিমাতে পূর্ণচন্দ্র হইল উদয়॥"

এই বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে কবি বনমালী দাস আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, বর্দ্ধমানের মহারাজ আসিয়া বিশেষ সমারোহসহকারে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাদি ও জয়দেব-পদ্মাবতীর পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদিত করান। তিনি "গোদা" নামক পুষ্ক-

স্বিণীর তীরে আপন ব্যয়ে গোস্বামীর জন্য একটী সুরম্য ভবন ও শ্রীরাধামাধব বিগ্রহের জন্য পৃথক স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই বিষয়ে বনমালী দাস একটু ভ্রমে পড়িয়াছেন। শ্রীজয়দেব গোস্বামীর আমলে বর্দ্ধমানের সহিত তাঁহার কোন সংস্রব ছিল বলিয়া মনে হয় না। বর্দ্ধমানের তাৎকালিক অধিপতি বা তদ্বংশীয়ের এতাদৃশ কোন খ্যাতির কথাও আমরা অবগত নহি। বনমালী দাস কেন এরূপ লিখিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তরস্বরূপ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন "বনমালী দাসের সময় বর্দ্ধমানের রাজাই বোধ হয় বড় রাজা ছিলেন, তাই বর্দ্ধমানরাজাকে জয়দেবের প্রধান সহায় বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, জয়দেবের সময় বাঙ্গালা স্বাধীন ছিল এবং স্বাধীন রাজা লক্ষ্মণসেনের সভায় জয়দেবের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। আমরা "সেখ শুভোদয়া" হইতে জানিতে পারি যে, লক্ষ্মণসেন জয়দেব ও পদ্মাবতীর কৃষ্ণভক্তিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।" এ সম্বন্ধে আর এক কথা, বনমালী দাসের সময় হয়তো কেন্দুবিল্বের সহিত বর্দ্ধমানের সংস্রব ঘটিয়া থাকিবে। শ্রীজয়দেব গোস্বামী পদ্মাবতীসহ স্বপূজিত শ্রীরাধামাধব বিগ্রহ-মূর্ত্তি সমভিব্যাহারে শ্রীবৃন্দাবন-ধাম গমন করিলে নিরানন্দ কেন্দুবিল্বের রাধামাধব মন্দির বহু দিন বিগ্রহ শূন্য ছিল। তৎপরে শ্যামারূপাগড় হইতে বর্ত্তমান বিগ্রহ-মূর্ত্তি আনয়নপূর্ব্বক কেন্দু-বিল্বে প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, বর্দ্ধমানের পূজনীয়া নৈরাণী দেবীকর্ত্তৃক বর্ত্তমান শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ সেনপাহাড়ি হইতে আনীত হইয়া কেন্দু-বিল্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। এই ঘটনা বনমালী দাসের সমসাময়িক হওয়াই সম্ভব। এতদ্ভিন্ন কেন্দুবিল্ব পাটের আদি মোহান্ত ৺রাধারমণ ব্রজবাসীও বর্দ্ধমান হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীজয়দেব-পরিত্যক্ত কেন্দুবিল্ব শূন্যময় দেখিয়া তিনি এখানে আসিয়া শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বর শালগ্রাম-মূর্ত্তি এবং শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। খুব সম্ভব, এইরূপ কোন উৎসবাদির অনুষ্ঠান দেখিয়া বনমালী দাস শ্রীজয়দেবের বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও বিবাহোৎসবের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর বনমালী দাস লিখিয়াছেন, সেই চিরপ্রসিদ্ধ "দেহি পদপল্লবমুদারম" এর মধুময়ী কাহিনী। ভক্ত-বাঞ্ছাপূর্ণ করিবার জন্য ভগবান স্বহস্তে পদপূরণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। দেব-সেবাদি নিয়মিত কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক পদ্মাবতীর প্রীতিপ্রদত্ত দ্রব্য ভোজন করিয়াছেন। কবি-জীবনের সে এক অপূর্ব্ব কাহিনী। কবি তখন গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন। তাঁহার নিত্যকার্য্য ছিল—

"রাত্রিশেষে উঠি মঙ্গল-আরতি করিয়া
প্রাতঃকালে সুকুসুম আনেন তুলিয়া
পদ্মাবতী নানা রঙ্গে গাঁথে ফুলহার
গীতগোবিন্দ রচে প্রভু কৃষ্ণলীলা-সার"
* * * * * *
প্রহরেক পর্য্যন্ত যায় গ্রন্থের বর্ণনে
তার পর গঙ্গাতীরে যান গঙ্গাস্নানে"

স্নানান্তে গৃহে আসিয়া দেব-সেবা ও ভোগাদি সমাপনপূর্ব্বক প্রসাদ গ্রহণ করেন। পুনরায় শ্রীগীতগোবিন্দ লিখিত হয়। এইরূপে "স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং" পর্য্যন্ত লিখিত হইল। কিন্তু লেখনী এই খানে থামিয়া গেল। কবি ভাবিতে লাগিলেন,—

"কৃষ্ণ চাহে পাদপদ্ম মস্তকে ধরিতে
কেমনে লিখিব ইহা বিস্ময় এই চিত্তে"

গ্রন্থে ডোর পড়িল, কবি গঙ্গাস্নানে গেলেন। এ দিকে ভক্ত-বৎসল গৃহ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। গঙ্গাস্নানে গিয়া জয়দেব গঙ্গার সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, দেবী বলিতেছেন, "তুমি এখানে এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া আর আসিও না। আমি তোমার জন্য প্রত্যহ অজয়ে গিয়া উপস্থিত হইব। বৎসরের মধ্যে তিন দিন আমি অজয়ে ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া রহিব। জয়দেবের বিশ্বাসের জন্য পরবর্ত্তী পৌষ-সংক্রান্তির পূর্ব্বদিবস অজয় বারি হইতে তিনি স্বীয় শংখবলয়িত বাহু দুইটী দেখাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন, যে চরণে তাঁহার জন্ম হইয়াছে, জাহ্নবী আজ সে চরণ প্রাপ্তির পূর্ব্বসূচনায় কবি-হৃদয়ে অপার-আনন্দে পূর্ণ হইয়া রহিলেন। কেন্দুবিল্বে এখানে শ্রীজয়দেবরূপধারী বৃন্দাবনচন্দ্র আহারান্তে পালঙ্কে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থের আবরণ উন্মোচন করিয়া নিজ হাতে তাহাতে লিখিয়া দিলেন—

"দেহি পদপল্লব মুদারম্"

"পদের শেষ লিখি প্রভু গ্রন্থে ডোর দিলা
আনন্দে পালঙ্কোপরে শয়ন করিলা"

পাদ সম্বাহনের পর পদ্মাবতী পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অধরামৃত মাখানো ভোজ্যাবশিষ্ট লইয়া বসিয়া গেলেন। পদ্মাবতী—

"আনন্দে ভোজন করে থালের উপরে
হেনকালে জয়দেব আইলা মন্দিরে"

পদ্মাবতীকে ভোজন করিতে দেখিয়াই তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। দুঃখের সহিত তাঁহাকে বলিলেন—"আমি এইমাত্র স্নান করিয়া আসিতেছি এখনও শ্রীরাধামাধবের সেবা-পূজা ভোগসমর্পণাদি কোনও কার্য্যই নির্ব্বাহিত হয় নাই। তুমি স্বচ্ছন্দে 'অগ্রভাগ' ভোজন করিতেছ, এ তোমার কেমন ব্যবহার পদ্মা ?

"সচ্চরিত্রা সুলক্ষণা নাহি তুয়া সম
আজি কেনে কিবা দোষে হইল মতিভ্রম
প্রতিদিন স্নান করি আসিয়াছি আমি
কত ভক্তি করি পাদধৌত কর তুমি
সর্ব্বাঙ্গেতে কর মোর চন্দন লেপন
গন্ধ পুষ্প দিয়া কর চরণ পূজন"

তবে আজি এরূপ হইল কেন ? জয়দেব অপেক্ষা পদ্মাবতী ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, স্নাত পতিদেবতাকে প্রতিদিনের মত ফিরিতে দেখিয়া, প্রতিদিবসের মত এখনও তিনি যেন অভুক্ত রহিয়াছেন। অত্যধিক আশ্চর্য্যের বিষয়, জয়দেব এই একটু পূর্ব্বের সমস্ত ঘটনাই অস্বীকার করিতেছেন। পদ্মার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি অনেকক্ষণ পতির মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, দেখিলেন তাহাতে কৌতুক কি কপটতার লেশমাত্রও নাই। তখন তাঁহার মনেও কেমন একটু সন্দেহ হইল। তিনি ভীতি-বিজড়িত কণ্ঠে স্বামি-চরণে সমস্ত নিবেদন করিলেন। জয়দেব দেখিলেন ব্যাপার গুরুতর দাঁড়াইয়াছে। ঠিক আমারি মত ! আবার আহার করিয়াছেন, শয়ন করিয়াছেন, শেষে গ্রন্থও লিখিয়াছেন ! দেব-সেবারও কোন ত্রুটী হয় নাই, আচ্ছা গ্রন্থখানি দেখিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিব।

"একচিত্তে গ্রন্থ পাত খুলিলা ঠাকুর
অর্দ্ধ কলি ছিল পদ হইয়াছে পুর
অর্দ্ধ কলি কৈলা পদ জয়দেব সার
কৃষ্ণ হস্তে দেহি পদ-পল্লব-মুদার
পাদ পূর্ণ দেখি মনে হইল প্রত্যয়
কৃষ্ণ পূর্ণ কৈল মোর মনের আশয়

কবি তজ্জন্য এবার আপন অন্তরঙ্গ বৈষ্ণববৃন্দকেই নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার কবি-যশ-খ্যাতি, সর্ব্বাপেক্ষা সাধুত্বের প্রতিষ্ঠা তখন চারিদিকে প্রসার লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ গঙ্গাদেবীর দর্শনলাভ ঘটিবে শুনিয়া, পৌষ-সংক্রান্তির মহোৎসবে নিমন্ত্রিত-অনিমন্ত্রিত বহুজন-সমাগমে কেন্দুবিল্ব কোলাহল-ময়ী হইয়া উঠিল।

বনমালী দাস বর্ণন করিতেছেন—

"পৌষ-সংক্রান্তির এক দিবস থাকিতে।
মহোচ্ছবের ঘটা প্রভু কৈলা ভালমতে॥
দেশ-বিদেশে লোক মহাগোল হৈল।
সংকীর্ত্তন কলরবে পৃথিবী পূরিল॥
* * * * *
সাধুসন্ত তেজবন্ত একত্র হৈল।
অজয়-কিনারে সব আখড়া বাঁধিল॥
* * * * *
কেবা আসে কেবা রাঁধে কে পরিবেশয়।
কেবা ভোজন করে কেহো কারে না চিনয়॥
জগন্নাথক্ষেত্রে যেন প্রসাদ বিকায়।
জাতি-পাঁতি না বিচারে পাইলেই খায়॥
সেই মত দেখি জয়দেবের ভঙ্গিতে।
চারি বর্ণ একাকার কদম্বখণ্ডীতে॥"

পৌষ-সংক্রান্তি ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত সমাগত হইল। সহস্র সহস্র কণ্ঠের জয়-ধ্বনিতে কেন্দুবিল্ব মুখরিত হইয়া উঠিল। সারি দিয়া অজয়-কিনারে লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে—

"হেনকালে দুই বাহু শঙ্খ-উত্তোলন।
কদম্বখণ্ডীর ঘাটে দিলা দরশন॥"

অজয় উজান বহিল। (৫) আনন্দ-চঞ্চল সমবেত জন-সংঘের মিলিত হরি-বোল

(৫) এতদঞ্চলের বহুজনসাধারণের বিশ্বাস, পৌষ-সংক্রান্তির দিন অজয়ের জল আজিও উজান বহে। কেন্দুবিল্বের অনেকেই বলিলেন যে, "অনেকবার আমরা ঐ দিন ভোরে অজয়ের জলে ফুল ভাসাইয়া দেখিয়াছি, ফুল বিপরীত দিকে ভাসিয়া যায়। জলে কাঠি পুতিয়া দেখিয়াছি,

কেন্দুবিল্বের গগনে পবনে ছড়াইয়া পড়িল। পূজার ফুলে অজয়ের জল ফুলময় হইয়া গেল। পূজার দ্রব্যে অজয়-গর্ভ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

"এই মতে মহোৎসব তিন দিন গেল।
চতুর্থ দিবস দধি-হরিদ্রা করিল ॥
তুমুল করিয়া কৈল হরি-সংকীর্ত্তন।
দধি-হরিদ্রা দিয়া সভার করিল ভূষণ ॥"

সর্ব্বশেষে—

"লক্ষ লক্ষ লোক সব পাতিলেক কান।
কহিতে লাগিলা ঠাকুর সভা বিদ্যমান ॥
শুন শুন সর্ব্বলোক শুন এই বাণী।
কদম্বখণ্ডীর ঘাট মহাতীর্থ জানি ॥
কোন যুগের ঈশ্বরের এই ধাম ছিল।
লুপ্তধাম পুনরপি মহাতীর্থ হইল ॥
কদম্বখণ্ডীতে রাধা-মাধব পাইল।
পুনরপি সেই ঘাটে গঙ্গা দেখা দিল ॥
কে কহিতে পারে এই তীর্থের মহিমা।
স্নান-দানে কতগুণ কে কহিব সীমা ॥
পৌষ-মাস সংক্রান্তির মকর-দিবসে।
কদম্বখণ্ডীতে যেবা করিবেক বাসে ॥
কদম্বখণ্ডীতে যেবা করিবেক স্নান।
কদম্বখণ্ডীতে যেবা করিবেক দান ॥
কীর্ত্তন করিবে কেহ শুনিব যত জন।
সাধু বৈষ্ণবজনে করিব দরশন ॥
কদম্বখণ্ডীর ধূলা মাখিব খাইব।
চতুঃসীমা কেন্দুবিল্বের ভ্রমণ করিব ॥

জল বাড়িয়াছে। গঙ্গার স্রোত আসিয়াই ফুল ভাসাইয়া লইয়া যায়। অজয়ের জল বাড়াইয়া দেয়।" বিশ্বকোষের নগেন্দ্রবাবু, আনন্দ-বাজারের মৃণালকান্তি বাবু, রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতির সিদ্ধেশ্বর বাবুও আমার ন্যায় স্বকর্ণে এই কাহিনী শুনিয়াছেন। আমাদের সহিত আরো অনেকেই তথায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তাগণ প্রবীণ এবং ভদ্রলোক। সুতরাং লিখিলাম। ইতি প্রকাশক।

তাহার ভাগ্যের সীমা কে কহিতে পারে।
অনায়াসে ভবসিন্ধু হইব উদ্ধারে ॥

এই মত বৎসরের শেষ পৌষ মাসে।
মহা-মহোৎসব করেন সংক্রান্তি-দিবসে ॥
বচ্ছরে বচ্ছরে বাড়ে লোক-সংঘটন।
স্নান-দান মহোচ্ছবে নগর-কীর্ত্তন ॥"

অদ্যাপিও কেন্দুবিল্বে পৌষ-সংক্রান্তি হইতে চারি দিবস-ব্যাপী মহামেলা হয়। সেই হইতেই কেন্দুবিল্ব "জয়দেব কেন্দুবিল্ব" নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

'ব্রাহ্মণগণ ভোজন না করায় জয়দেব গোস্বামী অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া দিয়াছিলেন', পূর্ব্বেই এ প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে তাহার উপসংহার-ভাগ বিবৃত করিতেছি। প্রবাদ যে, পৌষ-সংক্রান্তিতে গঙ্গাদেবীর দর্শন-দান, মহোৎসবে সাধু-সমাগম, ও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনাদির মহিমায় অভিভূত হইয়া কৃতাপরাধীর ন্যায় ব্রাহ্মণগণ গোস্বামী সমীপে গিয়া উপনীত হন এবং প্রসাদ প্রার্থনা করেন। কবি তাঁহাদিগকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন "যদি কৃপা করিয়া আসিয়াছেন, তবে আপনাদের ভোজনের জন্য প্রস্তুত দ্রব্যাদি, বিগত বৎসর যাহা আমি আপনাদের নামেই রাখিয়া দিয়াছি, ভোজন করিয়া আমায় কৃতার্থ করুন। বিস্মিতচিত্ত ব্রাহ্মণগণ ভোজনার্থে স্বীকৃত হইয়া মহোল্লাসে কদম্বখণ্ডীর ঘাটে গিয়া উপনীত হইলেন। অন্ন-ব্যঞ্জনাদি মাটীর ভিতর হইতে বাহির করিয়া দেখিলেন, তাহা সদ্যো-প্রস্তুতের মত উষ্ণ ও অবিকৃত রহিয়াছে। আহারান্তে শ্রীজয়দেবের এই অলৌকিক মহিমার জয়-কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রাহ্মণগণ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। মহোৎসবের শেষদিন অন্ন-ব্যঞ্জন পুঁতিয়া রাখার প্রথা সেইদিন অবধি প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস। এখনো বৈষ্ণবগণ মহোৎসবের শেষদিনে কদম্বখণ্ডীর ঘাটে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রোথিত করিয়া রাখিয়া যান এবং পর বৎসরে আসিয়া তাহা উত্তোলন করেন। তাঁহারা বলেন, এই অন্ন-ব্যঞ্জন অবিকৃত থাকে।

"এই মতে কতকদিন দ্বিজ-চূড়ামণি।
কদম্বখণ্ডীতে তীর্থ করিলা আপনি ॥"

অতঃপর কবির মন একদিন বড় অশান্ত হইয়া উঠিল। উতলা আকুল-

প্রাণ আজ না জানি কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে। কেন্দুবিল্বে এখন যেন কিসের একটা অভাব অনুভূত হয়। সেই শ্রবণ-মনোরসায়ন সুধা-সুমধুর মুরলীধ্বনি এখন যেন শুনিতে শুনিতে কোথায় মিলাইয়া যায়। নূপুর যেন বাজিতে বাজিতে থামিয়া পড়ে। অজয় দেখিলেই কোথাকার একটা নীল-নীরা তটিনীর মধুর স্মৃতি অশ্রুভারাক্রান্ত-নয়নে এখন প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। মেঘ-মেদুর অম্বর নয়নপথে পতিত হইলেই যেন কাহাদের প্রেমাশ্রুপ্লুত আকুল আঁখিগুলি হৃদয়পরতে বিজলী চমকায়। কবি তাই 'শ্রীবৃন্দাবন' সন্দর্শনের জন্ত বড় অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। 'শ্রীবৃন্দাবন' যাইতেই হইবে। প্রাণের সাথী পদ্মাকে ডাকিয়া একে একে সব বলিয়া ফেলিলেন। যেমন পতি তেমনি পত্নী! উভয়ের পরামর্শে স্থির হইল "যাইতেই হইবে।" কিন্তু বড় দুঃখের কথা, শ্রীরাধামাধবকে সঙ্গে লওয়া যায় কিরূপে? বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি বহন করিবার উপায় কি?

"কিন্তু রাধামাধব ছাড়িতে নারিব।
দুইজনে চল পাদ-পদ্মে নিবেদিব॥
এত বলি দুইজনে প্রবেশে মন্দিরে।
ভাসিল দোঁহার অঙ্গ নয়নের নীরে॥"

কবি দম্পতীর অন্তরের বেদন-নিবেদন অন্তর্য্যামীর হৃদয়ে পৌঁছিল। স্বপ্নে দেখা দিয়া শ্রীরাধা-মাধব তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা নাকি শ্রীবৃন্দাবন যাইতেছ এবং আমাকে এখানে রাখিয়া যাইবে ইচ্ছা করিতেছ। কিন্তু আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। 'শালগ্রাম' মূর্ত্তিতে 'খুঞ্জির' মধ্যেই যাইব।"

"অনায়াসে লইয়া যাবে যাব বৃন্দাবন।
এক সেরের অন্ন মোরে করিও সমর্পণ॥"

স্বপ্নের আনন্দে কবি-দম্পতীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। দোঁহে দোঁহার স্বপ্ন-কাহিনী শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। রাত্রি প্রভাত হইল। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে স্নান সমাপন করিয়া কবি-দম্পতী শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পালঙ্ক হইতে আচ্ছাদনবস্ত্র অপসারিত করিয়া দেখিলেন, শ্রীরাধা-মাধব যুগল-মূর্ত্তির স্থানে সুন্দর শালগ্রাম-চক্র বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের আনন্দের আর অবধি রহিল না।

"পদ্মাবতী কহে নাথ শুন মহাশয়।
বৃন্দাবন যাবে তুমি জানিল নিশ্চয়॥
শালগ্রাম মূর্ত্তি হইল প্রভু দুইজন।
এই শালগ্রাম এবে করহ পূজন॥"

পূজাদি সমাপনান্তে অতঃপর শ্রীবৃন্দাবন যাইবার উদ্যোগ আরম্ভ হইল। নানাস্থান হইতে সমাগত নরনারীবৃন্দকে ও কেন্দুবিল্ববাসীকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়া কবি-দম্পতী শ্রীরাধা-মাধব শালগ্রাম-মূর্ত্তিসহ কেন্দুবিল্ব হইতে শুভ প্রস্থান করিলেন। বীরভূমের চিরস্মরণীয় কি শোকের আর কত সুখের সেই দিন! গিয়াছিলে কবিবর! কিন্তু সে-তো তোমার চিরপ্রয়াণ নহে। তুমি কি আমাদিগকে ভুলিয়া থাকিতে পার? জয়দেব পদ্মাবতীরূপে গিয়াছিলে, চণ্ডীদাস রজকিনীরূপে আবার ফিরিয়াছিলে! অজয়শীকর-সম্পৃক্ত কেন্দু-বিল্বের কুঞ্জ-কদম্বের পরিবর্ত্তে, নান্নুরের মাঠে আসিয়া "নিরঞ্জন পাতের কুটীরে" বাসা বাঁধিয়াছিলে। কিন্তু আর একবার কি আসিবে না? আবার আসার যে বড় প্রয়োজন হইয়াছে কবি! আমরা তোমার আশা-পথ চাহিয়া বসিয়া আছি। আশা কি মিটিবে না?

আমাদের আশা পুরিবে কি না জানি না। তবে কবির আশা অপূর্ণ থাকে নাই। যথাসময়ে কবি-দম্পতী শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্থলী শ্রীবৃন্দাবন-ধামে উপনীত হইলেন, এবং চির-অভিলষিত স্থানগুলি দর্শন ও পরিভ্রমণ করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিলেন। (৬) শ্রীবৃন্দাবনের পশ্চিমে যমুনা-কিনারে শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইল, তন্মধ্যে কেন্দুবিল্বের সাথী শালগ্রাম-মূর্ত্তিটীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মন্দির-

(৬) কেহ কেহ বলেন, শ্রীধাম বৃন্দাবন তখন অপ্রকট ছিল। সুতরাং জয়দেব গোস্বামীর বৃন্দাবন-যাত্রায় তাঁহারা বনমালী দাসের কৈফিয়ৎ প্রার্থনা করেন। আমরা কিন্তু তাহা সুযুক্তি বলিয়া মনে করি না। "খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মামুদ গজনী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। যেখানেই ধনজনপূর্ণ নগর অথবা প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র আছে শুনিতে পাইতেন, সেই স্থানই তিনি লুণ্ঠন করিতে যাইতেন। মথুরানগরীও তাঁহার কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করে নাই। ব্রজধামের বহু পুণ্যকীর্ত্তি তিনি বিনষ্ট করিয়াছিলেন। সুতরাং মথুরা ও বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধি তৎকালে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। জয়দেব গোস্বামী না হয় তাহার এক শতাব্দী পরবর্ত্তী হইতেছেন। তাই বলিয়া শ্রীবৃন্দাবনের নাম যে অতবড় একজন ভগবৎ প্রেমিকের কর্ণগোচর হয় নাই, অধিকন্তু সুলতান মামুদের হস্তে ব্রজধামের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল, এ অনুমান কোনক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না। তবে একথা সত্য যে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়া খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে

সান্নিধ্যে একটী কুঞ্জ নির্ম্মাণ করাইয়া কবি-দম্পতী তথায় বাস করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় দেব-সেবাদির আনন্দে সময় কাটিতে লাগিল। একদিন প্রভাতে উঠিয়া জয়দেব গোস্বামী নানাজাতি কুসুমচয়নপূর্ব্বক পদ্মাবতীর নিকট আনিয়া দিলেন। তদ্দ্বারা "বৈজয়ন্তী" নামক দুইগাছি মনোমোহনমালা গাঁথিয়া পদ্মাবতী শালগ্রামটীকে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু তেমন সাজিল কি? শ্রীরাধা-মাধবের গলে মালা যেমন মানাইত, তেমনটী হইল কি? পদ্মার মনে বড় দুঃখ হইল। চ'ক্ষে জল আসিল। সায়াহ্নে আরত্রিকাদি সমাপন করিয়া পতি-পত্নী সেই একই কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, "ঠাকুরকে মনোমত করিয়া সাজাইতে পারি না।" ক্রমে রাত্রি হইল, নিদ্রিতাবস্থাতে তাঁহারা স্বপ্ন দেখিলেন—

* * * * *

"শ্রীরাধা-মাধব স্বপ্নে কহিতে লাগিলা।
মালা পরাইতে ইচ্ছা হঞাছে তোমার,
তোমার যে ইচ্ছা সেই কর্ত্তব্য আমার।
তোমার বাঞ্ছায় আমি হৈল শালগ্রাম,
পুনরায় তোমার পুরাব মনস্কাম।
পূর্ব্বে যৈছে যেই মূর্ত্তি ছিলাম তুয়া পাশ,
সেইমত হব পুনঃ পুরাব তুয়া আশ।"

প্রভাতে উঠিয়া স্নানাদির পর মন্দির-দ্বার উদঘাটন করিয়া কবি-দম্পতি দেখিলেন,—আশ্চর্য্য!

"পূর্ব্ব রাধামাধব প্রকট কদম্ব-খণ্ডীতে।
তৈছে মূর্ত্তি দরশন করে আচম্বিতে॥

(দাসরাজগণের হস্তে) বৃন্দাবনের অধিকাংশ স্থান জনমানবশূন্য বিজন অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। তবু কোনো কোনো স্থানে বিরলবসতি মনুষ্যাবাসও যে না ছিল এমন নহে। "ভক্তি-রত্নাকর" বলিতেছেন 'শ্রীগোবিন্দ জীউকে' প্রকাশ করিতে গিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী—

"ব্রজবাসী ঘরে ঘরে অন্বেষণ করি।
যমুনার তীরে রহে ধৈর্য্য পরিহরি॥"
"শ্রীরূপে শ্রীবৃন্দা স্বপ্নচ্ছলে জানাইল।
ব্রহ্মকুণ্ড-তট হইতে তাঁরে প্রকাশিল॥"

তাহা হইলেই তো ব্রজবাসী এবং ব্রহ্মকুণ্ড প্রভৃতির অস্তিত্ব তখনো বর্ত্তমান ছিল, বুঝা যায়।

সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রভুর আনন্দিত মন।
প্রেম-জলে দোঁহা অঙ্গ করিলা সেচন ॥
প্রণিপাত করে দোঁহে আনন্দ হিয়ায়।
প্রেমের বন্যায় উঠে 'থাহা' নাহি পায় ॥
কভু হাসে কভু কাঁদে কভু করে স্তব।
কভু নিঃশব্দে রহে কভু উচ্চৈঃস্বর (রব) ॥
কভু স্তুতিবাণী কহে কভু করে দম্ফ।
উদ্দণ্ড নৃত্য করে পৃথিবী হয় কম্প ॥
কহে তুমি বৃন্দাবনের ব্রজেন্দ্রনন্দন।
ব্রজবাসীর প্রাণধন রাধার জীবন ॥

*　*　*　*

এতবলি ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
প্রেমের বন্যায় হাসে—কাঁদে স্থির নাহি পায় ॥"

বনমালী দাস লিখিয়াছেন, কবি-দম্পতী দ্বাদশ বৎসর কাল শ্রীবৃন্দাবনধামে বাস করেন। অতঃপর তিরোভাব। কিন্তু তদ্‌বৃত্তান্ত জানিবার কোনো উপায় নাই। কারণ বনমালী দাসের জয়দেব-চরিত্রের শেষ পত্রখানি পাওয়া যায় নাই। শ্রীক্ষেত্রে—শ্রীগীত-গোবিন্দের প্রচার-কাহিনী প্রভৃতিও জয়দেব-চরিত্রে বর্ণিত হয় নাই। এ বিষয় ভক্তমালে যেরূপ বর্ণিত আছে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। নাভাজীকৃত হিন্দি-ভক্তমাল ও চন্দ্রদত্ত-প্রণীত সংস্কৃত ভক্তমালে বর্ণিত বৃত্তান্ত প্রায়ই একরূপ। আমরা নাভাজীকৃত হিন্দি-ভক্তমালের শ্রীমৎকৃষ্ণদাস বাবাজী কৃত পদ্যানুবাদ গ্রহণ করিলাম। ভক্তমালে শ্রীজয়দেব-চরিত্রের আরম্ভ-ভাগ এইরূপ—

"এবে কহি শ্রীল জয়দেবের চরিত্র।
শ্রবণ-সুখদ আর পরম পবিত্র ॥
কেন্দুবিল্ব নামে গ্রাম সাগর হইতে।
শ্রীমান জয়দেব দ্বিজ হইলা বিদিতে ॥
শ্রীল পুরুষোত্তম মহাকাশ গিয়া।
বন্ধুত্ব করিল অন্ত পূর্ণচন্দ্র পায়্যা ॥
উভয় প্রণয়-রসে ভেট দোঁহে করে।
পুরুষোত্তম চন্দ্র দিল স্ত্রীরত্ন সাদরে ॥

জয়দেব চন্দ্র নিজ বন্ধুর চরিত।
বর্ণন করিলা করিয়া মোহিত ॥"

পদ্মাবতী-পরিণয়, শ্রীগীত-গোবিন্দ রচনা এবং তাহাতে 'দেহি পদপল্লব মুদারম্' পদ শ্রীভগবানের নিজ হস্তে লিখিয়া দেওয়া প্রভৃতি বিবরণ জয়দেব-চরিত্রের অনুরূপ। তবে ভক্তমাল পাঠ করিয়া মনে হয়, বিবাহ যেন শ্রীক্ষেত্রেই হইয়াছিল; বিবাহান্তে 'ঝোপড়া' ধরিয়া শ্রীরাধা-মাধবের সেবা প্রকাশ করিয়া জয়দেব গোস্বামী যেন শ্রীক্ষেত্রেই বাস করিয়াছিলেন। শ্রীরাধা-মাধব বিগ্রহ জয়দেব গোস্বামী কোথায় পাইয়াছিলেন, ভক্তমালে তাহার উল্লেখ নাই। জয়দেব-চরিত্রে যাহা আছে, পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভক্তমালকার ভ্রমে পড়িয়া বীরভূমির কেন্দুবিল্বকে শ্রীধাম পুরুষোত্তমের সন্নিকটে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে পদ্মাবতীর ন্যায় জয়দেবেরও জন্ম হইয়াছিল দক্ষিণদেশে। কিন্তু বীরভূমিই যে জয়দেব গোস্বামীর জন্মভূমি, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং সে বিষয়ে কোন তর্ক করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রমমাত্র। সুদূর রাজপুতনায় বসিয়া নাভাজী তাঁহার ভক্তমাল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে—

"অসাধারণ গুণ সাধুর অপার মহিমে।
যাঁর স্নান অনুরোধে গঙ্গা আইল গ্রামে ॥
কেন্দুবিল্ব হইতে গঙ্গা হয় আঠার ক্রোশ।
প্রতিদিন গঙ্গা স্নান করে বারমাস ॥"

গঙ্গার এই দূরত্ব যে, বীরভূমির কেন্দুবিল্ব হইতেই নির্ণীত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। তিন শত বৎসরের পুরাতন বনমালী দাসের জয়দেব-চরিত্রও এবিষয়ে কম প্রামাণ্য নহে। কিন্তু যাউক সে কথা।

শ্রীগীত-গোবিন্দের সুধা-সুমধুর সঙ্গীত-লহরী যে, নীলাচলটীকে ডুবাইয়া দিয়াছিল, ভক্তমালের নিম্নোক্ত শ্লোকটী হইতেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ভক্তমাল বর্ণন করিতেছেন—

"অদ্যাবধি জগন্নাথ ত্রিসন্ধ্যা যে গীত।
না শুনিলে নাহি হয় নিদ্রাহার-নিত ॥" (৭)

(৭) অতি সত্যকথা। পুরীর মত শ্রীগীত-গোবিন্দের এত বহুল প্রচার আর কোথাও নাই। তাঁহার জন্মভূমি, বীরভূমিতেও নহে। পুরীবাসীর মুখে মুখে এখনো ঐ গান। অন্ততঃ একটা পদও না গাহিতে পারে পুরীতে এমন লোক বোধ হয় খুব কম। কত বিপ্লব—

প্রবাদ যে, শ্রীগীত-গোবিন্দের প্রসিদ্ধি দেখিয়া শ্রীক্ষেত্রের তদানীন্তন অধীশ্বরের মনে এইরূপ একখানি গ্রন্থ প্রণয়নের বাসনা বলবতী হয়। অবিলম্বে তিনি একখানি অভিনব গীত-গোবিন্দ প্রণয়ন করিয়া শ্রীক্ষেত্রের সর্ব্বত্রই তাহা গীত হইবার আদেশ প্রদান করেন। অমাত্য-সভাসদবর্গ ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলে পরীক্ষা-মানসে পুরীরাজ নিজকৃত ও কবিরাজকৃত গীত-গোবিন্দ দুইখানি শ্রীমন্দিরে প্রভু-সান্নিধ্যে পাশাপাশি স্থাপন করিয়া দ্বাররোধ করিয়া দেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বারউদঘাটন করিয়া দেখেন, প্রভু কবিরাজকৃত গ্রন্থ হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার প্রণীত গ্রন্থখানি চরণে ক্ষেপণ করিয়াছেন। অভিমানী পুরীরাজ এজন্য আত্মহত্যার বাসনা করিলে দৈববাণী হইল—

"জয়দেব কৃত গ্রন্থ দ্বাদশ যে সর্গে।
তব কৃত বার শ্লোক থাকিবেক অগ্রে ॥"

বোম্বাই "নির্ণয়-সাগর-যন্ত্রে" মুদ্রিত তুকারাম জাবজী কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীগীত-গোবিন্দ গ্রন্থখানিতে শেষভাগে যে কয়েকটী শ্লোক সন্নিবেশিত হইয়াছে, বস্তুতই তাহা জয়দেবের রচিত বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারেন না। সে গুলির মূলে এইরূপ কোনো কিছু নিহিত থাকা অসম্ভব নহে। বঙ্গীয় সংস্করণে ঐ অতিরিক্ত শ্লোকগুলি পাওয়া যায় না। টীকাকার পূজারী গোস্বামীর "বাল-বোধিনী" টীকায়ও উক্ত শ্লোকগুলি ব্যাখ্যাত হয় নাই। কিন্তু মেবারেশ্বর রাণা কুম্ভ তাঁহার "রসিকপ্রিয়া" নাম্নী টীকায় সে গুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রাণা হয়তো পুরুষোত্তম-প্রচলিত গ্রন্থ দৃষ্টে টীকা রচনা করিয়া থাকিবেন। (৮)

কত ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে, পুরীবাসী জয়দেবকে এখনো ভুলিতে পারে নাই। তবে শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে শ্রীগীতগোবিন্দ-গীতি ;—অতীতের সেই সুখময়ী স্মৃতির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। বেশ সুবিশুদ্ধ তান-লয়ে গীত হইতে কচিৎ কাহারো মুখে শুনিয়াছি। বর্ত্তমানে সে প্রাণময়ী সেই উন্মাদনাময়ী গীতিরব সমুদ্র-কল্লোলে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

(৮) শ্রীগীত-গোবিন্দের বঙ্গীয় সংস্করণে একাদশ স্বর্গের শেষভাগে—

"ভজন্ত্যা স্তুলাস্তং———হৃদয়ং মৃগদৃশঃ"

শ্লোকটীর পরে রসিকপ্রিয়াকার নিম্নোক্ত শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছেন—

"সানন্দং নন্দসুনুর্দিশতুমিতি পরং সংমদং মন্দ মন্দং
রাধামাধায় বাহ্বোর্ব্বিবর মনুদৃঢ়ং পীড়য়ন প্রীতিযোগাৎ ॥
তুঙ্গৌ তস্যা উরোজাবতনু বরতনৌ নির্গতৌ মাস্মভূতাং
পৃষ্ঠং নির্ভিদ্য তস্মাদ্বহিরিতি বলিতগ্রীবমালোকয়ন্ বঃ ॥"

ভক্তমালে বর্ণিত হইয়াছে, জয়দেব গোস্বামীর বেড়া বাঁধিবার কালে একদিন শ্রীরাধামাধব পদ্মাবতীরূপে বেড়ার ওপারে দাঁড়াইয়া দড়ির 'গিরো' ফুঁড়িয়া দিয়াছিলেন।

"আর একদিন জয়দেব রূপ ধরি।
পদ্মা-হস্ত পাক অন্ন খাইলা ছল করি॥"

এইরূপ আনন্দেই কবি-দম্পতির দিন কাটিত। একদিন দেব-সেবার অর্থ-সংগ্রহের জন্য জয়দেব স্থানান্তরে গমন করেন। প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে একদল দস্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া হস্ত-পদ কাটিয়া দেয় এবং একটী কূপে নিক্ষেপপূর্ব্বক পলায়ন করে।

বঙ্গীয় সংস্করণে "অভিসারিকা-বর্ণনে সানন্দ গোবিন্দো নাম" একাদশ সর্গের পরিসমাপ্তি-মূলক শ্লোকটীর পরেই রসিকপ্রিয়ায় এই শ্লোকটী উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

"সৌন্দর্য্যৈক নিধেরনঙ্গললনা-লাবণ্যলীলা যুবো-
রাধায়া হৃদিপল্লবে মনসিজক্রীড়ৈকরঙ্গস্থলে।
রম্যোরোজসরোজখেলনরসিত্যাদাত্মনঃ খ্যাপয়ন্
ধ্যাতুর্মানস রাজহংস নিভৃতাং দেয়াম্মুকুন্দো মুদং॥"

বঙ্গীয় সংস্করণে দ্বাদশ সর্গে পূজারী গোস্বামীর টীকায়—

"ত্বামপ্রাপ্য ময়ী স্বয়ংবরপরাং ক্ষীরোদ-তীরোদরে
শঙ্কে সুন্দরী কালকূটমপিবন্মূঢ়ো মৃড়ানিপতি।
ইত্থং পূর্ব্ব কথাভিরন্য মনসো নিক্ষিপ্য বক্ষোঽঞ্চলং
রাধায়াঃ স্তনকোরকোপরি মিলন্নেত্র হরি পাতু বঃ।"

এই শ্লোকটী ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু রসিকপ্রিয়াকার ইহা গ্রহণ করেন নাই। আবার গ্রন্থ পরিসমাপ্তিকালে বঙ্গীয় সংস্করণে যেখানে—

"পরাশরাদি প্রিয় বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীত-গোবিন্দকবিত্ব মস্তু"

সমর্থিত হইয়াছে; রসিকপ্রিয়াকার তাহার পরেও নীচের শ্লোকটীর উল্লেখ করিতেছেন—

"ইত্থং কেলী ততীর্বিহৃত্য যমুনাকূলে সমং রাধয়া-
তদ্রোমাবলীমৌক্তিকাবলীযুগে বেণীভ্রমং বিভ্রতী।
তত্রাহ্লাদিকুচপ্রয়াগফলয়োর্লিপ্সাবতোর্হস্তয়ো
র্ব্যাপারাঃ পুরুষোত্তমস্য দদতু স্ফীতামুদাং সম্পদম্।"

আমাদের মতে এই চারিটী শ্লোকের মধ্যে যে কোন তিনটী শ্লোকের বারটী চরণ—

"জয়দেব কৃতগ্রন্থে দ্বাদশ যে সর্গে
তব কৃত বার শ্লোক থাকিবেক অগ্রে"

পয়ারটীর সার্থকতা-সাধন করিতেছে।

সেই পথে মৃগয়ায় গিয়া পুরীরাজ তাঁহার উদ্ধারসাধন করেন। কিয়দ্দিন গতে কবি একটু সুস্থ হইলে পর তাঁহার পরিচয়-লাভে আনন্দিত হইয়া রাজা কবির মনোমত কোনো প্রিয়কার্য্য সম্পাদনে ইচ্ছুক হন এবং কবির অভিমত অনুসারে একটী বৈষ্ণব-সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন। কিয়দ্দিবস ধরিয়া সমারোহের অবধি রহিল না। প্রত্যহ শত শত বৈষ্ণব পুরীরাজের আতিথ্য-গ্রহণ করিয়া, প্রেমিক-চূড়ামণি জয়দেবের মধুর আলাপে আপ্যায়িত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থবোধ করিতে লাগিলেন। কৌতূহল-চরিতার্থতার জন্ত বৈষ্ণবের স্তায় মালা-তিলক ধারণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত দস্যুগণও পুরীরাজ-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইচ্ছা, "গোলে হরিবোল" দিয়া দুই পাঁচদিন ভোজনানন্দ উপভোগ করিবে। কিন্তু রাজবাটীতে পৌছিয়া দেখে সর্ব্বনাশ! তাহাদেরই হস্তে হস্ত-পদহীন সেই পথিক (জয়দেব) এখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা। কিন্তু তখন আর পলায়নের উপায় নাই। সুতরাং দস্যুদলও সে বিষয়ে কোন ব্যর্থ-প্রয়ত্ন না করিয়া সুবুদ্ধির মত রহিয়া গেল। এদিকে জয়দেব গোস্বামী যতই তাহাদের আদর-যত্ন করিতে লাগিলেন, চোরের দল ততই উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল। তাহারা ভাবিতে লাগিল, এ আর কিছুই নহে কেবল ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা। এখানে এই প্রলোভন দিতেছে, আর অন্যত্র হয়তো কোনো গুরু-দণ্ডের, চাই কি চরম দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেছে'। তবু পলায়নের তো উপায় নাই। রাজা বলিয়া দিয়াছেন, বাবাজীর অনুমতি ব্যতীত কেহই এ স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারিবেন না। বাবাজীর নিকট যাইতেও তাহাদের সাহস হয় না; অতঃপর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহারা রাজাকেই ধরিয়া বসিল যে, তিনিই বাবাজীর অনুমতি আনিয়া দিউন। অনুরোধে পড়িয়া রাজা জয়দেবের নিকট অনুমতি আনিতে গেলেন। কবিবর সম্মত হইলেন, বলিয়া দিলেন, উহাদিগকে প্রচুর ধন দানে সন্তোষ করিয়া দিবেন। তাহাই হইল। রাজা দস্যুদিগকে প্রচুর অর্থাদিসহ বিদায় দিলেন এবং প্রদত্ত অর্থাদি তাহাদের গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দিবার জন্ত বাহক সঙ্গে দিলেন। কতকদূর গিয়া দস্যুগণ বাহক-দিগকে ফিরিয়া যাইতে বলিল। বাহকেরা "রাজার সেরূপ আদেশ নাই বলিয়া" চলিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সাহস প্রাপ্ত হইয়া বাহকেরা জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, বহুশত বৈষ্ণব আসিয়াছিলেন, কিন্তু আপনাদের মত সম্মান প্রাপ্ত হইতে আমরা অপর কাহাকেও দেখিলাম না। অবশ্যই কোনো কারণ থাকিবে, জানিবার জন্ত আমরা অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়াছি।" পাপিষ্ঠ দস্যুগণ বাহকগণের

নিকট প্রশংসিত হইবার জন্ত মিথ্যা করিয়া এক গল্প ফাঁদিয়া বসিল। একজন বলিল "ঐ বাবাজী ও আমরা এক রাজবাড়ীতে চাকুরী করিতাম। তন্মধ্যে আমিই প্রধান ছিলাম। একদিন কোনো অমার্জ্জনীয় অপরাধে জয়দেবের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে দয়াপরবশ হইয়া আমিই সে যাত্রা উহাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। বহু অনুনয়ের পর ঘাতকেরা উহার হাত-পা কাটিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। ভণ্ড আজ সাধু সাজিলেও আমাদিগকে চিনিতে পারিয়াছে; সুতরাং পাছে আমরা সকল কথা প্রকাশ করিয়া দেই, এইজন্ত আমাদিগকে ধনদানে সম্মানিত করিয়াছে।" দস্যুদলের এই ইতর-জনোচিত বাক্যে রাজ-ভৃত্যগণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। নিদারুণ ভূমিকম্পে দস্যুগণের পদ-নিম্নস্থ ভূমি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া কৃতঘ্নদিগকে চিরতরে গ্রাস করিয়া ফেলিল। পরিপূর্ণ পাপভার পৃথিবী আর কতদিন বহন করিবেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভৃত্যগণ কিছুক্ষণ পরে অর্থাদিসহ রাজ-সদনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দস্যুগণের শোচনীয় পরিণাম আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল। শ্রবণমাত্র বৈষ্ণব-চূড়ামণি জয়দেব অধীর হইয়া উঠিলেন। কাটা হস্ত-পদ ভূমিতে আছড়াইয়া দস্যুগণের জন্ত তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বিস্ময়ান্বিত-চিত্তে পুরীরাজ তাঁহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বহু অনুরোধের পর কবি বলিলেন 'উহারা চোর! অর্থলোভে বনমধ্যে উহারাই আমাকে বিকলাঙ্গ করিয়াছিল'। অত্যধিক বিস্ময়ে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন 'ঘৃণিত দস্যুদলকে এরূপে সম্মানিত করিবার প্রয়োজন?'

"সাধু কহে সবার অন্তরে সুখদান।
অর্থে বা সম্মানে এই কর্ত্তব্যবিধান॥
বিশেষ দুষ্টের প্রতি অদৈন্ত কর্ত্তব্য।
সঞ্চিতার্থ হৈলে পর হিংসা না করিব॥
কহিতে কহিতে হস্ত-পদ পূর্ব্ববৎ।
হৈল; সাধু অসাধুর এই দুই পথ॥"

শ্রীজয়দেবের বিকলাঙ্গতা দূরীভূত হইতে দেখিয়া রাজপুরী আনন্দ-ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। পুরীরাজ কৃতার্থলাভ করিলেন। (৯)

(৯) ইতিপূর্ব্বে পুরীরাজ যখন একখানি অভিনব গীত-গোবিন্দ প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, অনুমান হয় জয়দেবের সহিত তখন তাঁহার পরিচয় ছিল না। প্রবাদ জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দ লইয়া পুরীধামে আসিবার পূর্ব্বেই গীতগোবিন্দের গান জগন্নাথক্ষেত্রে বহুল

কবিরাজ-পত্নী পদ্মাবতীও রাজগৃহে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। একদা পুরীরাজের এক শ্যালক পরলোকগত হইলে তাহার ভার্য্যা সহমৃতা হইবার জন্য শ্মশানে গিয়াছেন—

"শুনিয়া কান্দয়ে রাণী, পদ্মা কহে তবে।
সহমৃতা হই অতি দূর প্রেমভাবে ॥
প্রিয়াহীন প্রাণ প্রিয়াহীন ক্ষণমাত্র।
বাহিরায় নাহি যদি কোন প্রেমপাত্র ॥"

কথা কয়টা রাণী ভুলিতে পারিলেন না। পদ্মাকে পরীক্ষার জন্য তিনি একদিন রাজাকে ধরিয়া বসিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে সম্মত করিতে পারিলেন না। শেষে নিজেই এক উপায় চিন্তা করিয়া কোনো পরিচারিকার দ্বারা পুরীরাজ-রাণী, পদ্মাবতীর নিকট জয়দেব গোস্বামীর অলীক মৃত্যু-সমাচার প্রেরণ করিলেন। সংবাদ সত্য কি মিথ্যা অনুসন্ধানের অবকাশ সহিল না', শুনিবামাত্রই পদ্মাবতীর প্রাণবিয়োগ হইল। দাসীর তো ভয়েই প্রাণ উড়িয়া গেল। সে উর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া রাণীকে সংবাদ দিল। পদ্মাবতীর এই অকালমৃত্যুতে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া রাণী ভীতি-বিজড়িত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। সংবাদ রাজার নিকট পৌঁছিল, তিনি জয়দেবের সহিত অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রাজ্ঞীসহ তাঁহার পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া পুনঃপুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

"গোস্বামীর চরণে পড়িয়া রাজা কহে।
গোসাঞী কহেন রাজা চিন্তা কিবা তাহে ॥
মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র কৃষ্ণনামাক্ষর।
কর্ণে শুনাইলে হবে পরাণ-সঞ্চার ॥
এত কহি সাধু যাই পদ্মার নিকটে।
কৃষ্ণ কহ বলিতেই চমকিয়া উঠে ॥"

বীরভূমের কবি জয়দেবের গোবিন্দ-সংগীত শ্রীধাম পুরুষোত্তমক্ষেত্রে কিরূপ প্রসারলাভ করিয়াছিল। সেই অবধি জয়দেবকে একবার দেখিবার জন্য পুরীরাজের একটা আগ্রহ হওয়া খুব স্বাভাবিক। বনমধ্যে হস্তপদহীন জয়দেবকে দেখিতে পাইয়া তাই তিনি সমাদরের সহিত তাঁহাকে গৃহে আনিয়াছিলেন এবং কবির প্রীতি-সংসাধনের জন্য মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পুরীরাজের অভিনব গীতগোবিন্দ প্রণয়নরূপ লজ্জাজনক ব্যাপার তাহার পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছিল, ইহা একরূপ নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল, ভক্তমালে বর্ণিত নিম্নের উপাখ্যানটী হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

"মালীর দুহিতা এক বার্ত্তাকুর ক্ষেতে।
বার্ত্তাকু উঠায় আর গায় আনন্দেতে॥
জগন্নাথ নিজ লীলা বিশেষ আখ্যান।
শুনিয়া মগন চেষ্টা প্রেয়সীর গুণ॥
মালিনীর পশ্চাতে শুনিতে ধাবমান।
কোমল শ্রীপাদ-পদ্মে ফুটে শিলা-কণ॥
কণ্টকে ছিণ্ডিল শ্রীঅঙ্গের মিহি বস্ত্র।
উড়ুনীতে বিদ্ধি রহে কণ্টকিত পত্র॥
মন্দিরে আইলা যবে ছিন্নভিন্ন বেশ।
দ্বার খুলি পাণ্ডাগণ ভাবয়ে অশেষ॥
বস্ত্র মাল্য অলঙ্কার অঙ্গে ছিণ্ডিয়াছে।
বার্ত্তাকুর কাঁটা বস্ত্রে বিদ্ধি রহিয়াছে॥
রাজা আসি চমৎকৃত করয়ে স্তবনে।
কোথা গিয়াছিলে প্রভু অলভ্য কি ধনে॥
* * * * * *
কাতর অন্তরে রাজা নয়নের জলে।
ভাসিয়া কহিল যবে হইয়া বিকলে॥
প্রত্যাদেশ করিয়া দয়াল জগন্নাথ।
বিশেষ কহিলা তবে নৃপতির নাথ।"

শ্রীজগন্নাথদেবের প্রত্যাদেশে সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়া—

"চমৎকার ভাবে রাজা, মালিনীর আগে।
শিবিকা পাঠায়ে আনে বহু অনুরাগে॥
জগন্নাথ সম্মুখে সে পরম আনন্দে।
গাইল গোবিন্দ-গীতি পরম প্রবন্ধে॥
অদ্যাপিহ তাহার সন্তান প্রভু আগে।
শ্রীগীত-গোবিন্দ গান করে সন্ধ্যাভাগে॥" (১০)

(১০) ভক্তমালে বর্ণিত আছে যে, এই কাহিনী শুনিয়া একজন মোগল-অশ্বারোহী ঐকান্তিকভাবে শ্রীগীতগোবিন্দ গান করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই ঘটনার পর হইতে রাজাজ্ঞা প্রচারিত হয় যে, 'কুৎসিত স্থানে অথবা গমনাগমন সময়ে কেহ শ্রীগীতগোবিন্দ গান করিলে সে দণ্ডিত হইবে।'

কবি-দম্পতীর শ্রীবৃন্দাবনধাম-যাত্রা ও শ্রীরাধামাধবের শালগ্রাম-মূর্ত্তি-গ্রহণ প্রভৃতি বৃত্তান্তও ভক্তমালে বর্ণিত আছে। ভক্তমালের মতে—

"বৃন্দাবন-ধাম দেখি পুলক হইলা।
কেশী-ঘাট-সন্নিধানে আনন্দে রহিলা॥
কোনো মহাজন রাধামাধবে হেরিয়া।
আর্দ্র হইয়া দিলা মন্দির-বানাইয়া॥
কবিরাজ অপ্রকটে বহুকাল পরে।
ঠাকুর লইয়া রাজা গেলা জয়পুরে॥
অদ্যাবধি তথা ঘাটি নাম রম্যস্থানে।
বিরাজ করেন চাঁদ-ঝলকে বদনে॥"

'জয়দেব-চরিত্র', 'ভক্তমাল' ও স্থানীয় কিম্বদন্তী প্রভৃতি আলোচনা করিয়া এই শ্রীজয়দেব-জীবনী সঙ্কলিত হইল। যাঁহারা অলৌকিক কিছু বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের নিকট ইহা পণ্ডশ্রমমাত্র মনে হইবে। আমাদের কাহারো নিকট কিছু বক্তব্য নাই। জয়দেব আমাদের,—এই হৃত-সর্ব্বস্ব বীরভূমির বড় গৌরবের ও বড় আদরের। তাই তাঁহার সম্বন্ধে যেখানে যাহা-কিছু পাইয়াছি, সাধ্যমত সংগ্রহ করিয়াছি, উদ্দেশ্য আত্ম-তৃপ্তি। কাহারো বিরক্তি-জনক হইলেও উপায় নাই।

সংস্কৃত-সাহিত্যরূপ রত্নভাণ্ডারে আরো দুই একজন জয়দেবের সন্ধান পাওয়া যায়। (১১) বলা বাহুল্য যে, শ্রীগীত গোবিন্দ-প্রণেতা আমাদের এই কেন্দু-বিল্বের কবিরাজ, তাঁহাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যক্তি। "শৃঙ্গারমাধবীয় চম্পূ-" প্রণেতা একজন কবির নাম ছিল 'জয়দেব', উপনাম তাঁহার 'কৃষ্ণদাস'। পিতামাতার নাম অজ্ঞাত। আরো একজন 'জয়দেব' ছিলেন, তাঁহার উপাধি ছিল 'পীযূষবর্ষ'। পিতার নাম ছিল মহাদেব, মাতার নাম সুমিত্রা। তিনি কৌণ্ডিন্যগোত্রসম্ভূত। 'চন্দ্রালোক-অলঙ্কার' ও 'প্রসন্ন রাঘবনাটক' নামক গ্রন্থ

(১১) শ্রীগীত-গোবিন্দের টীকাকারগণের মধ্যে আমরা তিনজনের নাম প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রথম 'বালবোধিনী' প্রণেতা পূজারী গোস্বামী। ইঁহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ২য় 'রসমঞ্জরী' রচয়িতা—মহামহোপাধ্যায় শঙ্কর মিশ্র।' ইনি শালীনাথ নামক কোনো ব্যক্তির আজ্ঞায় এই টীকা রচনা করেন। পিতার নাম দীনেশ্বর, ইহাই তাঁহার একমাত্র পরিচয়।

দুইখানি তাঁহারই প্রণীত। 'চন্দ্রালোকালঙ্কারে অভিধা স্বরূপাভিধানো নাম দশম ময়ূখ" সমাপ্তি-ভাগে তিনি বলিতেছেন—

"পীযূষবর্ষ প্রভবং চন্দ্রালোকমনোহরং।
সদা নিধানমাসাদ্য শ্রদ্ধয়াং বিবুধামুদং ॥
জয়তি যাজক শ্রীমন্মহাদেবাঙ্গজন্মনঃ।
সুক্তপীযূষবর্ষস্য জয়দেবকবের্গিরঃ॥"

৩য় 'রসিকপ্রিয়া' প্রণেতা (মেদপাট) মেবাড় দেশের রাণা কুম্ভকর্ণ। তিনি বংশতালিকা দিতেছেন—

বাপ্পারাও
|
হাম্বীর
|
ধারী
|
ক্ষেত্রসিংহ
|
লক্ষ
|
মুকুলেন্দ্র
|
কুম্ভকর্ণ (মহিষী অপূর্ব্ব দেবী)

পরিচয়-শ্লোক—

"ততো ভবল্লক্ষ উত্থিত লক্ষ বিপক্ষ পক্ষ ক্ষয় কারঃ দক্ষ
গয়া বিমোক্ষাঃ স্থিত ধর্ম্মরক্ষা সথ্য কৃত কৃত এথা সমস্ত লক্ষ
তন্নন্দনো নির্জ্জিতঃ পূর্ব্বরাজ চারিত্র সংপাদনিক মেদিনীক
শ্রীমুকুলেন্দ্র প্রণতারি মৌলি মাণিক্য আভাম্বিত পাদপদ্ম
শ্রীকুম্ভকর্ণ স্তদমু ক্ষীতিন্দ্র ক্ষিতিং বিভর্ত্তিন্দ্র সমান সারঃ
শেষা দিকেভ্য ধরণে ধরিত্রী তন্নস্তা বিশ্রানিত বিশ্রমন্তন"

ইনি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। রসিকপ্রিয়ায় ইঁহার পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রসিকপ্রিয়া হইতে নিম্নোক্ত মঙ্গলাচরণ শ্লোকটী উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"কল্যাণং কমলাপতির্দ্দিশতু মে যঃ কৌস্তভে রাধয়া
বিক্ষসাং প্রতিবিম্বিতং প্রতি যুবত্যোষ্যাতি তর্কাকুলং
আশ্লেষাম্মুখয়াপি মান পরয়া মন্থাম্বয়া কৈতবং
তির্য্যক বক্রিতে কন্ধরং বলিতয়া সাসূয়মালোকিতং।"

বনমালী দাস লিখিয়াছেন,—

"ভিক্ষা মেগে খায় থাকে শিবের মণ্ডপে
নাচে গায় কাঁদে সদা হরিনাম জপে"

সে মণ্ডপ নাই, তবে শিব আছেন। স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস, কুশেশ্বর শিবমণ্ডপেই জয়দেব বিশ্রাম করিতেন। কেন্দুলী-পাটের অদূরে পূর্ব্ব-দক্ষিণাংশে অজয়-তীরে এই শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান রহিয়াছেন।(১২)

শিব-সমীপবর্ত্তী একখণ্ড প্রস্তরে অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত আছে। অনেকেই সেটীকে "ভুবনেশ্বরী-যন্ত্র" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। ঐ যন্ত্রে অভীষ্টা-রাধনা করিয়া জয়দেব শক্তিমন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, কেন্দুবিল্বে এখনো এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। শ্রীজয়দেব প্রতিষ্ঠিত এবং স্বয়ং শ্রীভগবান সম্পূজিত শ্রীরাধামাধব-বিগ্রহ যে জয়দেবের সহিত কেন্দুবিল্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে বহুবার তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কেন্দুবিল্বে অধিষ্ঠিত শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ শ্যামারূপার গড় হইতে আনীত হইয়াছেন। বর্দ্ধমানের মহারাণী নৈরাণী দেবীকর্ত্তৃক অনুমান ১৬১৪ শকাব্দায় রাধাবিনোদ জিউর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়। (মন্দিরে এক খানি শিলালিপি ছিল, যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহারা বলেন, শিলালিপিতে ১৬১৪ শক অঙ্কিত ছিল। শিলালিপিখানি হারাইয়া গিয়াছে।) (১৩)

শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে আগত স্বর্গীয় রাধারমণ ব্রজবাসী কেন্দুবিল্বের গদির প্রতিষ্ঠাতা। তৎপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরামচন্দ্র জিউ, শ্রীমন্মহাপ্রভুজিউ ও রাজ-রাজেশ্বর

(১২) বিগত ১৩১৬ সালের ১৪ই আশ্বিন তারিখে আরম্ভ হইয়া এই কুশেশ্বর শিবের মস্তক হইতে অবিরত উৎসারিত সলিল-উৎস তিন দিন স্থায়ী হইয়াছিল। (শিবের প্রায় অর্দ্ধেকাংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তন্মধ্যে এক সুড়ঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই পথ হইতেই জলধারা নির্গত হইয়াছিল।) সন ১৩২০ সালের আর একবার ঐরূপ ঘটনা ঘটে। জল গঙ্গাজলের মত নির্ম্মল এবং বহুদিন অবিকৃত ছিল। স্থানীয় বহুলোকে দুইবারই ঐ জল সংগ্রহ করিয়া আপন আপন গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। সাময়িক সংবাদপত্রে তখন এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেকে স্বচক্ষেও এই জলনির্গত হইতে দেখিয়াছিলেন।

(১৩) শ্যামারূপার গড়ে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ জিউর যাঁহারা সেবাইৎ ছিলেন, কেন্দুবিল্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁহাদের পরিবর্ত্তে কেন্দুবিল্ব গ্রামবাসী অধিকারীবংশীয় ব্রাহ্মণগণকে সেবাইৎ নিযুক্ত করা হয়। অধিকারীগণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এই বংশে সুশীলকুমার অধিকারী প্রভৃতি বর্ত্তমান রহিয়াছেন। শ্যামারূপার দেবীর সেবাইৎগণও কেন্দুবিল্বের অধিবাসী। এই বংশে কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বর্ত্তমান আছেন।

শালগ্রাম-মূর্ত্তি কেন্দুবিল্বে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহারই উত্তরাধিকারী শিষ্য-বৃন্দ কেন্দুবিল্ব-পাটের মোহান্ত বলিয়া বিখ্যাত। রাধারমণ ব্রজবাসী-সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, একদা তিনি বর্দ্ধমান-রাজবাটীতে ভিক্ষার্থ গিয়া অবজ্ঞাত হওয়ায় আপনার কাঁথাখানি তথায় রাখিয়া দিয়া চলিয়া আসেন। কাঁথাখানি স্থানান্তরিত করিতে রাজহস্তী পর্য্যন্ত অপারগ হইলে তৎসাময়িক বর্দ্ধমানাধিপতি সসম্মানে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত দেব-সেবার জন্য দৈনিক ১৲ হিসাবে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। (বর্ত্তমানে সে বৃত্তি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।) এই সিদ্ধপুরুষ জীবন্ত-সমাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াও প্রবাদ প্রচলিত আছে। কেন্দুবিল্বে তাঁহার সমাধি-মন্দির বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্বর্গীয় রাধারমণ ব্রজবাসীর পরবর্ত্তী শিষ্যগণ—

রাধারমণ
|
ভরতদাস
|
প্যারিলাল
|
হীরালাল
|
ফুলচাঁদ
|
রামগোপাল
|
সর্ব্বেশ্বর
|
(বর্ত্তমান গদির মালিক) মোহান্ত দামোদর ব্রজবাসী

কেন্দুবিল্ব এখন একটী অনতিবৃহৎ গ্রামমাত্র। বর্ত্তমানকালে এই গ্রামে ব্রাহ্মণ, অগ্রদানী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সৎগোপ, তাম্বুলী, কামার, নাপিত, ছত্রি, বৈরাগী, শুঁড়ি, কলু, ধোপা, যুগী, বাগদি, হাড়ি, বাউরি প্রভৃতি জাতির বাস। পাল ও পাত্র-উপাধিধারী সৎগোপ জাতি এই গ্রামের বনিয়াদি অধিবাসী। গ্রামে মুখোপাধ্যায় উপাধিধারী এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ গৃহস্থের বাড়ীতে ৺রাধাবল্লভ বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায়দের বাড়ীতেও এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন, নাম ৺প্রাণনাথ জীউ। পৌষ-সংক্রান্তি ভিন্ন আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময়ও কেন্দুবিল্বে বিশেষ সমারোহ হয়। মোহান্ত ফুলচাঁদ ব্রজবাসী একটী পিত্তলনির্ম্মিত রথ-প্রতিষ্ঠা করিয়া এই উৎসবের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়া গিয়াছেন।



কেন্দুবিল্ব—কুশেশ্বর শিবের বর্ত্তমান মন্দির

বীরভূম-বিবরণ



লাউসেন তলাও

কেন্দুবিল্বের অপরিমেয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের শেষচিহ্ন আজিও অন্তর্হিত হয় নাই। পশ্চিমে "বিল্ব-মঙ্গলের ঢিপি"; পূর্ব্বে 'লাউসেন তলাও', দক্ষিণে অজয়ের অপর তীরে "শ্যামারূপার গড়" তাহার মহিমান্বিত শ্রীকে আরও উজ্জ্বলতর করিয়া রাখিয়াছে। কেন্দুবিল্বের কথা উঠিলেই 'লাউসেন তলাও' এর কথা আসিয়া পড়ে। শ্যামারূপার গড় মনে পড়িয়া যায়। ইছাইএর উচ্চ দেউল নয়নপথে প্রতিবিম্বিত হয়। সে গুলিকে ছাড়িয়া দিলে কেন্দুবিল্ব-কাহিনী অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে তাই 'লাউসেন তলাও'-কাহিনী বিবৃত করিলাম।

(২)

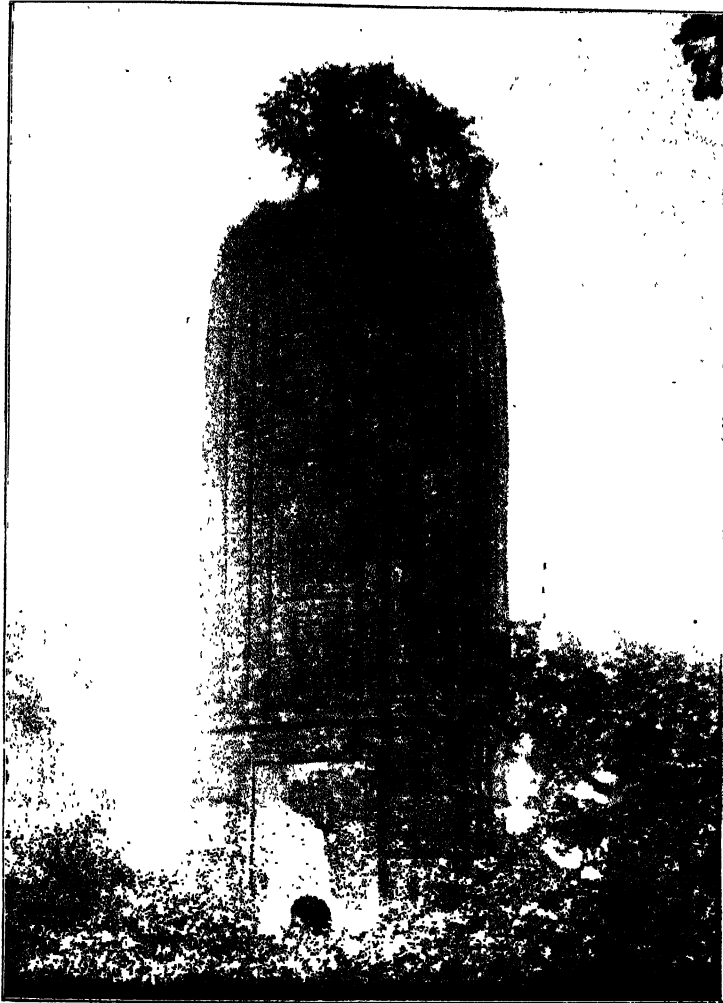
কেন্দুবিল্ব-কাহিনী

শ্যামারূপার গড় (ত্রিষষ্টিগড় বা: ঢেকুর)

লাউসেন তলাও

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কেন্দুবিল্বের অনতিপূর্ব্বে 'লাউসেন তলাও'। প্রবাদ শ্যামারূপার গড়ের অধীশ্বর ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া গৌড়েশ্বরের সেনাপতি লাউসেন যথায় শিবির সন্নিবেশ করেন, সেই স্থানই এখন লাউসেন-তলাও নামে বিখ্যাত। তথায় "লাউসেন কুণ্ড" নামক একটী কূপের ও "হাঁটুগাড়ি" নামক দুইটি পুকুরের কিছু কিছু অংশ আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে আসিয়া এতদঞ্চলের ডোমজাতি প্রতি বৎসর ১৩ই বৈশাখ 'লাউসেন তলাও'য়ে তাহাদের স্বজাতি কালুবীরের পূজা করিয়া থাকে। এই কালুবীর (ডোম) লাউসেনের সেনাপতি ছিল। কেহ বলিতে পারে না, ১৩ই বৈশাখের সহিত কালুবীরের কি সম্বন্ধ আছে। ধর্ম্মমঙ্গলে উক্ত হইয়াছে, জনৈক ছদ্মবেশী শত্রুর নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়া কালুবীর তাহাকে নিজের মাথা কাটিয়া উপহার দিয়াছিল। সে কি ঐ ১৩ই বৈশাখ? অথবা রণজয়ী কালুবীর ইছাইয়ের সেনাপতি লোহাটা বজ্জরকে নিহত করিয়া লাউসেনের নিকট শিবিরে ফিরিয়াছিল ১৩ই বৈশাখ। কে জানে কোন অজ্ঞাতকারণে সেই গোময়-কুণ্ডের সুরভি কমল আজিও তাহার স্বজাতিগণের নিকট হইতে ভক্তির অর্ঘ্য প্রাপ্ত হইতেছে। লাউসেন তলাওয়ের অনতি-দক্ষিণে প্রবাহিত অজয়নদ পূর্ব্বাভিমুখে সুরধুনী উদ্দেশে প্রস্থান করিয়াছে। অজয়ের দক্ষিণ তটে ইছাই ঘোষের সুপ্রসিদ্ধ দেউল ও বহু প্রাচীন শ্যামারূপার গড়। ইছাই ও লাউসেনের যুদ্ধক্ষেত্র এক্ষণে অজয়-গর্ভে বিলীন হইয়াছে। লোকে বলে যুদ্ধক্ষেত্রের নাম 'কাঁদুনে-ডাঙ্গা'। মা শ্যামারূপা, প্রিয়ভক্ত ইছাইয়ের মৃত্যুতে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তিনি ইছাইকে যুদ্ধযাত্রা করিতে নিষেধ করিয়া দৈববাণী করিয়াছিলেন, ইছাই তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। ইহাতেই তাঁহার বেশী দুঃখ হইয়াছিল। দৈববাণী হইয়াছিল :—

কাঁদুনেডাঙ্গা



ইছাই ঘোষের দেউল।

"শনিবার সপ্তমী সম্মুখে বারবেলা।
আজি রণে যেওনারে ইছাই গোয়ালা॥"

ছড়াটী কেন্দুবিল্ব-অঞ্চলের লোকের মুখে মুখে গীত হয়, কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গলে পাওয়া যায় না। কাঁদুনে-ডাঙ্গায় ইছাইয়ের আত্মীয়-স্বজনের ক্রন্দন করাও স্বাভাবিক। যাহাহউক, যোদ্ধার ক্রীড়াক্ষেত্র যে এতদঞ্চলের লোকের নিকট এখন কাঁদুনেডাঙ্গায় পরিণত হইয়াছে তাহাতে সংশয় নাই। "কালস্য কুটীলাগতি!"

অজয়ের দক্ষিণে কাঁদুনেডাঙ্গা। কাঁদুনেডাঙ্গার দক্ষিণে "টুমুনি" নামক একটী ক্ষুদ্র নদী তাহাকে দ্বীপাকারে বেষ্টন করিয়া নাতিপূর্ব্বদিকে অজয়ের সহিত মিলিত হইয়াছিল। টুমুনি এখন কাঁদুনে ডাঙ্গার (পশ্চিমে) পিছনে লাগিয়া আপনার সহিত তাহাকেও অজয়ে মিলিত করিয়া দিয়াছে। টুমুনির দক্ষিণে একটী সুপ্রশস্ত রাজপথ ও দুইটী সুবৃহৎ (গড়ের বহিঃ) প্রাচীর বিদ্যমান ছিল। ধান্যক্ষেত্রের মাঝে মাঝে কৃষকেরা আজিও তিনটী 'গড়-মুরচার' চিহ্ন দেখাইয়া দেয়। সে বিলুপ্তাবশেষও স্থানে স্থানে বিপুল। প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি, ইহার মধ্যে প্রথমটী রাজপথ ও শেষের দুইটী প্রকৃত মুরচা (প্রাচীর) ছিল। মুরচার দক্ষিণস্থ বিশাল পরিখা 'রক্তনালী' নামে এখন সত্য সত্যই একটী 'নালী'তে পরিণত হইয়াছে। (১) কিন্তু নালীর সমীপবর্ত্তী সুবৃহৎ বিলটী দেখিলেই ইহার পূর্ব্ব-বিশালতা অনুভব করা যায়। বিলের অধিকাংশই এখন ধানের ক্ষেতে পরিণত হইয়াছে। গড়ের নিম্নস্থিত (বিলের একাংশ) "ঠাকুরুণ পুকুর" নামক পুষ্করিণী হইতে বাহির হইয়া 'রক্তনালী' পরিখাটী পূর্ব্বদিকে কোটালপুকুর নামক গ্রামের পার্শ্বে গিয়া অজয়ের সহিত মিশিয়াছে। এই কোটালপুকুর গড়ের পূর্ব্বদিকের সেনানিবাস ছিল। 'কোটালের (গড়-রক্ষকের) থানা' ছিল বলিয়া কোটালপুকুর নাম। রক্তনালায় অবগাহন করিয়া সেনাচল বা সেন-পাহাড় নামক পাহাড়টী প্রায় ৮।১০ মাইল স্থান ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পাহাড়ের পূর্ব্বে অনতিদূরে ইছাই ঘোষের দেউল ও একটী প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ। লোকে বলে, ইছাই ঘোষ এই দেউল ও নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। দেউলের প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বে কোটালপুকুর। পাহাড়ের

গড়-সংস্থান

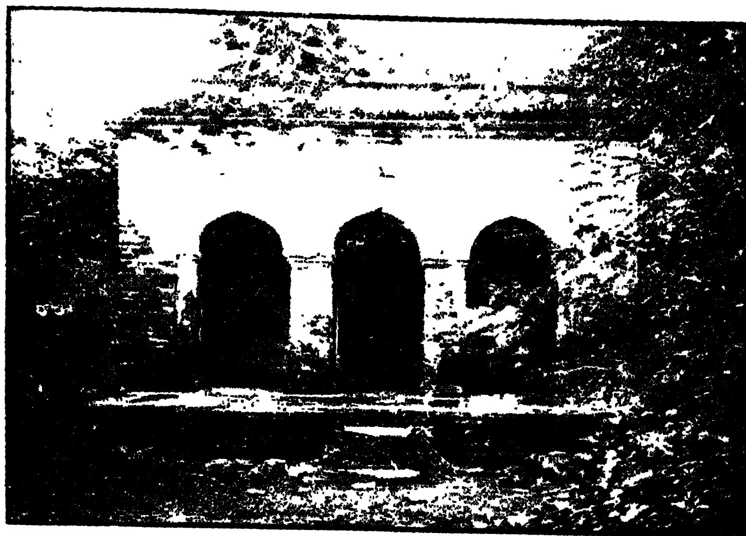
(১) প্রবাদ, শত্রুপক্ষ বিনা রক্তপাতে এই পরিখা উত্তীর্ণ হইতে পারিত না বলিয়া ইহার নাম রক্তনালা। কেহ কেহ বলেন ইছাই ও লাউসেনের যুদ্ধে প্রবাহিত রক্তস্রোত, ঐ নালীতে গিয়া মিশিয়াছিল বলিয়া পরিখার নাম রক্তনালা।

দক্ষিণে লোহাটাপুরী (বর্ত্তমানে লোহাগুঁড়ি) রক্ষিতপুর ও হাড়িকি প্রভৃতি গ্রাম (২) লোহাটাপুরীতে ইছাইয়ের সেনাপতি লোহাটা বজ্জরের সেনানিবাস ছিল বলিয়া প্রবাদ। লোহাটার নামে লোহাটাপুরী হইয়াছে। গড়ের সিংহ-দ্বারও দক্ষিণদিকে অবস্থিত। আর একটী বিশেষত্ব, পাহাড়ের পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিমদিক্ খুব উচ্চ, কিন্তু দক্ষিণ দিক ক্রমশঃ সমতল হইয়া লোহাটাপুরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমদিকে প্রায় দুই মাইল স্থান ব্যাপিয়া বহুসংখ্যক নাতি-উচ্চ টীলা বিদ্যমান। এক টীলা হইতে অন্য টীলায় পৌঁছিবার কোনও উপায় নাই। সুগভীর খাতসমূহ তাহাদের পার্থক্য রক্ষা করিতেছে। একটী হইতে অপরটীর ব্যবধান প্রায় ৩০।৪০ হস্ত পরিমিত হইতে পারে। টীলার উপরে কোথাও বেউড় বাঁশের ঝাড়, কোথাও বা কণ্টকিত লতা-গুল্ম। লোকে বলে এখন যেমন আছে, তখনও তেমি ছিল। টীলাগুলির উত্তর-পশ্চিমে কোনও স্থান খয়রাপাড়া, কোনও স্থান চোয়াড়িকোন্দা প্রভৃতি নামে বিখ্যাত। প্রবাদ, ইছাইয়ের "লোয়ার", 'খয়ড়া', 'চোয়াড়' প্রভৃতি ইতরশ্রেণীর সৈন্যগণ ঐ সকল স্থানে বাস করিত। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত কালী-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও তথায় "কালীতলার মাঠ" নামে খ্যাত রহিয়াছে। টীলাগুলির কিছু পশ্চিমে গড়-গোপালপুর বা গড়-গোয়ালপাড়া নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। জনকয়েক গোয়ালা এখনও তথায় বাস করে। ইছাই ঘোষের স্বজাতি গোপসৈন্যগণ তথায় বাস করিত। বর্ত্তমান গোয়ালাগণের পূর্ব্বপুরুষগণও ভয়ানক বলবান্ ও লাঠিয়াল ছিল। এই গোয়ালাগণকে এতদঞ্চলের লোকে 'দক্ষিণে গোয়ালা' বা 'গড়ের গোয়ালা' বা 'গৌঁড় গোয়ালা' বলিত। বলা বাহুল্য, তাহাদের দৈহিক সামর্থ্য দেখিয়াই তাহাদিগকে এই বিশেষ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল। 'দক্ষিণে গোয়ালা' বা 'গড় গোয়ালা' বলিলেই এখনও লোকে "বলবান্ গোয়ালা" বলিয়াই বুঝিয়া থাকে।

সেন-পাহাড়ের উপরে প্রাচীন দুর্গের বিপুল ধ্বংসাবশেষ আজিও দর্শকের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে। দুর্গের নাম ছিল ত্রিষষ্টিগড়। ইছাই ঘোষ সে নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নাম রাখে ঢেকরি বা ঢেকুর। ইছাইয়ের প্রতিষ্ঠিত

গড়ের নাম 'শ্যামারূপা' দেবীর নামানুসারে লোকে সংজ্ঞা দিয়াছে শ্যামা-রূপারগড়। পাহাড়ের উপরে সেনরাজগণের প্রতিষ্ঠিত গড় বলিয়া কেহ কেহ সেনপাহাড়ী গড়ও

(২) রক্ষিতপুরের রক্ষিত উপাধিধারী তাম্বুলিগণের বিশ্বাস তাহারাই তথাকার আদি অধিবাসী এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইছাই ঘোষের রসদ-সরবরাহক ছিলেন।



সনপাহাড়ী-গড়—শ্যামরূপার মন্দির।



সনপাহাড়ী-গড়—দুর্গমধ্যস্থ একটী প্রাচীন মন্দির

বলে। গড়ের নামানুসারে সেনপাহাড়ী নামে একটী পরগণার সৃষ্টি হইয়াছে। পাহাড়ের পশ্চিমে অজয়ের উত্তরতট ব্যাপিয়া কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ইহার সীমা। সেনরাজগণের নামানুসারে "সেনভূম" নামে আর একটী পরগণার সৃষ্টি হইয়াছে। পাহাড়ের পূর্ব্বে ও উত্তরে অজয়ের উত্তর ও দক্ষিণ তীরস্থ অনেকটা স্থান এই সেনভূমের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব্বে গড়ের নাম যখন ঢেকুর ছিল, অজয়ের উত্তর-তটবর্ত্তী কিয়দংশ ভূভাগ তখন ঢেকরী নামেও অভিহিত হইত। সেনপাহাড়ী গড়ের উত্তরে প্রায় ১২ মাইল দূরবর্ত্তী (হেতমপুর রাজবাটীর প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বে) যশপুর নামক গ্রামে এখনও 'ঢেকুরেশ্বর শিব' ও মন্দির-পার্শ্বে 'ঢেকুরে' নামক পুকুর তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। গড়ের উপরে দুইটি প্রাচীর ও দুইটি পরিখার চিহ্ন বর্ত্তমান। প্রাচীরের উপর বেউড় বাঁশের নিবিড় বেষ্টনী তখনও ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। গড়ের অভ্যন্তরও নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কিছুদিন পূর্ব্বে ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুর আবাস ছিল। মধ্যে একবার ময়ূরের অত্যন্ত আধিক্য হয়। কলাপীর কেকায় মুখরিত হইয়া 'গড়' তখন এক ভীম-কান্ত সৌন্দর্য্যের আধার হইয়াছিল। এখন হিংস্র শ্বাপদ কচিৎ কখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ময়ূর প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। গড়ের উপরে উত্তর-পশ্চিমাংশে প্রাচীর ও পরিখার বহির্দ্দেশে শ্যামারূপা মায়ের মন্দির। মন্দিরে দেবতা নাই, উদ্দেশে পূজা হয়। মন্দিরের কিছু দূরে প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে 'দ্বীপসায়র' নামক একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী ছিল, এখনও তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বে সিংহদ্বারের নিকটে একটী বিলুপ্তোন্মুখ কূপও রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজবাটীর চিহ্নাদি কিছুই নাই। কোনও কোনও স্থানের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে তথায় প্রাসাদোপম মন্দির বা অট্টালিকাদি অবস্থিত ছিল। একটা ধ্বংসস্তূপ দেখাইয়া লোকে বলে ইহার নাম বারদুয়ারী, ইহাই রাজবাড়ী। কিন্তু বিশ্বাস হয় না। দুই একটা ভগ্ন মন্দিরাদি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। গড়ে বেলের গাছ অসংখ্য। লোকে বলে লক্ষ সংখ্যক হইবে। গড়ের অধিস্বামিগণের বিবরণ জানিবার পূর্ব্বে ইহার পৌরাণিকতা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

শ্যামারূপা গড়ের প্রাচীনত্ব

'লাউসেন-তলাও' প্রসঙ্গে যে লাউসেনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, ধর্ম্মমঙ্গল হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার পিতা কর্ণসেন পিতৃপিতামহক্রমে এই গড়ের অধীশ্বর ছিলেন। সে আজ প্রায় সহস্র বৎসরের কথা। কিন্তু তৎ-পূর্ব্বের বিবরণ কিছু জানিতে পারা যায় কিনা বা তদানীন্তনকালে এই স্থান

কোন্ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল এই সমস্ত বিষয় অবগত হওয়াও এই আলোচনার উদ্দেশ্য। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতা হইতে আমরা বঙ্গদেশের 'বঙ্গ' 'উপবঙ্গ' 'পৌণ্ড্র' 'সমতট' 'বর্দ্ধমান' 'সুহ্ম' ও 'তাম্রলিপ্তি' এই কয় বিভাগের নাম প্রাপ্ত হই। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাংএর বিবরণী হইতে সুহ্মের পরিবর্ত্তে কর্ণসুবর্ণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাতত্ত্ববিদ্ 'ফার্গুসন্' সাহেব বলেন (প্রায় ৬৩৮ খৃষ্টাব্দ)

সুহ্মদেশ "বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার উত্তরাংশ, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত এবং কৃষ্ণনগর ও যশোহর জেলার যে যে অংশ গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া বাসভূমির যোগ্য হইয়াছিল, তৎসমুদয় স্থান কর্ণসুবর্ণের অন্তর্গত ছিল"। (এই সীমানা মধ্যে শ্যামারূপার গড়ও কর্ণসুবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল)। সুতরাং হিউয়েন সাং যে সুহ্মের পরিবর্ত্তে কর্ণসুবর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন তদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, ফার্গুসন সাহেবের চতুঃসীমার মধ্যেই প্রাচীন সুহ্ম অবস্থিত ছিল। মহাভারতে সুহ্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞকালে ভীমসেনের পূর্ব্ব দিগ্বিজয় উপলক্ষে সভাপর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে:— "বীর্য্যবান্ পাণ্ডুনন্দন বিদেহ দেশে অবস্থান করিয়াই ইন্দ্রপর্ব্বত-সন্নিহিত কিরাতদিগের সাতজন অধীশ্বরকে পরাজিত করিলেন। পরে স্বপক্ষ হইলেও সুহ্ম এবং প্রসুহ্মদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া মগধদিগের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। তথায় দণ্ড, দণ্ডধার ও অপর মহীপালদিগকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদের সহিত সমবেত হইয়াই গিরিব্রজে উপনীত হইলেন এবং জরাসন্ধ-নন্দন সহদেবকে সান্ত্বনাযুক্ত ও করায়ত্ত করিয়া একযোগে কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে ভারত! পাণ্ডবপ্রবর ভীম চতুরঙ্গ বলভরে ধরণীকে যেন কম্পমানাকরত শত্রুনাশন কর্ণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন এবং তাঁহাকে সংগ্রামে পরাভূত ও বশীভূত করিয়া পর্ব্বতবাসী রাজগণকে জয় করিলেন। অতঃপর তিনি মোদাগিরিস্থ অতিবলশালী রাজাকে বাহুবলে সমরে নিহত করিলেন। তৎপরে তীব্র পরাক্রম মহাবাহু পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব ও কোশিকী-কচ্ছের রাজা মহৌজাকে যুদ্ধে নির্জ্জিত করিয়া বঙ্গরাজ্যের প্রতি ধাবিত হইলেন। তথায় সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন নৃপতিকে পরাজিত করিয়া তাম্রলিপ্তপতি, কর্ব্বটেশ্বর, সুহ্মরাজ ও সাগরবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।" (সভাপর্ব্ব ত্রিংশ অধ্যায়)।

"ততঃ সুহ্মান্ প্রসুহ্মাংশ্চ স্বপক্ষানতিবীর্য্যবান্।
বিজিত্য যুধি কৌন্তেয় মাগধানভ্যযাদ্বলী॥"



সেনপাহাড়ী-গড়— দুর্গমধ্যস্থ অপর এক প্রাচীন ম

বীরভূম-বিবরণ ২৩৩পৃঃ



সেনপাহাড়ী-গড়ের উপর —১০হাত মোটা প্রাচীন তেঁতুল গাছ

বলিয়া অবশেষে পুনরায়—

"তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিম্ তথা ॥
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্ব্বাং ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভ ॥"

শ্লোকে সুহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। আবার অর্জ্জুনের উত্তরদিগ্বিজয়েও ("তদনন্তর ইন্দ্রকুমার কিরীটী সংগ্রামে বিচিত্র আয়ুধ-নিকরে সুরক্ষিত রমণীয় সিংহপুর বলপূর্ব্বক বিলোড়িত করিয়া ফেলিলেন, তাহার পর সকল সৈন্য সমভিব্যাহারে সুহ্ম ও সুমালদিগকেও প্রমথিত করিলেন") এক সুহ্মের বিষয় উল্লিখিত আছে। এই গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া সুহ্ম ও প্রসুহ্মের বিষয় কিছুই নির্ণয় করিতে পারা যায় না। হয়তো একই স্থানের নাম অর্জ্জুন ও ভীমের দিগ্বিজয়ে স্থান পাইয়াছে। সুতরাং অর্জ্জুনের সুহ্ম ও ভীমের সুহ্ম ও প্রসুহ্ম সুদূর উত্তর-পূর্ব্বের কোনও স্থানে হওয়া সম্ভব কি না ঐতিহাসিকগণ বলিতে পারেন। কিন্তু মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, 'সুহ্মা রাঢ়া'। এই সুহ্ম শেষোক্ত 'সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ' শ্লোকের সুহ্ম বলিয়া মনে হয়। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মহাভারতোক্ত মগধাদির বর্ত্তমান অবস্থিতি এইরূপ নির্দ্দেশ করেন যথা :—মগধ (বেহার), অঙ্গ (ভাগলপুর), মোদাগিরি (মুঙ্গের), পুণ্ড্র (মালদহ হইতে বগুড়া), কৌশিকীকচ্ছ (হুগলী জেলা), বঙ্গ (ভাগীরথীর পূর্ব্বাংশ), তাম্রলিপ্ত (তমলুক), কর্ব্বট (?), সুহ্ম (রাঢ়)। ভীমসেনের পূর্ব্ব দিগ্বিজয়ের এই ক্রম দেখিয়া বর্ত্তমান রাঢ়কেই শেষোক্ত সুহ্ম বলিয়া মনে হয়। 'সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ' শ্লোকটী হইতে সুহ্মের অদূরবর্ত্তী সমুদ্রের আভাষও পাওয়া যাইতেছে। বিশ্বকোষে বঙ্গদেশ ভূতত্ত্ব-বিভাগে "সাগরতীর উত্তর রাঢ়ের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ মহাভারতের নিম্নোক্ত শ্লোকটী (৩) উদ্ধৃত করিয়া বিশ্বকোষকার লিখিতেছেন :—"সাগরতীর তৎকালে উত্তররাঢ়ের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কৌশিকার বর্ত্তমান নাম 'কুন্তী', তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী হরিপাল প্রভৃতি গ্রামের নিকটে কৌশিকীর প্রাচীনগর্ভ দৃষ্ট হয়"। মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে, "অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কৌশিকী হইতে যাত্রা করিয়া আনু-

(৩) "এতে কলিঙ্গা কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।" ইত্যাদি (বনপর্ব্ব, ১১৪ অধ্যায়)

পূর্ব্বক্রমে সকল তীর্থে গমন করিলেন। গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গমনপূর্ব্বক পঞ্চশত নদীমধ্যে অবগাহন করিলেন। তৎপর সেই বীর ভ্রাতৃগণের সহিত সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গমুখে যাত্রা করিলেন। (৪) * * * গিরিদ্বারা উপশোভিত সতত ঋষিগণযুক্ত ও দ্বিজগণ-নিষেবিত এই যজ্ঞভূমি বৈতরণী নদীর উত্তর তীর।" অনেকে বলেন, তাম্রলিপ্ত এক সময় সুহ্মের অন্তর্গত ছিল, প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা দশকুমারচরিত উত্তর পীঠিকা ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস হইতে নিম্নোক্ত শ্লোকটীর উল্লেখ করেন—"সুহ্মেষু দামলিপ্তাহ্বয়স্য নগরস্য" (দামলিপ্ত = তাম্রলিপ্ত) চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্তে (খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগ) সুহ্মের তাম্রলিপ্ত নগরীর উল্লেখ পাওয়া যায়। "পূর্ব্ব ভারতের বাণিজ্যকেন্দ্র তাম্রলিপ্ত নগর হইতে পোতারোহণে যাত্রা করিয়া চৌদ্দ রাত্রিদিন সমানভাবে জাহাজ চলিলে তিনি সিংহলে উপনীত হন।" রাজ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব নহে। যাহা হউক সুহ্ম যে রাঢ় হইতে পারে দশকুমারচরিতের এই প্রমাণ তাহার বিরুদ্ধ নহে। দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভূগোলগ্রন্থে সুহ্মের এইরূপ সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে :—

"গৌড়স্য পশ্চিমে ভাগে বীরদেশস্য পূর্ব্বতঃ।
দামোদরোত্তরে ভাগে সুহ্মদেশ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

গৌড়ের পশ্চিম, বীরদেশের (বীরভূমের) পূর্ব্ব ও দামোদরের উত্তর প্রদেশ সুহ্ম নামে কীর্ত্তিত। এই সুহ্ম যে ফার্গুসন সাহেবের বর্ণিত কর্ণসুবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

ধোয়ী কবির পবনদূত কাব্যেও "গঙ্গাবীচিপ্লুতপরিসরঃ"—সুহ্মের বর্ণনা করা হইয়াছে।(৫) মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ মহাকাব্যেও রঘুরাজের দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে সুহ্মের পরেই বঙ্গের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—

(৪) বৈতরণী নদীর উত্তর তীরবর্ত্তী কলিঙ্গ যাইতে হইলে যদি সাগরতীর দিয়া যাইতে হয় তাহা হইলে বিশ্বকোষকারের অনুমান অসঙ্গত মনে হয় না। সুতরাং সুহ্ম রাঢ় হইলেও সুহ্ম জয়ের পর সাগর তীরবর্ত্তী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিতে যাওয়ার পারম্পর্য্য রক্ষিত হইতেছে।

(৫) "গঙ্গাবীচিপ্লুত পরিসরঃ সৌধমালাবতংসো
বাস্যত্যুচ্চৈ স্তুয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ।
শ্রোত্রক্রীড়াভরণপদবী ভূমি দেবাঙ্গনানাং
তালীপত্রং নবশশিকলা কোমলং যত্র ভাতি।"

"পৌরস্ত্যানেবমাক্রামন্ তাংস্তান জবনপদাঞ্জয়ী।
প্রাপ তালীবনশ্যামং উপকণ্ঠং মহোদধেঃ।
অনম্রানাং সমুদ্ধর্ত্তু স্তস্মাৎ সিন্ধুরয়াদিব।
আত্মা সংরক্ষিত সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসী।
বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধ নোস্ততান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোন্তরেষুচ।"

(রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ ৩৪—৩৬ শ্লোক)

কর্ণসুবর্ণপতি শশাঙ্কের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট্ শ্রীহর্ষের সভাকবি বাণভট্ট তাঁহার 'হর্ষচরিত ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে' অশেষ গজ-সাধনাধিকারী স্কন্দগুপ্তের দ্বারা শ্রীহর্ষকে উপদেশ দিতেছেন যে—প্রমদাগণের নিকটেও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, তাহাদের হস্তেও অনেকে প্রাণ হারাইয়াছেন, তন্মধ্যে "বিষচূর্ণ-চুম্বিত মকরন্দেন চ কর্ণেন্দীবরেন দেবকী দেবানুরক্তা দেবসেনং সৌহ্মং" অর্থাৎ দেবানুরক্তা (মহিষী) দেবকী, বিষচূর্ণমিশ্রিত মকরন্দপূর্ণ কর্ণোৎপল দ্বারা সুহ্মাধিপতি স্বীয় স্বামী দেবসেনকে বিনষ্ট করিয়াছেন। অনুমান হয় শশাঙ্কের সমসময়েই এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল এবং সেই অন্তর্বিপ্লবের সময় শশাঙ্ক-কর্ত্তৃক সুহ্ম কর্ণসুবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। এখন দেখিতে হইবে সুহ্মের রাজধানী ছিল কোথায়? অজয়ের উভয় তটবর্ত্তী ভূভাগই রাঢ়ের অন্ত-র্গত। সুতরাং ইহারই মধ্যে তাহার রাজধানী থাকা সম্ভব। আমাদের মনে হয় ত্রিষষ্টিগড়ই (শ্যামারূপার গড়) সুহ্মের রাজধানী ছিল। (পূর্ব্বকালে ইহার অন্যনামও থাকিতে পারে)। প্রবাদ, ইছাই ঘোষ যে দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহার নাম শ্যামারূপা। শ্যামারূপা সুহ্মারূপার অপভ্রংশ বলিয়াই অনু-মিত হয়। কালিকাদেবীর অপর নামই যখন শ্যামা, তখন কালীরূপা বা শ্যামা-রূপা বোধ হয় দেবীর নাম হইতে পারে না। ইছাই ঘোষ কালিকা দেবীর উপাসক ছিলেন এবং কালিকা মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ।

তস্মিন্ সেনান্বয়নৃপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো
দেব সাক্ষাদ্বসতি কমলা কেলীকারো মুরারিঃ।
পানৌ লীলা কমলমসকৃৎ সৎ সমীপে বহন্তো
লক্ষ্মী শঙ্কাং প্রকৃতিসুভগাঃ কুর্ব্বতে বাররামা॥

সেনান্বয় নৃপতির দেবরাজ্যে অভিষিক্ত কমলা ও মুরারির উল্লেখ করিয়া ধোয়ী বোধ হয় শ্রীজয়দেব প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধামাধব মূর্ত্তির ইঙ্গিত করিয়াছেন।

সুতরাং সুক্কারূপাই দেবীর প্রকৃত নাম বলিয়া ধারণা হইতেছে। ত্রিষষ্টিগড়ের অদূরে ইলামবাজারের নিকটবর্ত্তী দেবীপুর নামক গ্রামের পার্শ্বে সুক্কেশ্বরী নামক দেবীমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় আমাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটী দ্বিভুজা, বৌদ্ধ তারামূর্ত্তি। মূর্ত্তিটীর মুখ হইতে উদর পর্য্যন্ত অংশের অৰ্দ্ধেক ভাগ ভগ্ন। লোকে বলে কালাপাহাড় কাটিয়া দিয়া গিয়াছে। তাঁহার পাদপীঠে নিম্নোক্ত শ্লোকটী ক্ষোদিত রহিয়াছে :—

সুক্কেশ্বরী দেবী

"যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতোহ্যবদৎ
তেষাঞ্চ যো নিরোধঃ এবং বাদি মহাশ্রমণঃ।"

অর্থাৎ যে সকল ধর্ম্ম হেতু হইতে সমুদ্ভুত, তাহাদের হেতু কি তথাগত তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সেই সমূহের নিরোধ যেরূপ মহাশ্রমন তাহা এইরূপ বলিয়াছেন।

এই পালি বচনটী বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলসূত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। এতৎ 'প্রসঙ্গে মহাবগ্গ' নামক বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে "বুদ্ধদেব যে সময় রাজগৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন সেই সময় সঞ্জয় নামক এক নাস্তিক পরিব্রাজক তথায় উপস্থিত হন। তাঁহার অনেকগুলি শিষ্যের মধ্যে 'শারিপুত্ত' ও 'মৌদগল্লান' অন্যতম। একদিন প্রাতঃকালে বুদ্ধদেবের শিষ্য 'অশ্বজিৎ' ভিক্ষায় বাহির হইলে পথে শারিপুত্তের সহিত সাক্ষাৎ হয়। শারিপুত্ত, স্থবির অশ্বজিতের সৌম্যমূর্ত্তি সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অশ্বজিৎকে জিজ্ঞাসা করেন আপনার গুরু কে? এবং তাঁহার মতই বা কি? অশ্বজিৎ উত্তর করেন, "শাক্যবংশীয় মহাশ্রমণ আমার গুরুদেব। গুরুদেবের সম্যক্ মত সবিস্তারে বলিবার সামর্থ্য আমার নাই, তবে সেই মহাশ্রমণের ধর্ম্মমতের মূল তাৎপর্য্য এই মাত্র বলিতে পারি:—

"যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতো
হ্যবদৎ তেষাঞ্চ যো নিরোধঃ এবং বাদি মহাশ্রমণঃ।"

(বিনয়পিটক মহাবগ্গ) (৬)

এই বচনটী হইতেই সুক্কেশ্বরী মূর্ত্তির প্রাধান্য সূচিত হইতেছে। এই

(৬) "Of all objects which proceed from a cause,
The Tathagata has explained the cause,
And he has explained their cessation also;
This is the doctrine of the Great Samana."

রুস্ ডেভিডস্ কৃত ইংরাজি অনুবাদ



শ্রীশ্রীঅপরেশ্বরা দেবী।

মূর্ত্তিটী তাহার প্রতিষ্ঠাতার প্রবল বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগ ও তাহাতে নিষ্ঠাপূর্ণ অভিজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেছে। (৭)

আমাদের অনুমান হয় কিঞ্চিদূন প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কোন পালবংশীয় গৌড়েশ্বর এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। শ্যামারূপার গড় পালবংশীয় গৌড়েশ্বরগণের সামন্ত রাজ্য ছিল। লাউসেনের পিতা কর্ণসেনকে বিতাড়িত করিয়া ইছাই ঘোষ এই গড় অধিকার করেন। সুহ্মাধিষ্ঠাত্রী দেবী সুহ্মারূপা তাঁহারই প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্ত্তী কালে ইছাইকে নিহত করিয়া ধর্ম্মরাজ পূজাপ্রবর্ত্তক লাউসেন যখন গড়ের অধীশ্বর হন, তখন তিনি সুহ্মরায় নামক ধর্ম্মরাজের প্রতিষ্ঠা করেন। হইতে পারে সেই সময়ে গৌড়েশ্বরের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি সুহ্মেশ্বরী নামে উক্ত বৌদ্ধতারামূর্ত্তিরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অবশ্য লাউসেনের পরেও ইহার প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব নহে। দেবীর প্রাচীন মন্দির ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এখন একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে তিনি অধিষ্ঠিতা আছেন। নিকটে 'যতিনী' নামে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী রহিয়াছে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীগণের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া 'যতিনী' নাম হইয়াছে কিনা কে বলিবে? নিকটস্থ আর একটী পুষ্করিণী চিহ্ন মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী গ্রাম দেবীপুর, পায়ের, ইলামবাজার, বারুইপুর, ভগবতী বাজার প্রভৃতি। বারুইপুরে একটী পরিখা প্রাকার পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। লোকে তাহাকে লাউসেনের গড় বলিয়া থাকে। প্রবাদ লাউসেন এইস্থানে একবার ধর্ম্মরাজ পূজা করিয়াছিলেন। উপরোক্ত গড়ে তাহার রাজপ্রাসাদ ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে

সুহ্মেশ্বরীর মন্দিরাদি

(৭) এদিকে সুহ্মেশ্বরীর মূর্ত্তি দেখিয়া যেমন সুহ্ম সম্বন্ধীয় অনুমান দৃঢ় হইতেছে, শ্যামারূপা গড় হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ১২ মাইল দূরবর্ত্তী আরা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত রাঢ়েশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়াও তেমনি শ্যামারূপাগড় যে রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল এই ধারণাও বদ্ধমূল হইয়াছে। রাঢ়েশ্বরের প্রকাণ্ড প্রস্তর মন্দির প্রায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল, গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে সম্প্রতি তাহার সংস্কার হইয়াছে। এতদঞ্চলে এত বড় শিবলিঙ্গ আর কোথাও প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়া শুনি নাই। প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকের—"গৌড়রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রৈব রাঢ়াপুরি" বচনটী হইতে গৌড়ে রাঢ়া নগরের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। রাঢ়েশ্বর শিব দেখিয়া অনুমান হয় 'রাঢ়া'ই কালক্রমে 'আরা'য় রূপান্তরিত হইয়াছে। আরার সমীপবর্ত্তী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিপুল ইষ্টকস্তূপ ও পরিখা প্রাকার-পরিবেষ্টিত দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ এবং নিকটস্থ গঞ্জ নামে গ্রামগুলির অবস্থিতি দেখিলে আরার নগরীত্বের দাবী উপেক্ষা করিবার উপায় থাকে না। বীরভূমের সহিত আরার কাহিনী ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে। সময়ান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি প্রকাশক।

তথায় আসিয়া বাস করিতেন। লাউসেন প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মরাজের মন্দির মধ্যে একটী ক্ষুদ্র গর্ত্ত দেখাইয়া লোকে বলে ঐ কুণ্ড হইতে পূর্ব্বে আমরা জল উঠিতে দেখিয়াছি। কুণ্ডটী (?) লাউসেনের প্রতিষ্ঠিত। সুন্ধেশ্বরী দেবীর বেদীপার্শ্বে একটী দশভুজা মহিষমর্দ্দিনীমূর্ত্তি রহিয়াছেন। একখণ্ড প্রস্তরে দশভুজা দুর্গা, মহিষ, অসুর ও সিংহের মূর্ত্তি ক্ষোদিত। দেবীর দশ ভুজে দশ-প্রহরণ। সুন্দর মূর্ত্তি! আমরা প্রথমে দেখিয়া উদর ও মস্তকবিহীন সুন্ধেশ্বরীর পরিবর্ত্তে ইঁহাকেই প্রধানা দেবী এবং সুন্ধেশ্বরী বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম। কিন্তু পূজারীগণ আসিয়া উক্ত ভগ্ন মূর্ত্তিটীকেই সুন্ধেশ্বরী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তাঁহাদের পুরুষপরম্পরাক্রমে পরিচিত সুন্ধেশ্বরী দেবীর পাদপীঠ হইতেই আমরা উক্ত শ্লোকের উদ্ধার করিয়াছি, সুতরাং তাঁহাদের পরিচয়ে কোনও রূপ ভ্রান্তি নাই। কিন্তু মহিষমর্দ্দিনীকে দেখিয়া মনে হইল যে তাঁহারই পূজাবেদী সুন্ধেশ্বরী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। প্রাচীনা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিকে স্থানচ্যুত করিয়া এই সুন্ধেশ্বরীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সেই অবধি মহিষমর্দ্দিনী একপার্শ্বেই পড়িয়া আছেন। ইহা অনুমান করিবার কারণ আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া হিন্দুপ্রাধান্যের সময় যদি মহিষমর্দ্দিনীর প্রতিষ্ঠা হইত তাহা হইলে তিনিই পূজাবেদী অধিকার করিতেন। কারণ সে সময় বাধা দিবার কেহ ছিল না। কিন্তু তাহা হয় নাই। মহিষমর্দ্দিনীকে পাশে রাখিয়া পরবর্ত্তীকালের বৌদ্ধ উপাসকগণ কর্ত্তৃকই সুন্ধেশ্বরীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাহার পর যখন বৌদ্ধ-প্রাধান্য বিলুপ্ত হইল, তখন—বৌদ্ধসংস্পর্শে মূর্ত্তি অপবিত্র হইয়া গিয়াছে এইরূপ ঘৃণাবশতঃই হউক বা অপর কোনও কারণেই হউক এদিকে আর কেহ লক্ষ্য করে নাই। সুতরাং সুন্ধেশ্বরীও স্থানচ্যুতা হন নাই। বর্ত্তমান পূজকগণ বা অপরাপর স্থানীয় ব্যক্তিগণ মাত্র দুই এক শতাব্দীর সংবাদ দিতে পারেন। তৎপূর্ব্বে কাহারা দেবীর পূজা করিত, সংব্রাহ্মণে পূজা করিত কিনা কেহই তাহা বলিতে পারেন না। বর্ত্তমানে সুন্ধেশ্বরী দেবীর পূজাদির আর তেমন কোনও সুব্যবস্থা নাই। বার্ষিক উৎসবাদি বিলুপ্ত হইয়াছে। ৺ দুর্গোৎসবের সময় শারদীয়া মহাপূজার কয়দিন একটু যত্নের সহিত পূজাদি হইয়া থাকে মাত্র। মহানবমী পূজার দিন বলির ব্যবস্থা আছে। আমরা অনুসন্ধানে জানিলাম বলি সুন্ধেশ্বরীর উদ্দেশেই প্রদত্ত হয়। পূর্ব্বে বহুল পরিমাণে ছাগ, মেষ, মহিষাদি বলি দেওয়া হইত। কেহ কেহ বলিলেন, দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী দেবী-মূর্ত্তিটী ইছাই ঘোষের প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত উপনীত

মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি



সেনভূম—স্কন্ধেশ্বরীর পার্শ্বস্থিতা মহিষমর্দ্দিনী



চক্রবীররাজ প্র নগরের রাজধানী গড় প্রা রর
কুণ্ডাইভিটা।

হওয়া বড় কঠিন। ধর্ম্মমঙ্গল নামক প্রাচীন গ্রন্থে ইছাই ও লাউসেনের কাহিনী বর্ণিত আছে। তাহা কবিকল্পনায় পল্লবিত হইলেও একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। ময়ূরভট্ট, জগৎরাম, খেলারাম, প্রভুরাম, সীতারাম, ঘনরাম, দ্বিজ রামচন্দ্র, রামদাস আদক, মাণিকরাম গাঙ্গুলী, সেনপণ্ডিত, বলদেব চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বহু কবি এ বিষয়ে লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে কোনও কোনখানি ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত। (৮) এই সমস্ত কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় মূলতঃ এক। আমরা ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল হইতে সংক্ষেপে ইছাই ও লাউ-সেনের কাহিনী সঙ্কলন করিয়া দিতেছি। ধর্ম্মমঙ্গল

গণেশাদি দেবদেবীকে বন্দনাপূর্ব্বক সকলকে হরি হরি বলিতে আদেশ দিয়া

"হাকন্দ পুরাণ মতে ময়ূরভট্টের পথে

জ্ঞানগম্য শ্রীধর্ম্মসভায়—"

ঘনরাম তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গল গান আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার পর সৃষ্টি বর্ণনায় ব্রহ্মের আকার পরিগ্রহ, তাঁহার নাসাপুট হইতে উলুকের জন্ম ইত্যাদি ব্যাখ্যান করিয়া অম্বুবতী নাম্নী স্বর্গবেশ্যাকে শাপ দেওয়াইয়াছেন। অম্বুবতী গৌড়ের রমতিনগরে বেণু রায়ের ঔরসে মন্থরার গর্ভে জন্ম লইলেন, তাহার নাম হইল রঞ্জাবতী। দিনে দিনে সে শুক্লপক্ষের চাঁদের মত বাড়িতে লাগিল। ঘনরাম বলিতেছেন—'অতঃপর শুন সবে গৌড়পতি ল'য়ে'॥

"ধর্ম্মপাল রাজা ছিল গৌড়ের ঠাকুর।
প্রসঙ্গে প্রসবে পুণ্য পাপ যায় দূর॥
পৃথিবী পালিয়া স্বর্গ ভুঞ্জে নৃপবর।
বীর্যবন্ত পুত্র তার রাজা গৌড়েশ্বর॥"

গৌড়েশ্বর স্বীয় শ্যালক মহামদার হস্তে মন্ত্রিত্ব ভার অর্পণ করেন। মন্ত্রী মহামদা অত্যাচারী ছিল। রাজকর আদায় দিতে অসমর্থ হওয়ায় সে সোম-ঘোষ নামক একজন গোপকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে। দৈবাৎ রাজার শুভ-দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া সোমঘোষ কারামুক্ত হইল। রাজা তাহার এতদূর মর্য্যাদা বাড়াইলেন যে, "বিশ্বাসে গুবাক্ পান খান তার হাতে"। কিছুদিন পরে গৌড়েশ্বর সোম ঘোষকে বলিলেন :—

(৮) "ভুবনশকে বায়ু (১৪৪৯) মাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন॥" (হস্তলিখিত পুঁথি)
(১৫২৭ খৃঃ খেলারামের ধর্ম্মমঙ্গল)

"বারভূঞা মাঝে যার কথা নাহি নড়ে।
হেন কর্ণসেন রায় ত্রিষষ্টির গড়ে॥
সোমের পরম বন্ধু বাঁধে বীরপনা।
তাহার উপরে তুমি হ'য়ে যাও সানা॥
মাসে মাসে বেবাক পাঠাবে ইরসাল।
কর্ণসেন উপরে বাড়াব ঠাকুরাল॥
* * * *
নাগড়া নিশান দিল লিখি পরওয়ানা।
বিদায় হইল গোপ করিয়া বন্দনা॥
কোলে পুত্র কেবল ইছাই কুলচাঁদ॥"

সোম ঘোষ মোকামে মোকামে বীরভূমে আসিয়া অজয়পারে ত্রিষষ্টিগড়ে উপস্থিত হইল। ত্রিষষ্টির অধীশ্বর কর্ণসেন, তাহাকে বিশেষরূপ অভ্যর্থনা করিয়া—

"রাজার আদেশে দিল দেশে অধিকার।
বসতি গড়ের মাঝে হৈল গোয়ালার॥"

সোমঘোষনন্দন ইছাই শৈশব হইতেই ভবানীভক্ত ছিলেন। এক অবধূতের নিকট দীক্ষালাভ করিয়া তিনি উৎকট শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। পিতার উপর মহামদার অত্যাচার, পিতার কারাক্লেশ ভোগ প্রভৃতি শৈশব হইতেই তাহাকে গৌড়শাসনের উপর বিতৃষ্ণ করিয়া দিয়াছিল। ইছাইয়ের গৌড়বাসের আশৈশব অভিজ্ঞতা তাহাকে দুঃসাহসী ও দুরাকাঙ্ক্ষ করিয়া তুলিয়াছিল। এখন সুযোগ পাইয়া তাহার প্রতিশোধকামনা বলবতী হওয়ায় চোয়াড়, খয়রা, লোয়ার প্রভৃতি ইতর শ্রেণীর সমবায়ে গঠিত একদল সৈন্য সহযোগে বিদ্রোহী হইয়া তিনি গড় হইতে কর্ণসেনকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। ধর্ম্মমঙ্গলে বর্ণিত আছে, ইছাই শক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কতকগুলি মনোমত বর গ্রহণ করেন। প্রথম :—

ইছাই ঘোষের স্বাধীনতা লাভ

"অবিচারে অনাহারে গৌড়ে বন্দী কারাগারে
অবিচারে ছিল মোর বাপ"

তাহার প্রতিশোধ। দ্বিতীয় শ্যামারূপা মাকে গড়ে অধিষ্ঠিতা থাকিতে হইবে। ইছাই তাঁহার শ্যামারূপ নিরবধি দেখিতে চাহেন। তৃতীয়,—

"অপর প্রার্থনা শুন ত্রিষষ্টির গড় পুনঃ
নাম হবে অজয় ঢেকুর"

চতুর্থ—শত্রু বল করিলে অজয়ের জল বৃদ্ধি হইবে। ইত্যাদি ইত্যাদি—অতঃপর,—

"কনকপ্রতিমা গড়ি শ্যামারূপা মহেশ্বরী
গড়ে গোপ করিল স্থাপন।"

এইরূপে ইছাই ঘোষ ঢেকুরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলেন, ওদিকে ছয় পুত্রসহ পলায়িত কর্ণসেন গৌড়েশ্বরের নিকট গিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। গৌড়েশ্বর তো ক্রোধেই অস্থির। পাত্র মহামদ কর্ণসেনকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক খুব ধুমধাম করিয়া পরওয়ানাসহ এক ভাটকে ইছাইয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ইছাই তাহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলেন। গৌড়েশ্বর দেখিলেন আর ক্ষমা করা উচিত নয়, তিনি কর্ণসেনের নেতৃত্বে 'নবলক্ষদল' সজ্জিত করিয়া ইছাইকে দমন করিতে পাঠাইলেন। অজয়-তীরে তুমুল যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয়পুত্র বিনষ্ট হইল, সেই শোকে কর্ণসেনমহিষীও বিষপানে প্রাণত্যাগ করিলেন। যুদ্ধে পরাজিত ও পত্নী-পুত্রহারা হইয়া কর্ণসেন সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু গৌড়েশ্বরের প্রতিবন্ধকতায় তাহা ঘটিয়া উঠিল না। তিনি নানাপ্রকার বুঝাইয়া আপন শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সহিত তাহাকে উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিলেন এবং যৌতুকস্বরূপ ময়নানগর নামক স্থানের আধিপত্য প্রদান করিলেন (৯)। পাত্র মহামদ রঞ্জাবতীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সহায় সর্ব্বস্বহীন বৃদ্ধ কর্ণসেনের করে রঞ্জাবতীকে সমর্পণ করা তাহার অভিপ্রেত ছিল না। সুতরাং সে গৌড়েশ্বরকে কিছু বলিতে না পারিয়া কর্ণসেনের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী গৌড় কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী

(৯) মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ময়নাগড় নামক স্থানে এখনো লাউসেনের গড় ও আবাস বাটী প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। ময়নাগড়ের রঙ্কিনী নামে কালিকা দেবী ও লোকেশ্বর শিব লাউসেনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। জানিনা ধর্ম্মরাজপূজক লাউসেন কালী ও শিবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কিনা। রঞ্জাবতী যে ধর্ম্মরাজের পূজা করিয়াছিলেন রামাই পণ্ডিত-প্রতিষ্ঠিত সেই ধর্ম্মরাজ বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের সমীপবর্ত্তী ময়নাপুরে আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এখন তিনি 'যাত্রাসিদ্ধিরায় ধর্ম্মরাজ নামে বিখ্যাত' রামাই পণ্ডিতের যাত্রাসিদ্ধিপদ্ধতি অনুসারেই বর্ত্তমান এতদঞ্চলের ধর্ম্মরাজ পূজাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইতি প্রকাশক।

হইতে বহুদূরবর্ত্তী ময়নানগরে অবস্থিতি হেতু আপাততঃ কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। ধর্ম্মরাজপূজার নবীন সংস্করণের প্রধান পাণ্ডা রামাই পণ্ডিতের উপদেশে ধর্ম্ম উপাসনা করিয়া রঞ্জাবতী লাউসেনকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। লাউসেনের একটী ধর্ম্মভ্রাতা ছিল তাহার নাম কর্পূর। মহামদা লাউসেনের উপরও নানারূপ অত্যাচার করিয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মের অনুগ্রহে লাউসেনের কোনও অনিষ্ট হয় নাই। রঞ্জাবতী যেমন শালেভর দিয়া প্রাণদান করিয়াও ধর্ম্মের উপাসনা করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মের কৃপায় পুনর্জ্জীবিত হইয়া পুত্রলাভ করিয়াছিলেন; পুত্র লাউসেনও তেমনই ধর্ম্মনিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়জয়ী ও অতুলবাহুবলশালী হইয়াছিলেন। পাত্র মহামদা লাউসেনের এই প্রভাব প্রতিপত্তিতে আশঙ্কিত হইয়া তাহাকে ঢেকুরগড়ে ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। লাউসেন তাহার প্রিয় সেনাপতি কালুবীর ও অপরাপর দলবল লইয়া বীরভূমে অভিযান করেন। সেই যুদ্ধে সেনাপতি লোহাটা বজ্জর সহ ইছাই ঘোষ বিনষ্ট হয় এবং লাউসেন ঢেকুরগড়ের আধিপত্যলাভ করেন। লাউসেনের চারিটী পত্নী ছিল, তাহাদের নাম অমলা, বিমলা, কানাড়া এবং কলিঙ্গা। ইহার মধ্যে কানাড়াকে বিবাহ করিতে কানাড়ার পিতা হরিপালের সঙ্গে লাউসেনকে মহাযুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। বীরবালা কানাড়াও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। কানাড়ার গর্ভে লাউসেনের পুত্র চিত্রসেন জন্মগ্রহণ করেন। ধর্ম্মমঙ্গলে বর্ণিত হইয়াছে, লাউসেন মহাযুদ্ধে কাঙুরের (কামরূপের?) রাজা কর্পূর ধবলকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন পশ্চিমে সূর্য্যোদয় প্রদর্শন প্রভৃতি বহু অলৌকিক কার্য্য লাউসেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। এ সমস্তই তাহার ধর্ম্মরাজ-পূজার ফল!

লাউসেন

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে 'ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি কবি কল্পনায় পল্লবিত', কিন্তু তথাপিও তাহার মধ্য হইতে সত্যের সন্ধান যে না পাওয়া যায় এমন নহে। ইছাই এবং লাউসেনকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদিও শ্যামারূপার গড়ের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস নাই তথাপি কিম্বদন্তী হইতে যাহা যাহা জানিতে পারা যায়, তাহার অনেকগুলিই অপ্রামাণ্য নহে। কিঞ্চিদধিক প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে শ্যামারূপার গড় হইতে আনীত হইয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-জীউ বিগ্রহ কেন্দুবিল্বে প্রতিষ্ঠিত হন। তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (ভায়া সীতারামপুরের পরবর্ত্তী) ষ্টেশন সালানপুরের প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে ভাঁড়ার পাহাড় সান্নিধ্যে সেনপাহাড়ী গড়ের অধিষ্ঠাত্রী শ্যামা-

ঢেকুর গড়ের দেব-দেবী

রূপা দেবী এখন কল্যাণেশ্বরী নামে প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। প্রবাদ শেখর-ভূমের রাজা কল্যাণশেখর বল্লালসেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া দেবীকে যৌতুক লইয়া যান। কল্যাণশেখরের নামে শ্যামারূপা দেবী সেই অবধি কল্যাণেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। কল্যাণেশ্বরীর পূজক দেঘরিয়াগণ এই প্রবাদের সমর্থন করেন। বহুদিন পূর্ব্ব হইতে সালানপুর অঞ্চলের ভিখারীদের মুখে একটী গাথা গীত হইয়া আসিতেছে। তাহার আরম্ভ ভাগ এইরূপ :— কল্যাণেশ্বরী

'পূর্ব্বে বাড়ী সেনপাহাড়ী ছিলে মা কল্যাণী।
শ্যামারূপা নাম ধর গহন-বাসিনী॥'

আমাদের বীরভূমে একটী গান প্রচলিত আছে—

"পূর্ব্বে ছিলে শ্যামারূপা, হ'লে পশ্চিমে কল্যাণেশ্বরী
বলগো বল শ্যামারূপা মা উপায় কি করি।" ইত্যাদি

ইছাই ঘোষের সেনাপতি 'লোহাটা বজ্জরের' থানা 'লোহাটাপুরী' বা 'লোহাগুড়ি' নামে এবং খয়রা প্রভৃতি জাতির বাসভূমি খয়রাপাড়া প্রভৃতি নামে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ঢেকুরগড়ের প্রাচীন লৌহব্যবসায়ী (অস্ত্রাদি নির্ম্মাতা) ঢেকারু জাতি এখনও বীরভূমের নানা স্থানে বাস করিতেছে। হাণ্টার সাহেবও তাঁহার গ্রন্থে লাউসেন ও ইছাই ঘোষের প্রসঙ্গ বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত নানা কারণে বুঝিতে পারা যায় যে লাউসেন ও ইছাই ঘোষ বলিয়া নিশ্চয়ই কেহ বর্ত্তমান ছিলেন। একটা অলীক কাহিনীকে বুকে করিয়া সেনপাহাড়ীর মত একটা গড় আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা কখনই সম্ভব নহে। কিন্তু লাউসেন ও ইছাই ঘোষ কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোনও স্থিরতর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের আলোচনা করিয়া আমাদের যেরূপ ধারণা হইয়াছে এস্থলে সংক্ষেপতঃ তাহাই বিবৃত হইতেছে। পূর্ব্বে শ্যামারূপার গড় প্রসঙ্গে সুহ্মের পরিচয় ব্যপদেশে সুহ্মাধিপতি দেবসেনের উল্লেখ করিয়াছি। সম্রাট্ শ্রীহর্ষের সমসাময়িক কর্ণ-সুবর্ণপতি মহারাজ শশাঙ্ক কর্ত্তৃক সুহ্ম যে কর্ণ-সুবর্ণরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা এই সুহ্মাধিপতি দেবসেনকে কর্ণ-সুবর্ণরাজ শশাঙ্কের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক বলিয়া মনে করি। মহিষী দেবকীর ষড়যন্ত্রে দেবসেন বিনষ্ট হইলে পর কিছুদিনের জন্য সুহ্ম কর্ণ-সুবর্ণের অধিকারে আইসে। কিন্তু শ্রীহর্ষের সহিত যুদ্ধে বিপর্য্যস্ত হইয়া শশাঙ্ক রাঢ়ের দক্ষিণাঞ্চলস্থিত

গড়ের অস্তিত্ব ও লাউসেন

আরণ্য প্রদেশে পলায়ন করেন এবং সেই স্থানেই পরলোকগত হন। এদিকে শ্রীহর্ষও স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে বঙ্গে মাৎস্যন্যায় প্রবর্ত্তিত হয়। সেই সময়ে প্রজাসাধারণের মনোনীত অধিনায়ক পালবংশীয় সম্রাট্ গোপালদেবের অভ্যুদয় হইয়াছিল। আমাদের অনুমান হয়, সুহ্মাধিপতি দেবসেনের বংশধরগণ (তাঁহার পুত্র বা ভ্রাতষ্পুত্র) কেহ সেই গোলযোগের সময় রাষ্ট্রবিপ্লবের সুবিধা গ্রহণ করিয়া আপনাদের পূর্ব্ব আধিপত্য সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। পরে গোপালদেবের স্বনামপ্রসিদ্ধ পুত্র প্রথম ধর্ম্মপালের সময় সুহ্ম তাহার সামন্ত রাজ্যমধ্যে পরিগণিত হয় (ত্রিষষ্টিগড় বা শ্যামারূপার গড়ই যে সুহ্মের রাজধানী ছিল তাহাও ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে) এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নহে। সুতরাং 'বারভূঞা মধ্যে যার কথা নাহি নড়ে'—ত্রিষষ্টিগড়ের সেই কর্ণসেনকে আমরা দেবসেনের বংশধর বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। ধর্ম্মমঙ্গল হইতে ত্রিষষ্টিগড়ের চারিজন নৃপতির নাম পাওয়া যায়—(প্রথম) কনকসেন, তৎপুত্র কর্ণসেন, কর্ণসেনের পুত্র লাউসেন, লাউসেনের পুত্র চিত্রসেন। (১০) ধর্ম্মমঙ্গলোক্ত—

ধর্ম্মমঙ্গলোক্ত ধর্ম্মপাল

"ধর্ম্মপাল রাজা ছিল গৌড়ের ঠাকুর।
প্রসঙ্গে প্রসবে পুণ্য পাপ যায় দূর॥
পৃথিবী পালিয়া স্বর্গ ভুঞ্জে নরবর।
বীর্য্যবন্ত পুত্র তার রাজা গৌড়েশ্বর॥"

(২য় সর্গ ঢেকুর-পালা, ঘনরাম)

এই ধর্ম্মপালকে আমরা গৌড়েশ্বর প্রথম ধর্ম্মপাল বলিয়াই মনে করি এবং তার 'বীর্য্যবন্ত পুত্র রাজা গৌড়েশ্বরকে' যুবরাজ ত্রিভুবন-পাল বলিয়াই অনুমান হয়। ধর্ম্মমঙ্গলে কাঙুর-যাত্রা পালায় চতুর্দ্দশ সর্গে লাউসেন কামরূপ হইতে গৌড়ে প্রত্যাগত হইয়া গৌড়রাজ মহিষীকে (ভানুমতীকে) ব্রহ্মকর-জাপ্য-মালা ও সমুদ্র-কাটারির জন্য বলিতেছেন :—

(১০) "সুশীল সজ্জন সত্যবুদ্ধি কর্ম্ম করে। পরম পিরীতে পরিচয় দিল তারে॥
ময়না-নগরবাসী সাগর সমীপ। পিতা মহাশয় মোর যার নরাধিপ॥
পিতামহ ঠাকুর কনকসেন রায়। যার যশ কীর্ত্তি জগত জুড়ি গায়॥
ধন্য পিতা কর্ণসেন রায় নৃপমণি।" (ধর্ম্মমঙ্গল ত্রয়োদশ সর্গ হস্তীবধপালা)॥

অন্যত্র উনবিংশ সর্গে ৪৪৫ সংখ্যক শ্লোক—

"আনন্দে আনন্দ বৃদ্ধি সিদ্ধি শুভদৃষ্ট। পুত্র চিত্রসেন তার হইল ভূমিষ্ঠ॥"

* * * *

সেন বলে মাসি গো কহিতে নাহি ভয়॥
তোমার শাশুড়ী বুড়ি কৃপাদৃষ্টে চায়।
ব্রহ্মপুত্র নদ তবে তড়ে' পার যায়॥"

ধর্ম্মমঙ্গলে এই শাশুড়ির নাম বল্লভা দেবী। ইনি ধর্ম্মপালের পত্নী। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলেও লিখিত হইয়াছে :—

"ধর্ম্মপাল রাজা ম'লো অরাজক দেশ।
পাত্র মিত্র প্রজালোক পায় বড় ক্লেশ॥"

ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের সময়েই লাউসেনের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তবে তিনি ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পরেও বর্ত্তমান ছিলেন, এবং ধর্ম্মপালের পুত্রের অধীনেই আপন সৌভাগ্যান্বেষণে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া বহুদিন পরে প্রবাদ শুনিয়া ধর্ম্মমঙ্গলকারগণ ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পরেই তাহার অভ্যুদয় কাল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের দুই পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। (প্রথম) ত্রিভুবন পাল, ইনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। (দ্বিতীয়) দেবপাল। ত্রিভুবনপাল যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেও দেবপালই গৌড় সিংহাসন লাভ করেন। দেবপালের মাতার নাম রন্না দেবী। ডাক্তার ফ্লীটের মতে রাষ্ট্রকূটপতি পরবল তৃতীয় গোবিন্দ এই রন্না দেবীর পিতা। ত্রিভুবন পালের মাতার নাম জানিবার উপায় নাই। আমাদের মনে হয় ধর্ম্মমঙ্গলোক্ত বল্লভা দেবীই ত্রিভুবনপালের জননী ছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গলে বর্ণিত হইয়াছে যে ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক বল্লভা দেবী নির্ব্বাসিতা হইয়াছিলেন এবং সমুদ্রের ঔরসে তাহার গর্ভে ধর্ম্মপালের এক ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ধর্ম্মমঙ্গলে এই পুত্রই গৌড়েশ্বর নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ইহা অসম্ভব নহে যে—কোনও অজ্ঞাত কারণে বল্লভা দেবী ধর্ম্মপালের পূর্ব্বরাজ্যান্তর্বর্ত্তী সমুদ্রতটবর্ত্তী কোনও স্থানে কিয়দ্দিনের নিমিত্ত অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং ত্রিভুবনপাল সেই স্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অথবা ধর্ম্মপাল যখন বঙ্গের অধিপতি ছিলেন সেই সময়েই ত্রিভুবন পালের জন্ম হইয়াছিল। ইহা হইতেই সমুদ্রজন্মা প্রবাদের উৎপত্তি। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় অনুমান করেন ৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপাল গৌড় সিংহাসন লাভ করেন। রন্না দেবীর পিতা পরবল ৩য় গোবিন্দের রাজ্যকাল ৭৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ধর্ম্মমঙ্গলোক্ত গৌড়েশ্বর

সুতরাং বলিতে হইবে ধর্ম্মপাল রাজ্যগ্রহণের পরে রন্না দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ধর্ম্মপালের ৩২শ বৎসর রাজ্যান্তে মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণ বর্ম্মার প্রার্থনাক্রমে নারায়ণবর্ম্মা কর্ত্তৃক শুভস্থলিতে নির্ম্মিত দেবকুলে প্রতিষ্ঠিত ভগবন্নম নারায়ণের ও তৎপ্রতিপালক লাট দ্বিজাদির ব্যবহারার্থ ভূমিদানের দূতস্বরূপে আমরা ত্রিভুবনপালের নাম প্রাপ্ত হই। তৎপূর্ব্বেই তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন নিশ্চিত। ধর্ম্মমঙ্গলোক্ত ধর্ম্মপালপুত্র গৌড়েশ্বর বলিতে আমরা এই ত্রিভুবনপালকেই ধরিয়া লইয়াছি। খুব সম্ভব লাউসেন ইহারই শ্যালিকাপুত্র ছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গলে ইহার নাম অনুল্লিখিত থাকিবার হেতু এই হইতে পারে যে, প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া ত্রিভুবনপাল ও দেবপালকে লইয়া ধর্ম্মমঙ্গলকারগণ হয়ত মহা গোলযোগে পড়িয়াছিলেন। হইতে পারে মন্ত্রী দর্ভপাণি ও সেনাপতি জয়পালের সাহায্যে দেবপাল যখন গৌড়সিংহাসন লাভ করেন, লাউসেনের কার্য্য তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে লাউসেনের কীর্ত্তি কলাপ বর্ণন করিতে গিয়া তাহার প্রভুকে গৌড়েশ্বর আখ্যা দিয়া ধর্ম্মমঙ্গলকারগণ সকল গোলের হাত এড়াইয়াছেন। মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে তিনি নিরুপদ্রব পিতৃরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং অনুমান করিতে হয় যুবরাজ ত্রিভুবনপাল তখন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা অনুমান করিয়াছি, খৃঃ ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগে লাউসেন বর্ত্তমান ছিলেন।

লাউসেনের কাল নির্ণয়

লাউসেনকে অনেকে অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তিব্বতীয় তারনাথের গ্রন্থেও এই লাউসেনের কাহিনী বিবৃত আছে। তারনাথের বর্ণিত বৃত্তান্ত যে অমূলক নহে খালিমপুর তাম্রশাসন প্রভৃতি দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে তাহার একাংশ সত্য ও অপরাংশ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। তারনাথের মতে সেনরাজবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে লবসেনের অভ্যুদয় হয়। (Indian Antiquary Vol. IV. p. 366.) কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়াই তারনাথ তাঁহার ইতিহাস সঙ্কলন করেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-পালকে গোপালের প্রপৌত্র, দেবপালের পৌত্র ও রসপালের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মপালের সাম্রাজ্যের যে বিবরণী প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহা অনেকাংশে তাম্রশাসনের প্রমাণের অনুযায়ী। (গৌড়রাজমালা ২২ পৃঃ) সুতরাং বলাই বাহুল্য যে বহুকালপরে শ্রুত ঘটনার সন্নিবেশে এরূপ অসামঞ্জস্য

হওয়া অসম্ভব নহে। লবসেন ও বিজয়সেন প্রভৃতি যে একবংশীয় নহেন, ইহাই বিশদ করিবার জন্য হয়তো তিনি লবসেনকে সেনবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মমঙ্গলকারগণ এদেশের লোক। তাঁহাদের শ্রুত জনশ্রুতি অনেকাংশে সঠিক হওয়াই সম্ভব। তজ্জন্য আমরা ধর্ম্মমঙ্গলের অনুসরণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। অনেক এই লাউসেনকে ১ম মহীপালের সমসাময়িক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু এ মতের সমর্থন করি না। পরকেশরী বর্ম্মা শ্রীরাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়গিরি-লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, দণ্ডভুক্তিতে ধর্ম্মপাল, দক্ষিণরাঢ়ে রণশূর, বঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র ও উত্তররাঢ়ে মহীপাল, ইঁহারা সকলেই রাজেন্দ্র চোলদেবের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। এই উত্তররাঢ়ের মহীপালই পালবংশীয় ১ম মহীপাল। লাউসেনের পিতা কর্ণসেন সে সময় বর্ত্তমান থাকিলে 'বারভূঞা মাঝে যার কথা নাহি নড়ে' এহেন কর্ণসেন রায়কে রাজেন্দ্র চোল উপেক্ষা করিতেন না, বা কর্ণসেনও নীরব থাকিতে পারিতেন না, যেহেতু তিনি পালবংশীয়গণের সামন্তরাজ ছিলেন। আবার কর্ণসেনকে বিতাড়িত করিয়া স্বাধীনতার দুলাল যে পরাক্রান্ত ইছাই ঘোষ ত্রিষষ্টিগড়ের আধিপত্যলাভ করিয়াছিলেন, তিনিও সে সময় বর্ত্তমান থাকিলে রাজেন্দ্র চোলের সহিত তাহার সংঘর্ষও অনিবার্য্য হইয়া উঠিত। কথা উঠিতে পারে, রাজেন্দ্র চোল যখন উত্তররাঢ়ে মহীপালের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, সেই সুযোগেই হয়তো ইছাই কর্ণসেনকে বিতাড়িত করিয়া ত্রিষষ্টিগড় অধিকার করিয়াছিলেন। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, রাজেন্দ্র চোল যখন গড়মন্দারণে রণশূরের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, কর্ণসেন তখন রাজ্যচ্যুত হন নাই। এরূপ অবস্থায় রাজেন্দ্রচোল কর্ণসেনকে উপেক্ষা করিলেন কেন? রণশূর যে কর্ণসেন অপেক্ষা খুব বড় রাজা ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং যুদ্ধ হইলে তিরুমলয়গিরি-লিপিতে রণশূরের পার্শ্বে কর্ণসেনের নামও স্থান প্রাপ্ত হইত। দ্বিতীয় কথা—রাজেন্দ্রচোল গঙ্গাতরঙ্গচুম্বিত উত্তর-রাঢ় হইতেই প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। গঙ্গার অপরপারে তিনি গিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং মহীপালের সহিত সংঘর্ষকালে ত্রিষষ্টিগড়ে রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইলে ফিরিবার পথে নিশ্চিতই তিনি সে সংবাদ অবগত হইতেন এবং পররাজ্য-জয়ের এরূপ সুযোগ পরিত্যাগ করিতেন না। তৃতীয় কথা—১০২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই রাজেন্দ্র চোলের এই দিগ্বিজয় পরিসমাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই সপ্রমাণ হইয়াছে। ১ম মহী-

পাল ১০২৬ খৃষ্টাব্দের পরে জীবিত ছিলেন কি না প্রমাণাভাব। জীবিত থাকিলেও (গৌড়রাজমালা ৪৫ পৃষ্ঠা) ১০৩৩ খৃষ্টাব্দে মহীপালের পুত্র নয়পালের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। সুতরাং উপরোক্ত রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় কর্ণসেন বিতাড়িত হইলেও তাঁহার রঞ্জাবতীর সহ বিবাহ, লাউসেনের জন্ম এবং লাউসেনের বয়োপ্রাপ্তি ও ইছাইয়ের ধ্বংসসাধন প্রভৃতি যে ৮।১০ বৎসরেই ঘটিয়া উঠিয়াছিল ইহা একেবারেই অসম্ভব। লাউসেনকে ১ম মহীপালের সময় ধরিতে গেলে আরও অসুবিধা এই যে, ধর্ম্মমঙ্গলোক্ত "গৌড়ের ঠাকুর ধর্ম্মপাল রাজা"র একান্ত অসম্ভাব হইয়া পড়ে। তজ্জন্য টানিয়া বুনিয়া আবার দণ্ডভুক্তির ধর্ম্মপালকে আনিয়া খাড়া করিতে হয়। কিন্তু তাহাতেও তাহার পুত্র ও পুত্রের শ্যালিকা লইয়া বিভ্রাট বাধিয়া যায়। এইরূপ আরও অনেক অসুবিধা আছে, বাহুল্য বিবেচনায় বিবৃত করিতে নিরস্ত রহিলাম।

সুহ্মাধিপতি দেবসেনের রাজ্যকাল খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ ধরিয়া লইতে পারা যায়। খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগেই সুহ্ম কর্ণসুবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহার কিঞ্চিদূন প্রায় দুইশত বৎসর পরে ধর্ম্মপালের রাজত্ব-সময়ে কর্ণসেনের অভ্যুদয় হইয়াছিল ধরিয়া লইলে সুতরাং স্বীকার করিয়া লইতে হইবে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর প্রথমভাগে ইছাই ঘোষ ঢেকুরের অধীশ্বর ছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গলে লাউসেনের পুত্র চিত্রসেনের নাম উল্লিখিত আছে। লাউসেনের মৃত্যুর পর চিত্রসেন কর্ত্তৃক ঢেকুরের সিংহাসন গ্রহণ অসম্ভব নহে।(১১) কিন্তু চিত্রসেনের পরে তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি আর কাহারও নাম শুনিতে পাওয়া যায় না। হইতে পারে ভবিষ্যদ্বংশীয়গণ তাঁহাদের পূর্ব্ব-রাজধানী ময়নাগড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, অথবা চিত্রসেনের বংশধর আর কেহ ছিলেন না। গৌড়-কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" হইতে আমরা কৈবর্ত্তপতি দিব্বোকের

লাউসেন ও তাহার পরবর্ত্তী (ঢেকুরেশ্বর) রাজগণ

(১১) শ্যামারূপার গড়ের কতকগুলি কামান বর্দ্ধমান-রাজবাটীতে নীত হইয়াছে। একটী কামানের ভগ্ন-অংশ এখনো শ্যামারূপা মায়ের মন্দির-প্রাঙ্গণে পড়িয়া আছে। বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান-রাজবাটীতে স্থিত উক্ত কামান-গাত্রে 'চিতরসেন' নাম ক্ষোদিত রহিয়াছে। ইনি লাউসেনাত্মজ চিত্রসেন কিনা বলিতে পারা যায় না। অনেকে বলেন বর্দ্ধমান-রাজবংশে এক চিত্রসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কামান তাঁহারই। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা কামানগাত্রে ক্ষোদিত লিপি দেখিবার সুযোগ পাই নাই। শুনিয়াছি লিপি ফার্সি অক্ষরে লিখিত। ফার্সি হইলে আধুনিক হইতে পারে। কিন্তু নাগরাক্ষর বটে কিনা নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না যখন, তখন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোন কথা বলা উচিত নহে। ইতি প্রকাশক।

বিরুদ্ধে তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র রামপালের সাহায্যকারী সামন্তরাজগণের মধ্যে "প্রতাপ ইতি প্রতাপসিংহঃ প্রতিপক্ষকক্ষোণিভৃৎক্ষৌহিণীদারুণদ্রবণভ্রণ-বিভ্রংস-ভীষণপ্রয়াণ-ঢক্কারবো ঢেকরীয়রাজঃ" এই নাম প্রাপ্ত হই। রামপালের রাজত্বকাল ১০৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে প্রতাপসিংহ ঢেকুরে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন বলিতে হইবে। তাঁহার রাজধানী ছিল শ্যামরূপা-গড়ের অদূরে অজয়ের উত্তর-তটস্থিত গড় প্রতাপ-পুর। প্রাচীন প্রতাপপুর অনেকাংশে অজয়গর্ভে বিলুপ্ত হইলেও অপরাংশে তাহার সুস্পষ্ট পরিখাদির চিহ্ন আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। স্থানটী দেখিলেই তাহার প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ উপস্থিত হয় না। এই সিংহবংশ প্রথমে শূররাজগণের সামন্তরাজ ছিলেন। পঞ্চাননের কুলকারিকা হইতে জানিতে পারা যায়, শূররাজ আদিত্যশূর বাৎস্য সিংহবংশীয় অনাদিবর সিংহকে গঙ্গার পশ্চিমকূলে সিংহপুর হইতে কণ্টকনগর পর্য্যন্ত চারিশতখানি গ্রামের আধিপত্য প্রদান করেন। যথা—

"আদিত্যশূরনৃপেন্দ্রঃ হৃষ্টান্তঃকরণঃ শুচিঃ।
অনাদিবরসিংহায় দত্তাং ভূমিমখণ্ডিতাম্॥
সিংহেন্দ্রে সিংহেশ্বরাদৌ গঙ্গায়াঃ কূলপশ্চিমে।
চতুঃশতান্ গ্রামাধীশ কণ্টকনগরাবধি॥
এতন্মণ্ডলয়োর্মধ্যে সামন্তরাজ উচ্যতে।"

রাঢ়ে সিংহেশ্বর তখন শূরবংশের রাজধানী ছিল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে "আদিত্যশূরের অপর নাম ধরণীশূর এবং তাঁহার রাজত্বকাল ৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই সময়ে ধর্ম্মপাল-পুত্র দেবপালের প্রসিদ্ধ সেনাপতি জয়পাল রাঢ়াধিকারে মনোনিবেশ করেন। এবং শূররাজগণ রাজধানী শূরপুর পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ রাঢ়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হন।" (হইতে পারে এইরূপ কোনও গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া লাউসেন-বংশীয়গণ হয় তো ঢেকুরের আধিকার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন) কিন্তু ১ম বিগ্রহপালের সময় দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে রাষ্ট্রকূটপতি ২য় কৃষ্ণ এবং উত্তরদিক্ হইতে হৈহয়রাজ গুণাম্ভোধিদেব গৌড় আক্রমণ করিলে সুযোগ বুঝিয়া অবনীশূরের পুত্র ধরণীশূর পূর্ব্বাধিকারে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পুনরায় সিংহেশ্বরেই রাজধানী স্থাপন করেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ধরণীশূরের নামান্তর আদিত্য-শূর। ইনি সিংহেশ্বর হইতেই অনাদিবর সিংহকে উক্ত গ্রামাদি প্রদান করেন।

কিন্তু শূরবংশের সিংহেশ্বর রাজধানী স্থায়ী হয় নাই। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের মতে "গৌড়াধিপতি নারায়ণপাল যখন তাঁহার মাতামহ হৈহয়রাজ এবং বৈবাহিক রাষ্ট্রকূটাধিপতি জগত্তুঙ্গের সহায়তায় পিতৃপুরুষের স্থায়ার্জ্জিত রাজ্যগুলি পুনরায় অধিকার করিলেন, সেই সঙ্গে ধরাশূরের পুত্র অমুশূরও উত্তররাঢ় হারাইয়া দক্ষিণ রাঢ়ে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সময় বুঝিয়া শূররাজগণের পূর্ব্বতন রাজছত্রাধীন সামন্ত-রাজগণ নামমাত্র পালবংশের অধীনতা স্বীকারে স্বাধীন হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে জজান ও পাঁচথুপী অঞ্চলে সৌকালীন ঘোষবংশ, ফতেসিং অঞ্চলে বাৎস্য সিংহবংশ, বীরভূমের মিত্রভূমে মিত্রবংশ, দক্ষিণ-খণ্ড অঞ্চলে শাণ্ডিল্য ঘোষবংশ এবং কুশুম্বা অঞ্চলে কাশ্যপ দাসবংশ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন।" আমাদের অনুমান হয়, খৃঃ ১০ম শতাব্দীর মধ্যভাগে শূররাজগণ যে সময়ে অপরমন্দার বা গড়-মন্দারণে গিয়া রাজধানী স্থাপন করিতে বাধ্য হন, বাৎস্য সিংহবংশও সেই সময়ে ঢেকুরে আসিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হন। রামপালের সময়ে আমরা শূর-বংশীয় অপরমন্দারমধুসূদন সমস্ত আটবিক সামন্ত-চক্রচূড়ামণি লক্ষ্মীশূরের এবং সিংহবংশীয় ঢেক্করিয়-রাজ প্রতাপসিংহের নাম প্রাপ্ত হই। বুঝিতে পারা যায়, ইঁহারা কেহই স্বাধীন ছিলেন না। এই সময়েই রাঢ়ে বর্ম্মরাজগণের অভ্যুদয় হয়। রাঢ়েশ্বর শ্যামলবর্ম্মা প্রভৃতি জনকয়েক বর্ম্মরাজের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, তখন ১০।১৫ ক্রোশ অন্তর স্বাধীন রাজা মিলিত। যে কেহ একজন জমীদার একটু গোছালো রকমের হইয়া উঠিতেন, তিনিই রাজা উপাধি ধারণ করিতেন। ইহার মধ্যে আবার যাঁহারা দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন, তাঁহারাই সুযোগ বুঝিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিতেন। একটী গল্প মনে হইল। 'সিয়ার উল্ মুতাখ খরিনে' লিখিত আছে "দিল্লীশ্বর বাহাদুর শাহের পুত্র আজিম্ উশ্‌শান্ পিতার পক্ষে রাজকীয় সমস্ত কাগজ-পত্রাদিতে স্বাক্ষর করিতেন। তখন উপাধির বড় ছড়াছড়ি হইয়াছিল। একবার এক সামান্য দপ্তরখানার পেস্কার 'রায়' উপাধি প্রাপ্তির প্রার্থনা করে, আজিম্ উশশান্ দস্তখৎ করিবার সময় বলেন "খানে দরহর খানা রায়ে দরহর বাজার" অর্থাৎ ঘরে ঘরে খাঁ ও বাজারে বাজারে রায় বিরাজ করিতেছেন। সম্মানিত হইবার জন্য এই কয়দী (প্রবঞ্চক ঘৃণিত)ও রায় হইবে ? দুঃখের বিষয়-পেস্কার শুধু রায় না হইয়া সেই হইতে "কয়দী রায়" আখ্যায় সাধারণের অঙ্গুলি-নির্দ্দেশের পাত্র হইয়াছিল।" উপাধি-গৌরব উপাধি-কলঙ্কে পরিণত হইয়াছিল। আজিম

উশ্শানের ভাষায় বলিতে হইলে তখনকার দিনেও এইরূপ পল্লীতে পল্লীতে রাজা-মহারাজ মিলিত। তবে এতদ্দেশের রাজা-মহারাজগণ প্রায় অনেকেই অন্ততঃ নামে মাত্রও গৌড়েশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিতেন। সে যাহা হউক, বর্ম্মরাজগণের রাঢ়াধিকার অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই।(১২) সেন-বংশীয় রাজা বিজয়সেন আসিয়া রাঢ়দেশ অধিকার করেন। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেনের সময় সমগ্র রাঢ় তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। এই সঙ্গে ঢেকুর (শ্যামারূপার) গড়ও তাঁহাদের অধিকারে আইসে। আমাদের মনে হয় এতদঞ্চলের সেনভূম ও সেনপাহাড়ী পরগণা দুইটীর একটী কর্ণসেন লাউসেন প্রভৃতি রাজগণের সময়ে সৃষ্ট হয় ও অপরটী তাঁহাদেরই অনুকরণে বল্লালসেন লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতির সমসময়ে উদ্ভূত হইয়াছিল। প্রবাদ বল্লালসেনের এক কন্যা দেবী সুন্দারূপার একনিষ্ঠ উপাসিকা ছিলেন। বল্লাল নীচ-সংসর্গজনিত অপবাদ দূরীকরণার্থ শ্যামারূপা দেবী যৌতুকসহ উক্ত কন্যাকে শেখররাজ কল্যাণশেখরের করে সমর্পণ করেন। (কেন্দুবিল্ব-কাহিনীতে প্রসঙ্গতঃ এ বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।) বল্লালসেনের দানসাগর উপক্রমের নিম্নোক্ত শ্লোক হইতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি শেখররাজবংশের গৌরব করিতেন। শ্লোকটী এই :—

"তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্রে
দিশি বিদিশি ভজতে যস্য বীরধ্বজত্বং।
শেখরবিনিহিতাজ্ঞা বৈজয়ন্তীং বহন্তঃ
প্রণতিপরিগৃহীতাঃ প্রাংশবো রাজবংশাঃ॥"

রামচরিতে রামপালের সাহায্যকারিগণ মধ্যে লক্ষ্মীশূর প্রভৃতির সঙ্গে তৈলকম্পীর কল্পতরু রুদ্রশেখরের নাম উল্লিখিত আছে। রুদ্রশেখর নিশ্চিতই শেখররাজবংশীয়। সুতরাং অপরাপর সামন্তগণ মধ্যে কেবল বীর্য্যবান্ শেখররাজ যে উন্নত রাজবংশের আজ্ঞা বহন করিতেন, এ বিশেষণ দিবার তাৎপর্য্য কি? অপরাপর সামন্তরাজগণের ন্যায় শেখররাজগণও পূর্ব্বে পাল-রাজগণের আজ্ঞা বহন করিতেন, বিজয়সেন প্রভৃতি রাজগণের সময় পূর্ব্বমত অপরাপর সামন্তগণের সহিত তাঁহারও পাল-প্রভাব খর্ব্ব হওয়ার পর সেন-রাজগণের আজ্ঞা বহন করিয়াছিলেন। সুতরাং তৎসাময়িক শেখররাজবংশের

(১২) বর্ম্মরাজগণের সময়ে ঢেকুরের অবস্থা সম্বন্ধে কোন অনুমানে উপনীত হইবার উপায় নাই।

এমন কোনও বিশেষত্ব জানিতে পারা যায় না, যদ্দ্বারা এই বিশেষণের সার্থকতা অনুভূত হইতে পারে। ইহা হইতেও পূর্ব্বোক্ত প্রবাদবিষয়ীভূত শেখর-রাজবংশে কন্যা-সম্প্রদান-কাহিনী সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয়। পঞ্চকোট-রাজধানীতে শ্যামারূপা-মায়ের অসি আজিও পূজিত হইতেছে বলিয়া শুনিয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় তদীয় 'ইতি কথায়' এই প্রবাদের সমর্থন করিয়াছেন। (পঞ্চকোট অঞ্চলে বীরভূমের অনুরূপ এই একই প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। এ কথা তিনি নিজেও আমাদিগকে বলিয়াছেন)।

'যুবরাজ লক্ষ্মণ সেন এই সেনপাহাড়ী গড়ে আসিয়া বহুদিন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন ; এই স্থানেই তিনি শ্রীজয়দেবের সহিত পরিচিত হন।' এ প্রবাদ আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি। ধোয়ী কবি তাঁহার "পবন-দূতে" সুহ্মদেশ বর্ণন-ব্যপদেশে কেন্দুবিল্বে শ্রীজয়দেবপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের উদ্দেশ্যেই যে—

"তস্মিন্ সেনান্বয়নৃপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো
দেবঃ সাক্ষাদ্বসতিকমলা কেলিকারো মুরারিঃ।"

শ্লোকটী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন একথা একরূপ নিঃসন্দেহেই বলিতে পারা যায়। লক্ষ্মণসেনের সময় হইতেই শক্তি-উপাসনার প্রধান কেন্দ্র শ্যামারূপার গড় শ্রীজয়দেব গোস্বামীর মধুর কোমলকান্ত গোবিন্দ-সঙ্গীতের ভাবোন্মাদনায় আত্মহারা হইয়া শান্তিরসাস্পদ বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্যামারূপার গড় হইতে আনয়ন করিয়া শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহকে কেন্দুবিল্বে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের নৈরাণী দেবী এই প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পাদন করেন। এই শ্রীরাধাবিনোদ যুগলবিগ্রহ সাধারণতঃ বিনোদ-রায় নামেই অভিহিত হন। প্রবাদ সেনবংশীয় লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি রাজগণের পরে বিনোদ রায় নামে একজন নৃপতি শ্যামারূপার গড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। (১৩) শ্যামারূপা গড়ের প্রায় দুই ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে 'সুগড়'

(১৩) (বর্দ্ধমানের) রাজা শ্রীযুক্ত বনবিহারি কপূর সি, আই, ই বাহাদুর শ্যামারূপার গড় হইতে একটী অর্দ্ধভগ্ন শিলালিপি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। তাঁহার পত্রে অবগত হইয়াছি, তিনি লিপির একাংশে 'মনোহর রায়' এই পাঠটুকু উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অপরাংশ পাঠ করিবার কোনো উপায় নাই। সুতরাং সন-তারিখও জানিতে পারা যায় নাই। এই লিপি প্রবাদোক্ত 'সুগড়' গড়ের বিনোদ রায়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিতেছে। 'মনোহর রায়' বিনোদ রায়েরই বংশধর ছিলেন বলিয়া অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না। ইতি সম্পাদক।

নামক স্থানেই তিনি অধিকাংশ সময় অবস্থিতি করিতেন। সুগড়ের প্রাচীন পরিখাদির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। যথায় তাঁহার আবাসবাটী ছিল এখন সেই স্থানের নাম 'বিনোদবস্তী।' 'বিনোদবস্তীর' ইষ্টকস্তূপ দেখিলেই প্রকাণ্ড প্রাসাদোপম অট্টালিকাসমূহের ধ্বংসস্তূপ বলিয়া মনে হয়। সুগড়ে বিনোদবস্তীর স্তূপ-পার্শ্বে 'বিনোদ সায়র' নামক একটী দীর্ঘিকা বিনোদরায়ের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। বিনোদবস্তীর পূর্ব্ব-দক্ষিণে কিছু দূরে 'দ্বারীপুকুর' বা 'দুয়ারীপুকুর' নামে একটী পুষ্করিণী রহিয়াছে। সুগড় গ্রামের লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, যে স্থানে রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার ছিল, দ্বাররক্ষকগণের নামে সেই স্থানের পুষ্করিণীর নাম দুয়ারীপুকুর হইয়াছে। এই বিনোদরায় নৃপতিই নিজ নামানুসারে সেনপাহাড়ী গড়ে বিনোদ রায় বা শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। সেনবংশের শেষ সময়ে দনুজ-রায় নামক একজন রাজার অস্তিত্ব শুনিতে পাওয়া যায়। জানি না বিনোদরায় তাঁহারই বংশধর কি না? তবে এই বিনোদ রায় নৃপতি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়াই আমরা অনুমান করি। অনুমানের হেতু— প্রায় দুইশত বৎসর হইল, বিনোদরায় বিগ্রহ শ্যামারূপার গড় হইতে কেন্দু-বিল্বে আনীত হইয়াছেন (কেন্দুবিল্বের মন্দির-নির্ম্মাণাব্দ ১৬১৬ শক) সুতরাং এই সময়ের অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রতিষ্ঠাকাল ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না।

সেনপাহাড়ী অঞ্চলের বহু প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি, সেনপাহাড়ী প্রায় মনুষ্য-বসতিশূন্য হওয়ার অনেক পরেও শ্রীরাধাবিনোদজিউ তত্রস্থ মন্দিরেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেন্দুবিল্ব হইতেই সেবাইত পরিচারক গিয়া তখন তাঁহার নিত্যপূজাদি নির্ব্বাহ করিয়া আসিত। এখনো কেন্দুবিল্বের সেবাইত-গণই শ্যামারূপা মায়ের পূজাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন। অভিজ্ঞগণের অনুমান, কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক প্রায় তিনশত বৎসরকাল গত হইতে চলিল শ্যামারূপার গড় মনুষ্য-বসতিশূন্য হইয়া রহিয়াছে। প্রতাপান্বিত রাজগণের প্রিয় নিকেতন এখন হিংস্র শ্বাপদ-সমাকুল ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। বীরভূমির গৌরবা-ন্বিত বীর-নিবাস, অতীতের সেই গৌড়-বরেণ্য শৌর্য্যমন্দির এখন ফেরুদলের আশ্রয়স্থলী হইয়াছে। (১৪) ইছাই ঘোষের বিরাট দেউলের উন্নত শির

(১৪) পূর্ব্বে এই শ্যামরূপাগড়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি এত অধিক ছিল যে, "গড়ের বাজনা" শুনিয়া লোকে দুর্গোৎসবের মহাষ্টমী মহানবমী সন্ধিক্ষণের বলিদান-কার্য্য সম্পাদন করিত।

নয়নপথে পতিত হইলে আজিও কোন্ দর্শকের মস্তক সসম্ভ্রমে অবনত না হয়? কোন্ স্মরণাতীত কালে ইছাই তাঁহার এই জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, দেখিলে আজিও সে দিনের বলিয়া মনে হইবে! কিন্তু কিছুই চিরস্থায়ী নহে, শ্যামারূপার গড় ধ্বংস হইয়াছে, ইছাই এর দেউলও ধ্বংসোন্মুখ। (১৫) জানি না কালভয়হারিণী কতকাল আর তাঁহার প্রিয়পুত্রের এই কীর্ত্তি-মন্দিরটী কালের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন?

অর্থাৎ শ্যামরূপা মায়ের বলিদান সমাপ্তিসূচক যে তোপধ্বনি ও বাদ্যধ্বনি হইত, তাহাই শুনিয়া লোকে আপন আপন চণ্ডীমণ্ডপে বলিকার্য্য সমাধা করিত। উক্ত বাদ্যধ্বনি ও তোপধ্বনি শ্যামারূপার গড় হইতে সমুদ্ভূত হইয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বহুদূরবর্ত্তী চণ্ডীমণ্ডপ প্রাঙ্গণসমূহে গিয়া প্রতিধ্বনিত হইত। উহাই এতদঞ্চলের জনসাধারণের নিকট 'গড়ের বাজনা' নামে প্রসিদ্ধ। সাধারণের বিশ্বাস সে বাজনা আজিও বাজে। তাই অতীতের মোহমুগ্ধজনগণ ৺পূজার সময়ে এখনো উদ্‌গ্রীবহৃদয়ে ব্যাকুল প্রাণে কান পাতিয়া প্রতীক্ষা করে, কখন গড়ের বাজনা বাজিবে? হায় স্মৃতি! তোমার তরঙ্গাভিঘাত, সমস্ত জড়তা নিখিল নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মানবের কম্পিত বক্ষে এমন কি মন্দির স্পন্দন জাগাইয়া দেয়, যাহা বাস্তব বর্ত্তমানকেও মানিতে চাহে না। কালের ভ্রূভঙ্গে প্রতিহত হয় না, অপিচ যাহা বিশ্বচ্ছন্দে সুর গাঁথিয়া দিয়া অদৃষ্টকেও নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হয়। কি মধুর অনুকম্পা তোমার স্মৃতি! যাহা জন্মান্তরে গিয়াও মানবকে উদ্বুদ্ধ করে।

(১৫) ইছাই ঘোষের দেউলে কোনো দেবতা প্রতিষ্ঠিত নাই। ইহা "কুতবমিনার" শ্রেণীর জয়স্তম্ভ বলিয়াই অনুমিত হয়। প্রবাদ, কর্ণসেনকে বিতাড়িত করিয়া ইছাই ঘোষ স্বীয় স্বাধীনতা গ্রহণের এই স্মারক দেউলটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দেউলটী পূর্ব্বদ্বারী। ইছাই এই দেউলে কোনো দেবতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন কিনা জানিবার উপায় নাই। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ইছাই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এই দেউলেই শ্যামারূপা মায়ের প্রতিমা স্থাপন করেন, এবং এই দেউলেই তিনি সাধনা করিতেন। পরে গড়ের সিংহাসন গ্রহণ করিয়া শ্যামারূপাকেও গড়ের মধ্যে লইয়া যান এবং তথায় তাঁহাকে (বর্ত্তমান অধিষ্ঠানক্ষেত্রে) নূতন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইছাই ঘোষের দেউলের সমীপবর্ত্তী বিপুলকায় বাস্তুভিটাসমূহ সম্ভ্রান্ত নাগরিকাবাসের সাক্ষ্যস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তথায় "ঘোড় দালান", "মহিষীদহ" প্রভৃতি বহুসংখ্যক পুষ্করিণীর বিদ্যমানতাও এই অনুমানের পোষকতা করে। যাহা হউক এই দেউল এখনো বীরভূমের একটী দর্শনীয় সামগ্রী। ইতিপূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের চেষ্টায় দেউলের একবার জীর্ণ-সংস্কার হইয়াছিল। কিন্তু সে নামে মাত্র। তাহাতে ঠিকাদারেরই উদরপূর্ত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। দেউলের মাথায় আবার এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের উদ্ভব হইয়াছে। শীঘ্রই সে বৃক্ষটী তুলিয়া না ফেলিলে দেউলটী ধ্বংস হইয়া যাইবে। গভর্ণমেণ্টের প্রাচীন-ভারত শিল্প-সংরক্ষিণী-বিভাগ হইতে ইহার সম্পূর্ণ সংস্কার হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। পূর্ব্ববারে হেতমপুরের স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুর প্রভৃতি অনেক দেশহিতৈষী মহোদয় দেউলের সংস্কার-কল্পে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। আশা করি দেশের বর্ত্তমান সদাশয়গণ ও গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণকল্পে আর একবার সচেষ্ট হইবেন। বীরভূম-বর্দ্ধমানে এই প্রাচীন সম্পদ রক্ষাকল্পে বীরভূম-বর্দ্ধমানবাসী জনসাধারণের সাহায্যও বিশেষ প্রয়োজনীয়। দেশবাসী অগ্রসর হউন। ইতি প্রকাশক।

সম্পূর্ণ।